॥ চিত্র ও বিচিত্র ॥

বহু সময়ে আমার মনে [illegible] দিল্লী পুরনো-দিল্লীর মত কলকাতাকেও দু'ভাগে [illegible] উত্তর-কলকাতা এবং দক্ষিণ-কলকাতায়। চেহারায় [illegible] এবং পারিপার্শ্বিকে দু' কলকাতায় মিল সামান্যই। গরমিল আকাশ-পাতাল। দক্ষিণ-কলকাতার লোক উত্তর-কলকাতায় গেলে হাঁফিয়ে ওঠে। উত্তর-কলকাতার লোক তেমনি দক্ষিণ-কলকাতায় এলে মনে করে বিদেশ বিভুঁয়ে কোথাও এসে উঠেছে।

উত্তর-কলকাতা ঘিঞ্জি। ঠাস-বুনোন। মার্জিন কম। বাড়ীগুলি কোন্ কালের, কেউ জানে না। পরিবারের যে যেখানে আছে সবাই মিলে থাকে এক জায়গায়। মাসী-পিসী, মামাতো-জ্যাঠতুতো ভাই, গাঁয়ের [illegible] লোক, দারোয়ান, ঝি, চাকর, সরকার-মশাই, আর আছেন এক পাল বাচ্চার মাষ্টার মশাই খাওয়া-থাকার বিনিময়ে। তার মধ্যে হেঁসেল, বাই-হেঁসেল, মেজো বাবুর চাকর, ছোট কর্তার ঝি সব [illegible]।

কিন্তু দক্ষিণ-কলকাতা ভেতর-বাইরে আশে-পাশে সব ফাঁকা। একদম ছাড়া। ঢাউস বাড়ী তো দূরের কথা, একই বাড়ীকে ভেঙ্গে-চুরে ফ্ল্যাট সিষ্টেমে ভাড়া দেওয়া। স্বামি-স্ত্রী, একটি ফিনফিনে মেয়ে এবং একজন রাজকাপুর-বলতে-অজ্ঞান ছেলে। ঠাকুর এবং চাকর কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড। একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ী এবং ভাড়া-করা রেফ্রিজারেটর। দু-ই অবশ্য বাজারে বাকী রাখবার মত একটা ভালো চাকরী থাকলে তবেই।

এই দুই পোলের, দিন-রাত্তিরের, সাদা-কালোর ফারাক যে কলকাতায় তার একটি মাত্র মিল যে জায়গায় তার নাম স্যাঙ্গুভেলী। স্যাঙ্গুভেলী—যৌবনের রঙ্গভূমি, বার্ধক্যের বারাণসী; দরিদ্র বাঙালী, মূর্খ বাঙালী, মুচি বাঙালী, মুর্দফরাস বাঙালীরা সবাই এখানে ভাই-ভাই। এখানেই সত্যিকারের শক-হুনদল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন। একসঙ্গে কুরুক্ষেত্র ও শ্রীক্ষেত্র।

পৃথিবীর সাহিত্যিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এমন লেখক এযুগে বাংলা দেশ মাত্র দু'জনকে জন্ম দিয়েছে। একজন রবীন্দ্রনাথ। অপরজন শরৎচন্দ্র। বাকী বাঙালী লেখকরা ফিল-আপ-দি-গ্যাপস মাত্র। অথচ আশ্চর্য, ঐ দু'জনের লেখাতেই স্যাঙ্গুভেলী অনুপস্থিত। সেই সঙ্গে সমস্ত বাঙালী-মধ্যবিত্ত সমস্যাই। এ-কথা অবশ্য ঠিকই যে স্যাঙ্গুভেলীর স্বর্ণযুগ দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ-কালীন।

সাহেবদের ক্লাব। মোসাহেবদের গ্র্যাণ্ড, ফির্পো, গ্রেট ইষ্টার্ণ আর মধ্যবিত্ত বাঙালীর হল স্যাঙ্গুভেলী। ডবল হাফ চায়ের ওপর এখানে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলেও বলবার কেউ নেই। ক্রেডিট চট করে ডিসক্রেডিটে রূপান্তরিত হয় না। কচিৎ নীল শাড়ীর আগমন ঝুলে-পড়া তর্কের মাঝখানে নতুন করে টেম্পো আনে। পৃথিবীর সব সংবাদ সব দুঃসংবাদ, সব কিছুর আখড়া—রয়টার, এ পি., ইউ. পি., নিউস রীল, টেলিগ্রাম কম্বাইণ্ড হল স্যাঙ্গুভেলী।

সরকারী নয়, ভারত সরকারের বে-সরকারী গেজেট এই স্যাঙ্গু-ভেলী। স্যাঙ্গুভেলীর খবর মানে খবর কাগজের ভাষায় বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ।

আকাশে যত তারা, মানুষের মাথার যত চুল, অলিতে গলিতে যত ফিলম ষ্টার, কলকাতার রাস্তায় তত স্যাঙ্গুভেলী। অর্থাৎ অগুন্তি। এবং সত্যিকারের মহাশ্মশান হল স্যাঙ্গুভেলী—এর উনুন কখনও নেভে না। এখানে চা খাবার জন্যে ঢোকা, বসা কিন্তু আড্ডা দেবার জন্যে। চায়ের সঙ্গে বড় জোর দু'খানা টোষ্ট। কিন্তু টোষ্ট নিয়ে আর

খাই নিন, এক কাপ চায়ের পর আর অর্ডার নাই দিন, বয় এসে আপনাকে তাড়া দেবে না, বিলের ভয় দেখাবে না। আপনি আড্ডা দিন যতক্ষণ ইচ্ছে, যার সঙ্গে ইচ্ছে। আপনি গান গা'ন, নাচুন, হাসুন, কাঁদুন, ঝগড়া করুন, কেউ বলবার নেই, কারুর বলবার কিছু নেই। কারণ ট্রেনের ডেলি প্যাসেঞ্জারের মতো, আপনি স্যাঙ্গুভেলীর ডেলি কাষ্টমার।

ভ্যারাইটি এনটারটেনমেণ্ট বলে কলকাতায় যে বিচিত্রানুষ্ঠানগুলি এপাড়ায়-সেপাড়ায় হয়ে থাকে সেগুলিতে না থাকে ভ্যারাইটি, না থাকে এনটারটেনমেণ্ট। একই গায়কের একই গান, একই ক্যারিকেচরিষ্টের কৌতুকের নামে মুখ-ভ্যাংচানো। জলসার নামে কলকাতার বিভিন্ন পল্লীকে এগুলি পেয়ে বসছে ক্রমশ। মাইকের ধার-করা গলায় পাড়া-পড়শীর নিদ্রাভঙ্গ, আশে-পাশের সকলের পেছনে তারস্বরে ধাওয়া। ওর শ্রোতারা আট থেকে আশী বছর পর্যন্ত সবাই কাণ্ড-জ্ঞানহীন। সিনেমায় যে গান জনপ্রিয় হয়েছে যে গায়ক অথবা গায়িকার কণ্ঠস্বরে, জনপ্রিয় হয়ে তারপর পচে গেছে, সেই গানই জলসা থেকে জলসায় পিণ্ড না পাওয়া প্রেতের মত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আপত্তি নেই এই কাণ্ডজ্ঞানহীন শ্রোতাদের সেই গান হাজার বারের বার গাইতে বলায়। বরং সেই বিশেষ গানটিই না গাইলে শ্রোতারা বেখুশী।

মুশকিল হচ্ছে, কলেরায় সবাইকে ধরলে সহরে এপিডেমিকের ঘোষণাপত্রটুকু অন্তত বেরোয় এক সময়ে। তার জন্যে ইনজেকশনের ব্যবস্থারও ভয় দেখানো হয়। বসন্তের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্যে, পালাবার জন্যে জানানো হয় আহ্বান। প্লেগ বন্ধ করবার সরকারী অফিস আছে। নেই শুধু কালচারের নামে মানুষের অং... বোধের ওপর এই ভ্যারাইটি এনটারটেনমেণ্ট মারফৎ বলাৎকারের না... দ্ধে কিছু বলবার।

কিন্তু স্যাঙ্গুভেলীতে? সেখানে ভ্যারাইটি এনটারটেনমেণ্টের ...া নেই, তবে যার চোখ-কান খোলা আছে, বাধা নেই এই বিনা

ঘোষণার বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দিতে। সকাল দশটা থেকে রাত দশটা অবধি এখানে বিরামবিহীন বিচিত্রা।

এই মাত্র স্যাঙ্গুভেলীর কোণের চারটে চেয়ার যারা দখল করল তাদের আসন অনেকটা অলিখিত হলেও সংরক্ষিত! তারা আসবেই। তাদের অর্ডারও বয়ের জানা। বিলের জন্যেও রোজ নয়, ঠিক কবে তাগাদা দিতে হবে তা জানা আছে মালিকের। তারা চার জনই কলেজের ছাত্র। একজন ষ্টিভেডর কি ব্যারিষ্টর-বাবার একমাত্র ছেলে। সেই মুরুব্বী; বাকী তিন জন মধ্যবিত্ত ঘরের। এই একজন যখন কবিতা লেখে তখন বাকী তিন জনকে মুগ্ধ হতে হয়। এই একজন যখন প্রেমে পড়ে তখন বাকী তিন জনকে বলতেই হয় যে প্রেমে পড়ার জন্যে যাকে দরকার সেই মেয়েটি তাই আজ তাদের দেখে হেসে চলে গেল। ব্যস! অন্যদিন টোষ্টে শেষ হয়, আজ অমলেটে গড়াল।

কিন্তু না, আর নয়। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দ্রুত পট পরিবর্তনে নাটক জমেছে অন্য দিকে। ইষ্টবেঙ্গল না মোহনবাগান? টেবিল ভেঙে যেতে পারে, চেয়ার উল্টে যেতে পারে, পনেরো বছরের বন্ধুত্ব এই মুহূর্তে মুখও দেখতে না চাওয়ার প্রতিজ্ঞায় পর্যবসিত হল বলে, শুধু ভাঙতে পারে না এই তর্ক। সে সময়েও যদি এদের দেখতেন, তো অবাক হতেন। চোখে-মুখে অমন তেজ বুঝি বিবেকানন্দরও ছিল না।

বাঙালী স্পোর্টসে পিছিয়ে পড়েও আনস্পোর্টসম্যান হয় নি। অন্য প্রদেশের দিকে তাকালেই তা মালুম হয়। কেন্দ্রের সঙ্গে এদের সমান ভাব শুধু এক জায়গায়, বাংলা দেশ যেন না জিতে যায়। বাংলা দেশের অফিসে দ্রাবিড় ষ্টেনো, পোষ্ট অফিসেও বড় বড় [illegible]। অবাঙালীর সাদর আমন্ত্রণ, বাংলা দেশের বাস চালিয়ে এসেছে [illegible] কাল পাঞ্জাবীরা পরনে শুধু মাত্র লম্বা সার্ট এবং মুখে টিকিট বাবু সদেবার করে। মাড়োয়ার আর গুজরাট-তনয় ঘিরে ধরেছে কলকাতার

সাঁড়াশী আক্রমণে দু'দিক থেকে, বাড়ীর পর বাড়ী করে এগিয়ে আসতে-আসতে, কিন্তু এ সব কী কথা বলছি? এ-সব বললেই তো বাঙালী বড় প্রাদেশিক-মনোভাবাপন্ন। তাই থাক।

সত্যি-সত্যি ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান এই সেদিনকার, কিন্তু এই তর্ক যেন চিরকালের। শূদ্র বা বৈশ্য-কায়স্থ এবং বেচারা ব্রাহ্মণের ভেদাভেদ তো আছেই। তার ওপর এই হতভাগা দেশে আবার ঘটি আর বাঙাল। এ জাত যদি না মরে তো অন্যরা বাঁচে কী করে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মানসিক অমিল আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেচে যেখানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনোভাব যেন, বেশ হয়েছে। কিন্তু বেশ হওয়ার এই আবেশ আর বেশি দিন নয়। শরীর থেকে হাত কাটা গেলে সেটা হাতের যত বড় ক্ষতি, শরীরের ট্রাজেডী তার চেয়ে কম নয়, শরীর মাঝে মাঝে তা ভুলতে চাইলেও কথাটা খাঁটি সত্যি। এবং পশ্চিমবঙ্গ সেই সত্য বিস্মৃত হলে যে-উপায়ে পূর্ববঙ্গ আজ পাকিস্তান, সেই অপূর্ব উপায়েই পশ্চিমবঙ্গও একদিন মুছে যাবে। পূর্ববঙ্গ-বরবাদ বাংলা দেশের তালপুকুরে সত্যি-সত্যি ঘটি ডোবা শক্ত হবে, সময়ের নির্দেশ না মানলে। কিন্তু সে-কথাও থাক।

এবারে স্যাঙ্গুভেলীর আরও ভেতরে ঢোকা যাক। যেমন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত না হলে আজ আর ছায়াচিত্রের প্রেক্ষাগৃহ জমানো শক্ত, তেমনি 'কেবিন' না হলে স্যাঙ্গুভেলী সকল কালেই অচল;

হাসপাতালও হয়ত এ-দেশে কেবিন না হলে চলে যায়, কিন্তু স্যাঙ্গুভেলী নৈব নৈব চ। এখনও এখানে মেয়েদের নিয়ে খোলা জায়গায় বসতে কোথায় বাধে! কলেজের কিংবা আপিসের সহপাঠী অথবা সহকর্মী, মেয়ে হলে, তাকে বাড়ীতে ডেকে এনে গল্প করা চলবে না, তার বাড়ীতেও আপনি অস্পৃশ্য। তাই স্যাঙ্গুভেলীর কেবিন, অল্প ভীড় চিত্রগৃহ, পর্দা-ঢাকা রিক্সা। মেয়েদের সঙ্গে মেশা যত দিন না সহজ হচ্ছে, তত দিন সেই যথা পূর্বং তথা পরং।

স্যাঙ্গুভেলীর তাই সব চেয়ে দুর্নিবার আকর্ষণের কেন্দ্র হচ্ছে তার পর্দা-ঢাকা কুঠুরী, যার নাম কেবিন, ইংরেজি না জানলেও সবাই জানে যার মানে। কেবিনের বাইরে যারা বসে তারা অস্থির ; ভেতরে কী হচ্ছে ? ভেতরে কিছুই হচ্ছে না, দুটি তরুণ-তরুণী গল্প করছে, স্বপ্ন দেখছে কিংবা তাদের বন্ধুত্বের ওপর টানছে বিচ্ছেদের ব্যাপার সাধারণ অভিমানে, সামান্য কারণে।

কিন্তু স্যাঙ্গুভেলীর সবাই কিছু সেই দিকে চেয়ে নেই। তাদের চোখ এইমাত্র গিয়ে পড়েছে সদ্য-প্রবেশ-করা কোন নেপথ্য সঙ্গীত-কারের ওপর অথবা সিনেমায় ভাঁড়ামোর রোলে সুপরিচিত কোনও কৌতুকাভিনেতার দিকে। প্রথম-প্রথম ফিস-ফিস হয়, চাপা গুঞ্জন, এখন সবাই জেনে গেছে, এ-স্যাঙ্গুভেলীতে এসে অমুক-অমুককে দেখা যায়, শোনা যায় তাদের কথা, আওয়াজ পাওয়া যায় হাসির।

তারপর অনুরাগীর দল পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করে বেড়ায় সেই হঠাৎ-দর্শনের ওপর রং-চড়ানো বিস্ময়ের পশরা। গিয়ে বলে, জানিস অমুকদা আমাকে বলেছে পরের বইতে নামিয়ে দেবে, আমার চেহারা নাকি ছবির জন্যে আদর্শ। যে বলছে সে মিথ্যেই বলছে, যারা শুনছে তারাও জানে নির্ভেজাল মিথ্যে এ-কথা, তবুও শুনে ঈর্ষান্বিত হতে হয়, বলতে হয় : সত্যি ?—তা হলে তো তুই মেরে দিয়েছিস্!—বোস! বোস! সিগারেট ছাড় দিকি একটা।

কিন্তু এইমাত্র স্যাঙ্গুভেলীতে ঢুকে এক কোণে বসে যিনি বুদ্ধদেবের জগৎকে কৃপা করবার মত হাসি হাসছেন মিটি-মিটি, কে তিনি ? তাকে আপনি চিনবেন না। না চিনবারই কথা। তিনি তো ফুটবল অথবা ফিলম অথবা মিনিস্টার নন : তিনি হলেন সব চেয়ে বেশি-বিক্রী বইএর লেখক। জীবনকে দেখতে এসেছেন স্যাঙ্গুভেলীতে।

হাসবেন না কথাটা শুনে।

সত্যিই পাবলিশারের দোকান, নিজের পরিবার এবং স্যাঙ্গুভেলীর পরিচিত কোণ—এই হল এ-দেশের লেখকের অভিজ্ঞতা অর্জনের একমাত্র সম্বল।

অথচ পৃথিবীর লেখকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে জগৎ-পারাবারের তীরে। মরু দেশ থেকে মরা দেশ। টগবগে মার্কিনী জীবন থেকে মুমূর্ষু, অর্ধমৃত, জীবন্মৃত, যতটুকু জীবিত তার চেয়ে মৃত্যুভীত মানুষদের মধ্যে। খুঁজছে গল্প, নাটক, উপন্যাস। বন্দরে বন্দরে বাঁধছে জাহাজ, খালাসীর কাছে খোঁজ নিচ্ছে মহৎ উপন্যাসের উপকরণের। মাছের পেট চিরে বার করছে মানুষের মনের কথা, সেই হীরায় পান্নায় হাসিতে কান্নায় মেশানো আংটিটি, দুষ্মন্তের দান শকুন্তলার আঙুলে, জলের অতলে হারিয়ে গেছিলো সেই কবে।

স্যাঙ্গুভেলীর প্রধান আকর্ষণ একটু আগে বলেছি : কেবিন। এখন সে-কথা প্রত্যাহার করছি। স্যাঙ্গুভেলীর সব চেয়ে বড় আকর্ষণ তার মালিক। একটি টাইপ—চেহারায় এবং চরিত্রে। একই খাবার মালিকের নির্দেশে আজ আফগানি কাটলেট; কাল রাশিয়ান স্পেশাল। হোটেলের ম্যানেজার সাজে-পোষাকে, কথায়-কায়দায় যতখানি কেতাদুরস্ত, স্যাঙ্গুভেলীর মালিক সেই পরিমাণে প্রাগৈতিহাসিক। পয়সা কামানোর দিকে কড়া নজর রাখতে গিয়ে দাড়ি কামানো স্থগিত আছে। গায়ে গরম কালে ফতুয়া; শীতে জহর কোট।

স্বয়ং শ্রীভগবানকে যত দিকে চোখ রাখতে হয় তাঁর সৃষ্টি অব্যাহত রাখতে,—স্যাঙ্গুভেলীর মালিকের দৃষ্টিপাত তার চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ, আরো সুদূরপ্রসারী।

কে মোগলাই পরটার সঙ্গে ফাউ ভাজী বেশি পেয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে খদ্দের বিদেয় হতে না হতেই বয়কে সতর্কীকরণ। কার বাকী রাখার হিসেব মাত্রা ছাড়াচ্ছে, সে সম্বন্ধে তাকে হেসে ওয়াকিবহাল করা। কোন খদ্দের খাবার ব্যাপারে অভিযোগ করছে তার সামনেই

বয়কে ডেকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বক্তৃতা : তোমাদের জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে। যাও, বাবুর প্লেট বদলে দাও। ওঁর জন্যে বিল কোর না। বক্তৃতায় বাবু বিগলিত। ওদিক পকেট আরো গলে যাবার ব্যবস্থা যে পাকা হল সে নিয়ে বাবুর চিন্তা নেই। এখন থেকে তার মৌখিক বিজ্ঞাপনের যাত্রা আরম্ভ, এমন দোকান আর হয় না।

দোকানের বাইরেও মালিক চোখ ফেরাচ্ছে মাঝে মাঝে। কোন খদ্দের অনেক বাকী ফেলবার পর অনেক দিন আর এদিকে ঢুকছে না, তাকে রাস্তায় দেখতে পেলেই চীৎকার : আমাদের ভুলে গেলেন ‑র ?

কিন্তু ভোলা যে যায় না, কখনো দাদু কখন দাদা-ডাকা এই স্যাঙ্গুভেলীর মালিককে। ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না।

স্যাঙ্গুভেলীর সেই মালিক যিনি এই মুহূর্তে অগ্নিশর্মা, তিনি কাকে, দেখে তার পরেই আইসক্রীম। হাসির পাল্লা খুলে গিয়ে কান অবধি ঠেকেছে। উঠে দাঁড়িয়েছেন ব্যস্ত হয়ে, হাঁক দিচ্ছেন বয়কে ; এই না হলে স্যাঙ্গুভেলীর মালিক হওয়া অসম্ভব। কে এলে দাম চাওয়ার প্রশ্ন দূরের কথা, খাতির করার বহর কার খ্যাতির অনুযায়ী হবে সেই হল স্যাঙ্গুভেলী চালাতে পারার সব চেয়ে বড় রহস্য। কে কোথা থেকে আসছে সেইটে জানাই স্যাঙ্গুভেলী চালাতে সব চেয়ে বড় জানা। সাফল্যের সুনিশ্চিত সিঁড়ি।

কিন্তু এহ বাহ্য। দেশ বলতে যেমন হাজার-হাজার মাইল জায়গা মাত্র নয় ; দেশের লক্ষ-লক্ষ মানুষই হল আসলে দেশ, তেমনি স্যাঙ্গুভেলী মানে শুধু খাবার নয় কেবিন নয়, মালিক নয় স্যাঙ্গুভেলীর পরিচয় তার বিচিত্র খদ্দেরে। এ-পৃথিবী নাকি বিচিত্র জায়গা, কিন্তু তার চেয়ে বিচিত্র নাকি মানুষের মন। কিন্তু যিনি এই কথা বলেছিলেন তিনি স্যাঙ্গুভেলীতে ঢুকলে আরো বিচিত্রর খবর পেতেন অনায়াসেই, পেতেন শুধু একবার চোখ বুলিয়েই, প্রথম লক্ষ্যেই

লক্ষ্যভেদ করতে যদি পারতেন তো দেখতেন যে সব মানুষ যদিও কিছু না কিছুর খদ্দের, কিন্তু সব খদ্দেরই কিছু মানুষ নয়।

মানুষ মাত্রেরই মন থাকে, কিন্তু এমন খদ্দের যথেষ্ট আসে স্যাঙ্গুভেলীতে, যাদের শুধু পেট আছে। তাদের মন শুধু খুঁজে পাওয়া যাবে ওজনে। শুধু খেয়ে যাচ্ছে। যা খুসী। যত খুসী! আবার খদ্দের আছে যারা বিশেষ একটি ডিস খাবার জন্যে আসে বিশেষ স্যাঙ্গুভেলীতে! খদ্দের আছে যে সাত বচ্ছর ধরে ঠিক একই সময়ে আসছে, এক কাপ চা খাচ্ছে, দুটি সিগরেট, হিসেব করা—খেয়ে চলে যাচ্ছে। এর ব্যতিক্রম নেই, পরিবর্তন নেই। কলেজের ছেলে-ছোকরা ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে প্রৌঢ় এসে বসেছে এক। বাড়ীতে তার অনেক কাচ্চা-বাচ্চা। সেখানে ভাল-মন্দ কিছু খেতে গেলে অনেক খরচা। এখানে একটি টাকা খরচ করে খেয়ে যায় একা। খেতে খেতে কোথায় খোঁচা লাগছে তার। মনে পড়ছে বৌএর মুখ, বৌ আর এক পাল বাচ্চার। কিন্তু উপায় নেই। সকাল সাড়ে ৯টায় আপিসের খোঁয়াড়ে ঢুকে আর ছটায় বেরিয়ে প্রচণ্ড ক্ষিধে পায়। প্রচণ্ড ক্ষিধে অথচ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই প্রচণ্ড অভাব। তখন আর নীতিবোধ থাকে না। স্বার্থপর হতেই হয়। জঠরের আগুন নেবাবার ফায়ার ব্রিগেড যে ঘণ্টা দিলেই সব সময় আসে না।

সেই স্যাঙ্গুভেলীতে খেতে এসেছে একদিন এক কাবুলী। চার-জনের খাওয়া খেয়েছে একা। তারপর দাম দিতে গিয়ে ক্যাশ শর্ট। পাগড়ী খুলে, পিরেন খুলে, জুতোর তলা থেকে, পয়সা বার করে সব পয়সা মিলিয়ে দু'টাকা কম।

আমি সামনে বসে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ওপর কাবুলীর এত দিনের অত্যাচারের শোধ তুলব কিনা ভাবছি! ভাবছি এই প্রথম কাবুলীর কাছে ধার না নিয়ে, কাবুলীকে ধার দিলে কেমন হয়?

কিন্তু হল না। কাবুলী বললে মালিককে, সঙ্গে লোক দিন। কাছেই থাকি। বাড়ী থেকে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি।

মালিক বয়দের না পাঠিয়ে পাঠালেন ম্যানেজারকে। ম্যানেজার মানে অল্পবয়সী এক অল্পশিক্ষিত ভদ্রতনয়। মালিক না থাকলে মালিকের চেয়ারে বসে।

আধঘণ্টা বাদে ছেলেটি ফিরে এল কাঁদ-কাঁদ চোখে। কী হল? টাকা?—মালিকের মর্মান্তিক প্রশ্ন।

মাইনে থেকে কেটে নেবেন, ছেলেটি জানায়।

কেন?

তখন ছেলেটি বলল; আস্তে আস্তে, ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, রাস্তায় যেতে-যেতে কাবুলী নাকি তার বাড়ীর অবস্থা জিজ্ঞেস করে-করে সব জেনে নিয়েছে। এমন কি ছু'শো টাকার অভাবে দেশে তার বোনের বিয়ে আটকে আছে, সে-খবরও। তার পর ঘরে নিয়ে গিয়ে সেই কাবুলী কখন নাকি ছেলেটিকে ধার গছিয়ে দিয়েছে। প্রথম মাসের স্থদ থেকে ছু'টাকা কেটে মালিককে বলেছে দিতে।

সেই থেকে সব কাবুলী আমার প্রণম্য। প্রাতঃস্মরণীয়। মহাজন!

দুই

মধ্যবিত্তদের রঙ্গভূমি স্যাঙ্গুভেলীতে বসে থাকতে-থাকতেই আমার চোখের ওপর ভেসে উঠেছে চার্লি-চ্যাপলিন-সর্বস্ব 'মডার্ণ টাইমস্‌-'এর প্রথম দৃশ্য। ভ্যাড়াদের তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে মেষপালক একদিকে, আর অন্যদিক থেকে বেরিয়ে আসছে কারখানার শ্রমিক। দুজনের কারুরই জীবন নেই, আছে জীবিকার লাঞ্ছনা। ওদের মধ্যে কারা মেষ আর কারা মানুষ, চোখে দেখেও চেনা শক্ত।

স্যাঙ্গুভেলী যার পীঠস্থান সেই শহুরে মধ্যবিত্তদের প্রায় সবাই কেরাণী। এই কেরাণীদের সঙ্গে কার তুলনা চলে, ডালহৌসীস্কোয়ারে দশটা-পাঁচটায় কেরাণীর পঙ্গপাল দেখে, বহুদিন চেষ্টা করেছি কল্পনা করতে। আর তারপর একদিন চোখ গিয়ে পড়েছে আখের সরবৎ বিক্রী হচ্ছে যেখানে সেইদিকে। বড় বড় আখ, টাটকা, তখনও রসে ভরপুর। মাড়াই হচ্ছে কলে। একটু বাদেই ছিবড়ে পড়ে আছে তার। যতক্ষণ, রস নয় শুধু, রসের গন্ধ আছে এতটুকু, ততক্ষণ চলছে পেষা। তারপর রস ফুরিয়ে গেলেই চলে যাচ্ছে জঞ্জালের গাদায়। আর কেরাণীদের দেখছি রাস্তার ওধারে। তাদেরও পেষা হচ্ছে সরকারী আর সওদাগরী অফিসে। যতক্ষণ রস আছে ততক্ষণই নিংড়ন! তারপর your service is no longer required! একই কল। এক উদ্দেশ্য। এক যন্ত্রণা। এক জীবন।

এ-তুলনা আমার নিজের নয়। আমার এক বন্ধুর। তুলনা-বিহীন তার কমনসেন্স। সেই আমায় বলেছিল, কলকাতা, শুধু কলকাতায় দেখবার এত আছে, দেখাবার আছে এত যে, যে দেখতে জানে সে এখানেই দেখতে পায়। শিল্লী-দিল্লী নয়, নয় কাবুল-কান্দার, হিমালয়ের হিপ্নোটিজম নয়, পৃথিবীতে স্বর্গের কবিতা কাশ্মীরের পাঠ নেবার নেই প্রয়োজন, শুধু ঘুরে এসো কলকাতা!

কার্জন পার্ক। রাতের কলকাতায় সন্ধ্যার রঙীন ভূমিকা। সেখানে থেকে উটরাম বুক্যে। জলের বিজ্ঞাপন স্থলের লোকদের কাছে। চলে যান চিড়িয়াখানায়। বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার মনে হবে, যদি আপনার মন থাকে তবেই, যে বাঘের চেয়ে কখনো কখনো আপনিও কি কম অনিরাপদ? বাঘের চোখে আপনার চেয়ে কী বেশি লোলুপতা? স্বার্থে হিংসায় কামনার কদর্যতায় জানোয়ারের চেয়ে কোন কোন মুহূর্তে আপনি কম কিসে?

চলে আসুন যাদুঘরে। মৃতেরা শুয়ে আছে পরম নিশ্চিন্ততায়। কিন্তু আপনি কী সত্যিই ওদের চেয়েও একটু বেশি জীবিত? সকাল-সন্ধ্যে অফিস, রাতে দুশ্চিন্তা, সকালে দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ছোটা, রবিবার বাজার করা, জীবন কোথায়? বেঁচে মরে থাকা। তার চেয়ে ঢের ভালো মমির জীবন। মরে বেঁচে থাকা।

এরই মধ্যে জেগে আছে পার্ক ষ্ট্রীট।

রাতের রঙ্গপল্লী। দিনের চেয়ে রাতে যেখানে অনেক বেশি আলো। সেই আলোর নীচে অনেক, অনেক অন্ধকার। পার্ক ষ্ট্রীট। নিওন সাইনে নিকনো। মাজা ঘষা চকচকে। পার্ক ষ্ট্রীটে এলে মনে হবে আপনার, কলকাতায় কোথাও বুঝি দুঃখ নেই, অভাব নেই, নেই কোন সমস্যা, সারা কলকাতাই বুঝি এমনি। শুধু গ্ল্যামার। গাড়ী। গাড়ীর মধ্যে হয় গাউন নয় গয়নার পুঁটুলী। সৌখীন স[illegible]খানা। ওমরখৈয়াম সওদা হচ্ছে যে সরাইখানার সিঁড়ির ধাপে। ফি[illegible]জেরাল্ডের ওমর খৈয়াম বিক্রী করছে বিহারী কাগজওলা—চার পাশে ইংরেজি কাগজের মলাটে মলাটে শিহরণ। উদ্দাম, উত্তেজক, রমণীয়।

কিংবা কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, শুধু ঘুরে বেড়ান ট্রামে বাসে। সকাল থেকে সন্ধ্যে। যে অভিজ্ঞতা আপনি আহরণ করবেন, বই-এর পাতায় তাকে পাওয়া অসম্ভব। বাংলা দেশের সাহিত্যিকরা পয়সা হবার পর ট্রাম-বাস ত্যাগ করেন। তাঁরা ভুল করেন। চার চাকার গাড়ীতে গতি আছে, আবেগ নেই। আরাম

আছে, অভিজ্ঞতা কোথায়? চার চাকার গাড়ী দূরের পথকে কাছে নিয়ে আসে, বাড়ায় শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব।

সেই ট্রামে কিংবা বাসে করে এসে নামুন কলেজ-পাড়া, কলেজ ষ্ট্রীটে। কলেজের কি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালের দিকে তাকান। হঠাৎ ভুল হবে আপনার। নীতি না রাজনীতি? শিক্ষা করতে না শিক্ষা দিতে আসা? এ-দল সে-দলের পোষ্টার পড়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে। খবর কাগজের ওপর কালো-লাল-নীল কত রংএর পোষ্টার। যেন পোষ্টারের দেওয়ালী। এবং সব পোষ্টারেরই বক্তব্য প্রায় এক: "আমরা ছাড়া আর সবাই ইম্‌পোষ্টার!"

তবু বাংলা দেশের যৌবন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এখনও শুধু ওই কলেজ ষ্ট্রীটে। উদ্ধত, বেহিসেবী, বেপরোয়া। ভুল করে ছাত্ররাই। ভালো যা কিছু, তা করবার স্পর্ধাও রাখে তারাই। প্রতিবাদে মুখর। হিরো-ওয়োর্শিপিং-এও তুলনাবিহীন। ভরসা রাখা যায় তাদের ওপর। তাদের ভয়ও করে। জীবন আছে। স্বপ্ন আছে। আশা আছে। তাই জীবন নিয়ে তামাসা করবার আছে দুঃসাহস। বাংলা দেশ এখানে ঝিমিয়ে নেই। এই একটি জায়গায় আছে বারুদ। ভালো কাজে আগুন লাগালে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে শতাব্দী-সঞ্চিত অন্যায়কে। মন্দপথে গেলে ডেকে আনতে পারে নিজেদের সর্বনাশ। বাংলা দেশে আজও এগিয়ে চলার মত মানুষ আছে অনেক। নেই শুধু এগিয়ে নিয়ে যাবার মত লোক। কত

কলেজ ষ্ট্রীট পাড়ায় শুধু তরুণ। কিন্তু প্রবীণের [illegible]নে রোজই বাছুরের দলে ভেড়ার দৃশ্য যদি দেখতে চান, তাহলে চলছে আরও ঢুকতে হবে ফুটবল খেলার মাঠে। ইষ্টবেঙ্গল না মোহন[illegible]দি নেই, অন্ত তারই ওপর নির্ভর করছে জীবন-মরণ। এখানে প্রবীণের এ কথা চোখে-নেই অর্বাচীনের। এম-এ পাশ আর ম্যাট্রিক-ফেল [illegible] যত গভীরই এক। খেলা নয়,—কে জিতল? তাই নিয়েই শ, সীমা আ[illegible] ইষ্টবেঙ্গল না মোহনবাগান? বাঙাল না ঘটি? ইলিশ [illegible] কত [illegible]

এই সবের মাঝখানে গোল হয়ে শুয়ে গড়ের মাঠ মনে পড়িয়ে দিচ্ছে মাসের শেষে মধ্যবিত্তের ট্যাঁককে। সহুরে মধ্যবিত্ত-বাঙালী মানেই কেরাণী। মাসের শেষ মানেই সেই কেরাণীদের ট্যাঁক, ওই গড়ের মাঠ।

সত্যিই, বাঙালী কেরাণী ছাড়া আর কী? ইংরেজ যদি দোকানদারের জাত, বাঙালী মানেই তবে কেরাণী।

কলকাতায় সেই কেরাণীদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়, হয় করুণা করা—কখন কখন কাব্যও করা যে হয় না তা নয়, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে যা কখনো করা হল না, তা হল এক সার্থক কেরাণী চরিত্র-সৃষ্টি।

অপ্রিয় সত্য শুধু এ-যুগে নয় সকল যুগেই অচল। এ-যুগের হল, brutal frankness—রূঢ় সত্য। সেই রূঢ় সত্য প্রয়োগ করে বলতে হয় বাংলা সাহিত্যেই এ-যাবৎ কাল কলকাতা অনুপস্থিত। অনুপস্থিত কলকাতার কেরাণী। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত-সমস্যা।

বিত্তবানদের প্রতি সকলের সাজ্ঘাতিক আক্রোশ দেশেই; তবে বিত্তবান হতে কারুর আপত্তি নেই। চাষাদের জন্য সরকারী দরদ সাধারণের সমর্থনে জমিদারী উচ্ছেদ বিলে আত্মপ্রকাশ করছে। শ্রমিকদের সম্বল: নন-কো-অপারেশনের অনার্য-শাস্ত্রসম্মত রূপ: সাম্যবাদী strike, শুধু মধ্যবিত্তের জন্যে মাথা ব্যথা নেই কারুর; ওদের ...য় কম বিচলিত আবার মধ্যবিত্তরা নিজেরাই।

ওমর খৈয়...ীর কলমে মাছিমারা ছাড়া আর কী-ই বা সম্ভব? সে-কাগজের ম... পেষাই হয়, লেখার জন্যে আলাদা কলম চাই। লেখা কিংবা ... তাদের অনেকেরই পেশা হচ্ছে কেরাণীগিরি। তাই বাসে। সকা... অনেকবারই তাঁরা ভুল করে ব্যবহার করেন কেরাণীর করবেন, বই-... বাংলা ভাষায় বই-এর পর বই বেরোয়। ধরা দেয় সাহিত্যিকরা ...ত্ত জীবন। সৃষ্টি হয় না তাদের চরিত্র। কেরাণীগিরির করেন। চা...য় প্রচুর। প্রচুর লেখার ফলে হাতের লেখা দুরন্ত

ভালো হয়। কিন্তু হায়—লেখকের প্রয়োজন লেখার হাত, হাতের লেখা নয়।

সস্তা-ইংরেজী বইএর ফ্যানদের বলতে শুনেছি, আমাদের জীবনে নেই থ্রিল, রোমান্সের নিদারুণ অভাব, স্কোপ কোথায় ওদের মত লেখার। আমাদের একঘেয়ে জীবন। আমাদের সাহিত্যই নাকি তাই। যাঁরা একথা বলেন তাঁরা সাহিত্যের পাঠক নন, থ্রিলের ভক্ত।

সাহিত্যে পাঠক খোঁজে জীবন-দর্শন। লেখকের বক্তব্য। সাহিত্য মানে শুধু মোপাসাঁ আর মম নয়। সাহিত্য মানে রোমাঁ রোলাঁ এবং রবীন্দ্রনাথও।

বাংলা দেশে, এই কলকাতায় লেখার বিষয়-বস্তুর অভাব নয়। অভাব লেখকের। দেখবার জিনিস আছে। দেখবার লোক নেই। ছবি আছে। আঁকবার তুলি চাই। কলকাতার মধ্যবিত্ত মানে শুধু একটি চিত্র নয়। বিচিত্রও বটে।

কেরাণীর মধ্যে চিত্রেরও অভাব নেই, বিচিত্রেরও। কাব্য পড়ে কবিকে যেমন মনে হয়, কবি নাকি তেমন নয় বলেছেন কবিগুরু। 'কেরাণী', শুনলেই যদি কুঁজো, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, নির্জীব যতটুকু জীবিত তার চেয়ে মৃত, সমস্ত সময়ই মুমূর্ষু কোন মানুষের কথা মনে হয়, তাহলে বলা চলে কেরাণী মাত্রেই তা নয়।

ইংরাজী ছাপাখানায় ঢুকলে আপনি দেখতে পাবেন টাইপ কত রকমের হতে পারে, কত ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদের অক্ষর, সেখানে রোজই নতুন নতুন টাইপের খবর আসছে, টাইপ ফাউণ্ড্রীতে চলছে আরও নতুনের পরীক্ষা। কিন্তু কেরাণীদের মধ্যে টাইপের আদি নেই, অন্ত নেই ভ্যারাইটির। সমুদ্র অতল এবং আকাশ অসীম, এ-কথা চোখে-দেখা আপাত-সত্য হলেও, শেষ-সত্য নয়। কারণ যত গভীরই হোক, তল আছে সমুদ্রের, যত বিস্তৃত হোক আকাশ, সীমা আছে তার, এ হল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু কেরাণী আছে কত –

কত পিকুলারিটি তাদের আচারে এবং ব্যবহারে, কি বিচিত্র হতে পারে তারা, কত জাতের, কি অসংখ্য টাইপ পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে,—তার শেষ অঙ্ক এখনও কষা চলছে, উত্তর কোন দিন মিলবে কি না বলা শক্ত।

একথা বলা খুবই ভুল যে, কেরাণীর জীবন মাত্রেই দুঃখের জীবন। কেরাণী মাত্রেই যদি দুঃখী হত, তাহলে আই-সি-এস হলেই লোকে অন্নদাশঙ্কর হত। আর সমস্ত মানুষের মতই কেরাণীদেরও প্রথম সমস্যা, প্রথম ও প্রধান: ব্রেড এবং বাটার। তার পর স্বপ্ন: বাটারফ্লাই এর। রজনীগন্ধার গন্ধ-জড়ান অথবা কিছু চাঁপা কিছু পারুলে মেশা পূর্ণিমার নেশার রাত তাদেরও জীবনে আসে। কবিতা *যাদের কাঁদায়, পাগল করে গান, ভালোবাসায় আকুল হয় যারা,* তারাও কেউ-কেউ এই কেরাণীকুলের।

'Full many a gem' কথাটা কবি কাদের উপলক্ষ্য করে বলেছিলেন, কবিই জানতেন, কিন্তু বাঙালী কেরাণীদের বেলায় কথাটা যত সত্য, এমন আর কারুর বেলায় নয়। কবিতা লেখার, গান গাইবার, ছবি আঁকবার, অভিনয় করবার দুর্লভ প্রতিভা নিয়ে,—প্রতিভা না বলাই ভালো, কারণ প্রতিভা কোন কিছুতেই মরে না, তাই বলছি ক্ষমতা নিয়ে—জীবিকা অর্জনের স্থূল তাগিদে আঠারো বছর বয়সের এ-প্রান্তেই দশটা-পাঁচটার কেরাণীগিরির গারদে ঢুকে নিঃশেষ হয় এমন করে, যে কোনদিন যে, ওসব-কথা ভাবত, এখন তাই ভেবেই তার গতানুগতিক জীবনযাত্রায় যেটুকু হাসির সঞ্চার হয়। তা দেখতে হাসির মতই কিন্তু আসলে তা কান্না। বয়স্ক লোকের-নাকি কাঁদতে নেই, তাই তারা না কেঁদে হাসে। এ হাসি গভীর আনন্দের নয়, সুগভীর বেদনার।

ডালহৌসীস্কোয়ারের সাদা থামওলা বাড়ীটায় অতি বৃদ্ধের মত করেন খতে যে-প্রৌঢ় এই মাত্র ঢুকল, তাকে দেখে সত্যি মনে হয় দের জীবনে আনন্দ নেই। পেনসনের দিন প্রত্যাসন্ন। সেই

অশুভ ক্ষণের আগেই দশরথকে মনে করিয়ে দিতে হবে কৈকেয়ীকে বরদানের প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে বড় ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করলেই, সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকেও ঐ খাঁচায় ঢুকতে দেবার প্রবেশ-পত্রের জন্যে।

কিন্তু কেরাণী-জীবনসমুদ্রে এ মাত্র একটি বুদ্বুদ। অন্যদিকে দেখুন অফিস পালিয়ে গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে হাওয়াইয়ান সার্ট পরে সিগারেট ধরিয়েছে যে রেস্তোরাঁতে বসে এই মাত্র, সেও কেরাণী। মাইনে পায় একশো কয়েক টাকা। কিন্তু কথায়-বার্তায়, কায়দায়-বোলে, চলনে-চালে মনে হবে সে যদি কেরাণী হয় তাহলে রাজা কে? বসে বসে হাসছে রেস্তোরাঁয়। রোনাল্ড কোলম্যান-গোঁফের তলায় তার হাসি যেন *Did you Maclean your teeth to-day*র বিজ্ঞাপন নয়, জিজ্ঞাসা। কিন্তু কেন হাসছে জানেন? হাসছে কারণ এই রেস্তোরাঁয় ওই সময়ে আসে একজন ফিল্ম কোম্পানীর একস্ট্রা সাপ্লায়ার, যাকে সে প্রোডাক্‌শন ম্যানেজার বলে জানে। শকুন্তলা বইতে দুষ্মন্তের রোল তার বাঁধা, বুঝিয়েছে সেই ঝানু মালটি পঁয়ষট্টি কাপ ডবল-হাফ আর অনুরূপ সংখ্যার অমলেট, নয় মামলেটের বিনিময়ে। তাই এই হাসি। শুধু অকারণ পুলকে নয়। ভাবখানা হচ্ছে: আজকে ক্লার্ক কিন্তু ক্লার্ক গেবল হতেই বা কতক্ষণ?

বড় সাহেবের মেজাজে রৌদ্ররুক্ষ ও ফাইল-লাঞ্ছিত কেরাণীর জীবনে অতি অধুনা মেয়ে-কেরাণীরা এসেছে রোমান্সের থ্রিল নিয়ে। প্রবীণ প্রৌঢ় কেরাণীরা ভেতরে কৌতূহল চেপে রেখে বিরক্ত হবার চেষ্টা করেছে। অর্বাচীনেরা চেয়েছে স্মার্ট হতে। জীবিকার প্রয়োজনে বিয়ের পিঁড়ে থেকে কাঠের চেয়ারে এসে বসেছে যারা তাদের মধ্যে জীবন অন্বেষণ হয়ত বাতুলতা, হয়ত তারা অনেকেই দেখতে আকর্ষণীয় নয় মোটেই; তবু বয়সের ধর্ম কিছুতেই বুঝতে

চাইলেও বিশ্বাস করতে দিতে চায় না যে পৃথিবীতে খুব কম রমণীই সত্যিকারের রমণীয়।

রান্নাঘর থেকে অফিসরুমে মেয়েদের এই ট্রান্সফার রক্ষণশীলদের বিষদৃষ্টিকে বিস্ফারিত করলেও, সহর কলকাতায় শানবাঁধানো রাস্তায় চলবার জন্যে এ-পদক্ষেপ অনিবার্য। জীবন নয়, জীবনযুদ্ধে বাঁচবার জন্যেই স্বামী-স্ত্রীতে, পিতা-পুত্র এবং পুত্রীতে সবাই মিলে আনতে পারলেই তবেই কলকাতার মধ্যবিত্তদের হাত থেকে মুখে উঠছে কিছু, নইলে নান্য পন্থা।

আগে ছিল শুধু পড়ানো, নয় আমাদের দেশের হাসপাতালে নার্স হওয়া। সে প্রফেসনের সঙ্গে সেবার কতটুকু সম্পর্ক ছিল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও বলা চলে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আদর্শর থেকে তা ছিল অনেক দূরে। তার জন্যে মেয়েরা দায়ী ছিল না, ছিল এই প্রফেসনের জন্যে যথেষ্ট মর্যাদার অভাব এবং দূষিত এ্যাটমশফেয়ারের প্রভাব। টেলিফোন আর ষ্টেনো—সেখানে কালো মেয়ের অভাব ছিল না—কিন্তু ভারতীয়েরা ছিল অস্পৃশ্য।

আজ মেয়েরা শুধু বিয়ের সমস্যা নয়, বিয়ে না করে উদ্বাস্তু পিতার কী করে সংসার চলবে তারই জটিল সমাধান।

এতে সমাজের ভালো হয়েছে কী মন্দ হয়েছে সে প্রশ্ন সমাজ নেতার, এ-আলোচনার নয়। শুধু বাংলা সাহিত্যের স্কোপ বেড়েছে আরেকটু, নায়কের সঙ্গে নায়িকার দেখা করানোর কমেছে দুশ্চিন্তা। ইংরেজি বই-এর নকল করার তাগিদ সেদিন থেকেই কমেছে যেদিন থেকে ইংরেজ-জীবনের নকল করতে শুরু করেছি আমরা।

ছেলেরা করলেও যা মেয়েরা করলেও তাই, চাকরী সুখের নয়। কিন্তু ডালহৌসী স্কোয়ারে কেরাণীপাড়ায় গাড়ী চড়ে যাঁরা আসেন কাজ করতে, তাঁদের অনেকের শাড়ীই একটু বেশি দামের, সেন্টের গন্ধও একটু যেন ফরাসী সন্ধ্যার, জুতোর ওপর জরির কাজ বড্ড প্রকট, ভ্যানিটি ব্যাগে যতটুকু জিনিস আর

তার চেয়ে বেশি যেন ভ্যানিটি উপচে পড়ার। তাঁরা কারা? মনে হয় বি. এ. পাশ করে ফেলে বড় লোকের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না উপযুক্ত পাত্রের অভাবে, (উপযুক্ততা রজত-কৌলীন্যে), অতএব চাকরী করতে আসা। সখের চাকরী। এ তাঁদের বাড়ীতে না ঘুমিয়ে অফিসে এসে ফাইল-ফাইল খেলা। কিন্তু কথামালা সেই একেবারে শৈশবে একবার পড়া, নাহলে তাঁদের মনে পড়ত কারুর পক্ষে যা খেলা আর কারুর পক্ষে তা মৃত্যু। মনে পড়ত সে দেড়'শো টাকার এই সখের চাকরী না করলে হয়ত ইউডিকোলনে রুমাল ভিজত একটু কম, আধুনিকতম ফ্যাশানের শাড়ী গায়ে উঠত একটু দেরীতে, সিনেমা আর ফ্যারাজিনিতে যাতায়াতের সংখ্যা এগুত বিলম্বিত লয়ে, কিন্তু ভরত একটি বিধবা মায়ের বুক বেকার পুত্রের চাকরী পাওয়ায়, অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকা ভাই-বোনের চোখে জ্বলে উঠত আলো, দেশের ভবিষ্যৎ বর্তমানের মত হয়ত অন্ধকার হত না এতটা।

দের

তিন

পরশুরাম-রচিত 'গড্ডলিকা,' কথাটা গড্ড না গড্ডালিকা বলতে পারেন 'চলন্তিকা'-কার রাজশেখর বসু। সেই গড্ড অথবা গড্ডালিকা-স্রোত দেখতে হলে আপনার হাওড়ার পুলে গিয়ে দাঁড়াতে হবে কিছুক্ষণ। হয় দশটার আগে, নয় পাঁচটার পর। পিঁপড়ের মত ওরা কারা?—মানুষ নয়, ডেলি প্যাসেঞ্জার। সহরতলী থেকে আসছে সহরে। জোনাকির পথ ছেড়ে জোঁকের মুখে।

বংশের পর বংশ, বছরের পর বছর ধরে ওদের এক পরিচয়; ওরা শুধু কেরাণী। যমে ধরলেও কখন কখন ছেড়ে দেয় কিন্তু সিগারেট আর 'চা'-এ ধরলে যেমন ছাড়বার প্রতিজ্ঞা আছে কিন্তু ছাড়ান নেই, কেরাণীগিরিও তেমনি, সেই গুহার মত, ঢোকবার রাস্তা আছে, নে...রুবার পথ বন্ধ। ডাক্তারের মুখে শুনবেন ছেলেকে ইঞ্জিনীয়র করার আ... ব্যারিষ্টর বাবার ছেলে বিলেত যায় ব্যারিষ্টর হতে নয় জর্ণালিজম পিতার কী...। আই-সি-এস-তনয় হয় সরকারের শত্রু, প্রফেসর-পুত্রের এতে ...লম-ষ্টার হওয়া। শুধু কেরাণীর পর-বংশে সবাই কেরাণী। নেতার, 'ম্যাট্রিক-ফেল করলেও হত, এখন বি-এ পাশ না করলে নয়।' আরেক...গে গুদাম থেকে উঠতে হত বড় বাবুতে; এখন ...প্লয়মেন্ট ইংরেজি...এক্সচেঞ্জ থেকে চাকরীতে ঢুকেই গড়তে হয় ইউনিয়ন। বেসিক পে থেকে আর ডিয়ারনেস এলাওয়েন্সের দাবীতে ডাকতে হয় মিটিং। তবুও কেরাণীগিরি ছাড়া কোনও রাস্তা নয়। বি. এল. পড়ছে ...র জানে বাবা যেদিন বলবে, কাল সাহেব ডেকেছে, সেইদি... ল'-ক্রীশ্চান ল'-মহামেডান ল' সব গুলিয়ে জেবড়ে ভুলে ... করে সব হ-য-ব-র-ল। ডাক্তাররা যতই বলুক, হেরিডিটরি রো... ছুটি: ইনস্যানিটি এবং এই কেরাণীবৃত্তি। জাত ব্যবসা কেরাণীগিরি হল জাত জীবিকা। (বছরের পর বছর নিয়...

বার করবার দায়বদ্ধতায় যেমন কেরাণীর মত কলম পিষলে তবেই আপনি আজকের বাংলা দেশে জাত সাহিত্যিক,—ঠিক তেমনি।)

যত দিন শুধু ধুতি সম্বল তত দিন যেমন আপনি বাবু,—চাঁদনী থেকে কেনা বালিশের খোল পায়ে গলালেই যেমন 'সাহেবে' আপনার ডাকোন্নতি, তেমনি কেরাণী এবং ইস্কুল মাষ্টারদের থেকে গা বাঁচাবার জন্যে মধ্যবিত্তরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, নিম্ন এবং উচ্চ। কারুরই বিত্ত নেই তবুও নিজেকে কেরাণী না বলে যেমন এ্যাসিষ্টেন্ট বলা, ক্যানভ্যাসার কথাটা কানে বেখাপ্পা ঠেকে তাই সেলসম্যান সাজা, সেলসম্যান বললে বিজনেসের স্ফীতি বোঝানো শক্ত বলে চীফ অরগ্যানাইসর, তেমনই ভাড়া বাড়ীতে সময়ে ভাড়া-না-দিতে পারা রেফ্রিজারেটরের মহিমায়, রেডিও রাখার কৌলীন্য এবং কখনও-কখনও হায়ার পার্চেসের কৃপায় চার চাকায় চাপার দুর্মূল্য দাপটের নাম উচ্চ মধ্যবিত্ত। অনেকটা, কালো চামড়ার ছোঁয়া থেকে গা বাঁচাতে যেমন একই কামরাকে ইয়োরোপীয়ান থার্ড বলে আত্মতৃপ্তি।

তেমনি কেরাণীরা এক জাঁতিকলে পড়েও এক জাত নয়। তাদের ধাম এক, কিন্তু নাম আলাদা। অফিসের সেক্রেটারী যিনি আর যে গুদামে সবে ঢুকেছে দুজনেই কেরাণী, দুজনের কাজও এক, লেজার—মানে হিসাব ঠিক রাখা। একজন খেটে তৈরী করে, আরেকজন সই করে। *নস্যি টানে একজন, অন্যজন পাইপ।* একজনের পরনে হাওয়াইয়ান, আরেকজনের ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে ঢোকে শুধু হাওয়া। একজনের মাইনে চার ফিগারে, চেক মারফৎ জমা হয় ব্যাঙ্কে, আরেকজনের মাইনে পাওয়া মাত্রই ক্যান্টিন থেকে দারোয়ানের বাকী বকেয়া শোধ করে বাড়ী যায় এক-চতুর্থাংশ। তাই বৃত্তি এক হলেও বৃত্তান্ত আলাদা হতে বাধ্য।

বাঙালীকে দিয়ে ব্যাবসা হয় না অবাঙালীদের এই কথা অবাঙালীরা কতটা বিশ্বাস করে বলা সহজ নয় কিন্তু বাঙালী যে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে কই? বাঙালী

কেরাণী হয়। কেরাণীতে পাকা হয়ে বসবার পরেই বিয়ের পাকা দেখা হতে দেরী হয় না। নিজের জীবনে বউ আর একপাল পুত্র-কন্যার সমস্যা-জর্জরিত পিতার শেষ কাজ। মায়ের চোখের জল। রোমান্টিক উপন্যাসের প্রভাব। ছেলে উলুবেড়েতে গিয়ে বউ নিয়ে আসে। জীবনে প্রথম উলু বেড়ে লাগে শুনতে। কিন্তু সে ঐ প্রথম দিনই। তারপর দৈনন্দিন দুশ্চিন্তায় প্রথম রাত্রির ফুলশয্যা সরে গিয়ে দেখা দেয় সারাজীবনের শরশয্যা।

কেন এমন হয়? বিয়ে করার জন্যে? একাধিক সন্তান প্রতিপালনের প্রতিক্রিয়ায়? এমনও মনে করা অসম্ভব নয় যে, বাপ বুঝি নিজের জীবনে জ্বলে-জ্বলে ছেলেকেও জ্বলতে দেখে তৃপ্তি পান, তাই বিয়ে দিয়ে অল্প বয়সে তুষে ধরিয়ে দিয়ে যান আগুন। সেই ল্যাজ-কাটা শেয়ালের ইতিবৃত্ত, সবায়ের ল্যাজ কেটে তবেই যার তৃপ্তি। না, তা নয়। বিয়ের প্রয়োজন আছে, নইলে সমাজের প্রয়োজন কোথায়? চেষ্টারটনের রাস্তায় যেতে যেতে অবাক হওয়ার কথা মনে পড়ে। Should Barbars marry?—এই সাইনবোর্ড দেখে থমকে ছিলেন জি. কে. সি.। বলেছিলেন মনে মনে, এ-ও একটা প্রশ্ন?—মানুষের সমাজ-ধারণের মৌল প্রয়োজন নিয়েও প্রশ্ন? সত্যিই তাই। বই-এর পাতায় বোহেমিয়ানের বেপরোয়া বৃত্তি উত্তেজিত করে কিন্তু জীবনে তার সাক্ষাৎ করে বিরক্তির উদ্রেক। সংসারের সবটুকু সুবিধা নেব, কিন্তু বিয়ের বেলায় দাঁড়াব সরে, এ-হল আগুন নিয়ে খেলব, কিন্তু গায়ে লাগাব না আঁচ।

কিন্তু তা নয়। বিবাহিত জীবনের চেয়ে বোহেমিয়ান লাইফে ব্যয়-বাহুল্য অনেক বেশি। হতে পারে একদিন জীবনসঙ্গিনীকে যাঁরা 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে'-র জন্যেই মাত্র ঘরে আনতেন, তাঁরা ব্যয়ের কথা বাদ দিলেও স্বাস্থ্যের কথাও চিন্তা করতেন না। আজ সত্যিই এক পাল বাচ্চার কথা ভাবাই যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে বিয়ের কথাও

[illegible]তাল যা না, বাতিল করতে হয় বিবাহও,—এতে সায় দেওয়া কেরাণীর অপরিণামদর্শিতার, অবিমৃষ্যকারিতার এ আরেক অনুপম দৃষ্টান্ত।

বিয়ে করতে ভয় পাওয়ার সব চেয়ে বড় কারণ আমরা স্বস্তি চাই না, সুখ চাই। আনন্দ নয়, কমফর্ট; বাঁচা নয়, ছোটা; ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস নেই, গ্লামারেই যা কিছু আকর্ষণ; জীবন নয়, শুধু থ্রিল। ঘরণীর শ্রান্তি দিয়ে ঘরের শান্তি, ক'জন চায় তা আজ? তাই পথে কিম্বা পথের ধারের পান্থশালায় সবাই খোঁজে সঙ্গিনী, যে জীবনে আনবে উত্তেজনা কিন্তু দায়িত্ব দেবে না কিছুই। ঘর ছাড়া মন, ঘরণী-ছাড়া ঘর, বিংশ শতাব্দীর একে কী বলব? ট্র্যাজেডি? কমেডি? —না, এ হল ট্র্যাজি-কমেডি! সিরিয়স নয়, কমিকও নয়, সিরিও-কমিক।

কেরাণীদের জীবন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত জীবন, বাঁধা মাইনের চাকায় বাঁধা তাই নিরুদ্বেগ স্বাধীন জীবিকার মত বাইরের চিন্তা মাথায় করে ঘরে ফিরতে হয় না, এমন ধারণা অনেকেরই। কিন্তু ছককাটা দৈনন্দিন ইতিহাস যে নিছক নিশ্চিন্ততার নয় তা বোঝবার জন্য কেরাণী হতে হয় না। আরামের তো নয়ই, জীবন-সংগ্রামে অত্যন্ত অল্প হাতিয়ার নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া, হাতে কিছু না রেখে হাত থেকে মুখে তোলা, কেরাণীদের সংসারে শুধু আজকের দিনটাই অন্ধকার নয়, আগামী দিনেও আশা কম, সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

বাঁধা-চাকরী করে না যারা তাদের ধারণা তাদের রিস্ক বেশি, বাধা বিপুল, অবসর অল্প। তাই কেরাণীর জীবন তাঁদের চোখে নিশ্চিন্ত। এ হল সহরের মানুষের মফস্বলে আসা। ভীড় থেকে নির্জনতায়। সবুজ দেখে চোখ জুড়নো। কিন্তু সে ঐ ক'ঘণ্টার জন্যেই। গাড়ীতে যেতে যেতে মেটে বাড়ী দেখে উল্লসিত হওয়া। গোলপাতার ছাউনী, ধানের ক্ষেত, রাখালের বাঁশী, কোন এক গাঁয়ের বধূ,—তাই নিয়েই কয়েক মুহূর্ত কাব্য করা। থাকতে হত যদি রোদে-জলে-ঝড়ে, বিনা

চিকিৎসায় মরতে হত যদি, দিনের পর দিন বছরের পর যায়ুর পাক[illegible] হত যদি বন্যায়, কাঁদতে হত যদি অনাবৃষ্টিতে, ঘরের সম্বল। [illegible]াল পুত্র-হাতে তুলে দিয়ে বেরুতে হত সহরের পথে, দাঁড়াতে হত [illegible]হিন করে এক বাটি খিঁচুড়ীর অমৃত-প্রত্যাশায়, তখন? তখন মনে হত ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা! ও শুধু কবিতাই, শোনবার এবং শোনাবার, সত্যি সত্যি আশা করবার মত কিছু নয়।

কেরাণীতে-কেরাণীতে গরমিলের কথা এর আগে বলেছি; এখন মিলের কথাটা বলি। সওদাগরী কি সরকারী কিংবা কর্পোরেশনেরই, সাময়িক, স্থায়ী অথবা পেনসন-সমাগত কিন্তু এক্সটেনসনে বহাল ঝানু মাঝবয়েসী আর সন্থ-কেরাণী, বড় বাবু, টেলিফোন ক্লার্ক অথবা ষ্টেনো, সব কেরাণী একটি জায়গায় এক। জিজ্ঞেস করলেই শুনবেন, আর বল না ভাই, আমার অফিসে যা কাজ, আর কেউ হলে মরে যেত। যেন অফিসটা তার নিজের, খাটুনীর সব ফল যেন সে পাচ্ছে, কিংবা তার ধারণায় শুধু সেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করছে, আর সবাই বোধ হয় উপায় করে মাথার ইউডিকোলন পায়ে ঢেলে। এমন কোন কেরাণী নেই, চেয়ারে চাদর জড়িয়ে রেখেই শুধু যার বরাবরের এ্যাটেণ্ডেন্স, তাদের ধরেও দেখবেন, এমন কোন কেরাণী নেই যাকে, আপনি তো তোফা আছেন, খাটতে হয় না তেমন, বললে রেগে না যায়। যেমন না কি লোককে খলিফা বললে লোকে রাগ করে না, আজ-কাল তো খুসীই হয়, কিন্তু আলোয়ান বেচার নাম করে যাকে প্যাকেটের মধ্যে দড়ি গছিয়ে দিয়েছে তাকেও বোকা বলে দেখুন আপনার প্রাণ যায় কি থাকে!

আকাশ-পাতাল, এই কথাটা শুনে অথবা লেখায় পড়ে পুরো তাৎপর্য অনুধাবন অসম্ভব। ও-কথার মধ্যে পার্থক্যের যে বিপুলতার প্রাচীর খাড়া করা আছে তার মর্ম গ্রহণ করতে আপনাকে যেতে হবে ওই কেরাণীদের মধ্যেই, একবার নয় দু'বার। একবার মাসের প্রথমেই, আরেক বার মাসের বিশ-একুশ তারিখে। মেজাজের আকাশ-

পাতাল ফারাক মালুম হবে তবেই। মাসের প্রথমে, মাইনের দিনে, কেরাণীর মত দিলদরিয়া বুঝি হারুণ-অল-রসিদও নন। চলুন—চলুন চা খেয়ে আসা যাক, কাজ তো আছেই সারা মাস। আপনি 'না' বললে, জবাব এল, এ তো রাগের কথা হল দাদা। পৃথিবীর সকলের প্রতি সেদিন অনুরাগের পালা; সেই কেরাণীর কাছেই যান মাসের বিশে-একুশে। যান, যান মশাই, দেখছেন না কত কাজ। শুধু কি আপনার জন্যেই অফিস নাকি। কথা শুনে এবার আপনারই তাকে নরম করার চেষ্টা, আহা রাগ করেন কেন।—না, রাগ করবেন না কাজের সময় এসেছেন অকাজের কথা নিয়ে। মাসের বিশ তারিখ, গত মাসের টাকা খরচ হয়ে গেছে যার দশ দিন আগে, পরের মাসে টাকা পেতে যার দেরী দশ দিন,—মাসের সেই বিশ তারিখ কেরাণীর কাছে বিষতুল্য। সেদিন সমাজ সংসারে মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব। দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,—এ কোন তরুণ-তরুণীর কথা নয়, এক কেরাণীর সামনে বসে আরেক কেরাণী। দু'জনেই উচ্চারণ করছে মনে মনে, সংসারে কী জ্বালা।

হ্যাঁ, জ্বালা বলতে মনে পড়ল। এক ভদ্রলোক জালা কিনতে বেরিয়েছেন বাজারে, সবচেয়ে বড় জালা কিনতে এ-দোকানে সে-দোকানে। আরেক ভদ্রলোক সেই কথা শুনে টেনে নিয়ে গেলেন হাত ধরে, সবচেয়ে বড় জালা চান, আসুন আমার সঙ্গে। বলে নিয়ে গেলেন একেবারে নিজের বাড়ীতে। নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন: বাড়ী-ভাড়া বাকী পড়েছে ছ' মাসের। বাড়ীওলা ইজেক্‌শন স্যুট ফাইল করেছে, দাঁড়াতে হবে রাস্তায়। ছোট ছেলেটার হাম, ১০৫° ডিগ্রী জ্বর। ডাক্তার ডাকার বোধ হয় আর রাত পোয়ালে দরকার হবে না। বড় ছেলের মাইনে দেওয়া নেই স্কুলে, সে ডাংগুলি খেলে বেড়ায়। মেয়ের বয়স বাইশ, পাত্র আছে, পণের টাকা নেই। গিন্নীর বাত, আমার ডায়বেটিস। এখন বলুন, সংসারে এর চেয়ে বড় জ্বালা কোথাও পাবেন?

সেই—মানে

তাই বলি, পৃথিবীটা কার,—এ প্রশ্নের উত্তর ওর মধ্যেই আছে। এই ধাঁধা যতই ছেলেমানুষী হোক, যে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই, তা হল পৃথিবী সত্যই টাকার, আর কারুর নয়।

আকাশ-পাতাল কথাটা তুলেছিলাম একটু আগেই। সেই কথাতেই ফিরে আসি। সরকারী অফিসের আর সওদাগরী অফিসের কেরাণীর মেজাজে আকাশ-পাতাল ফারাক। একজনের চাকরী যাবার ভয় নেই, বড় জোর বদখাতায় নাম উঠবে, খুব বেশি শাস্তি হল ট্রান্সফার, তহবিল তছরুপ প্রমাণ না হলে সরকারী অফিসে কেরাণীর কিছুই হয় না ; আর সওদাগরী অফিসের কেরাণী, তার সর্বদাই বুক ঢিপ-ঢিপ। কাজে, ব্যবহারে, ফাইল ফেলে রাখায়, অফিস আসতে দেরী হওয়ায় একবার ওয়ার্নিং, তার পরই বিল্বপত্র শোঁকা। এখন পাশার দান উল্টে গেছে। ইউনিয়নের মহিমায় বেসরকারী অফিসে এখন চাকরী যাওয়া শক্ত, আর স্বাধীনতার কৃপায় সরকারী অফিসে এখন পার্মানেন্ট হওয়া অসম্ভব।

সরকারী কেরাণীর মেজাজ সরকারের চেয়েও এক ধাপ চড়া। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি যে কারণে চিরকাল দড়। এই মেজাজের সঠিক পরিচয় পাবেন সরকারের কাছে বিলের টাকা আদায় করতে গেলে। দিনের পর দিন, সেই এক জবাব : এখনও পাশ হয় নি। কিছু বলতে গেলেই, লিখে জানান—এই জবাব সঙ্গে সঙ্গে তৈরী। এখানে বড় কর্তাদেরও করবার নেই, কেরাণীই বিল শেষ সই করবার ধাপ পর্যন্ত মা-বাপ। যথাসর্বস্ব পণ করে টেণ্ডার ধরেছিলেন। মাল দিয়েছিলেন। বিল পাশ করাতে করাতে আপনি তারপর কখন নিজেই খাল হয়ে গেছেন টের পান নি।

মাঝে মাঝে ভাবি, যে বাড়ীতে প্রায় কিছুই রাইট নয় সে বাড়ীর নাম রাইটার্স বিল্ডিং দেওয়া কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন দেওয়ার প্রথমেই, ..কার মানায়।

ছাপার জগতে সব চেয়ে বড় সাইজের টাইপ সীসের হয় না, কাঠের হয়। কেরাণীর হাটেও সবচেয়ে বিচিত্র জীব সাধারণ বাবুরা নয়, বড় বাবু। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ হয়নি, কিন্তু নিঃসংশয়ে যে আরেক জন প্রতিভা এদেশে এসেছিলেন তিনি আবোল-তাবোলের সুকুমার রায়। হেড অফিসের বড় বাবুকে তিনি অমর করে গেছেন।

বড় বাবু বলতে যদিও বোঝায় মাত্র একটি লোককে, তবুও তার মধ্যে বাস করে অনেক গুলি লোক। বাড়ীতে বউএর কাছে এক রকম, অফিসে সাহেবের সামনে যেমন, সাহেব চলে গেলে তেমন নয়। সোম থেকে শুক্রবার যে রকম, শনিবার সে রকম নয়।

বড় বাবুর আসল টাইপ যদিও এক টানে এঁকে দেখানো শক্ত, তবুও একথা বলা চলে যে, বড় বাবুরা বাইরে থেকে দেখতে একই রকম। মাথায় টাক, ভুঁড়ি হয়েছে, গায়ে গলাবন্ধ কোট, কোটের ওপর লম্বা হয়ে ঝুলছে চাদর. আগে ঘড়ি পকেটে থাকত, এখন হাতেই বাঁধা হয় ঘড়ি। সঙ্গে পানের কৌটো অবধারিত। মুখ এই অকারণে গম্ভীর, এই হাস্যবিগলিত। লোকচরিত্রের তালিকায় অনবদ্য বস্তু এই বড় বাবুর কাজ অনেক। সাহেব হচ্ছে মা-বাপ। কোথায় কোন লোক ছড়াচ্ছে অসন্তোষ, বড় বাবু সেই কথা তুলছে গিয়ে সাহেবের কানে। সাহেব এক চোখ রেখেছে সেই লোকের ওপর, বড় বাবু জেনে গেছে সাহেব-জাতকে পুরো, তাই জানে সেই সঙ্গে সাহেব আরেক চোখ রেখেছে তার ওপর—কাজেই কথাবার্তায় খুব সাবধান; সেই পুরাতন অথচ অব্যর্থ প্রতিষেধক মনে রাখা : দেওয়ালেরও কান আছে। ইয়ারদের সঙ্গে মজলিশি গল্পের মধ্যেও তাই সাহেবকে [illegible]রে টানা,—নৈব নৈব চ।

বাড়ী থেকে বেরুবার সময় তো বটেই—ট্রামে যেতে যেতেও ঠাকুর দেবতা যেখানে যত আছে—গাছ, নুড়ি থেকে মন্দির, সর্বত্র বড় বাবুর ভক্তিতে কম্পিত হাত কপালে ঠেকানো। তার একটু বাদেই—মানে

তারা তারা বলে কেঁদে ওঠার পর কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই যেসব কথা ওই বড় বাবুর মুখে তারস্বরে উচ্চারিত হয়, তার উৎসের সন্ধান পাওয়া যেত অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও যদি থাকত একটি অশ্লীল কথার অভিধান,—নইলে নয়।

বাড়ীতে তামাক টানেন, ন্যূনতম খরচে নবাবী নেশা স্বাস্থ্য-অর্থ দুই রক্ষা করে। সিগারেট কেনেন না, তবে খান, যদি কেউ দেয়। কিছুতেই আসক্তি নেই, তবে কেউ কিছু দিলে, 'না' বলায় অভ্যাসও কম। পাঁজী না দেখে বেরুন না, সে যে-কাজেই হোক, ভালো অথবা মন্দ। কাউকে কখনও যে বাড়ীতে এনে খাওয়ান না, তাও নয়। অফিসে খোঁজ-খবর করে মনোমত কাউকে মনে মনে জামাই করবার ইচ্ছে পোষণ করেন যদি, বাড়ীতে একদিন ডাক পড়ে তার। গিন্নী নিজের হাতে রেঁধে খাইয়ে বলেন : সব আমার পুঁটি মা'র রান্না ফেলতে পারবে, না কিছু। দরজার আড়াল থেকে পুঁটি সব শোনে, বিশ্বাস হয় না বুঝি তবুও। অতিথি বিদায় হলে এক গাল তামাক ছেড়ে দিয়ে বড় বাবু বলেন : খাসা ছেলেটি, কী বলো গিন্নী। গিন্নী মুখে কিছু বলেন না, সেদিন পুজোয় বসেন একটু বেশীক্ষণ ; সেদিন চারটে বাতাসার ওপর এক কোয়া কমলা লেবু বেশী জোটে গৃহ-দেবতার। মে সেদিন ছুটি মেলে। উনোনের কাছে আসা বারণ হয়—রং হয়ে গেলে কে নেবে ঘরে আর ?

কলম যাঁদের তরোয়ালের চেয়ে ধারালো তাঁরা তো বটেই, কলম ফেলে যাঁরা তরোয়াল তুলে নিয়েছেন তাঁরাও কেউ কেউ কেরাণীই ছিলেন। বাঘা জ্যোতিন আর রাসবিহারী,—দুই অগ্নিস্ফুলিঙ্গই কেরাণীদের মধ্যে থেকে ছিটকে পড়েছেন। কেরাণীদের হাত দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে, লেখা হয়েছে কবিতা, উপন্যাসের হয়ো আবির্ভাব। চিকিৎসা-শাস্ত্র থেকে যাদুবিদ্যা পর্যন্ত বাঙালী প্রতিভ জন্ম প্রায়ই মধ্যবিত্ত—তথা কেরাণীকুলে। এ কথা ভুললে চলবে

যে, মধ্যবিত্তরা বিত্তহীন প্রায় সবাই,—কিন্তু চিত্তে বিত্তবানদের মত দীন নয় তারা অনেকেই।

কেরাণীদের সব কথা বলেও সব কথা বলা হয় না যাদের কথা না বললে, পুরুষের জীবনকে উদ্দীপিত করার মূলে তারাই; জীবনীতে উপেক্ষিত হয়, অনুচ্চারিত থেকে যায় তারা মহত্তমদের আলোচনায়। জীবন-সংগ্রামে অন্তরাল থেকে জোগায় জীবনীশক্তি, যাদের কথা মনে থাকে না কেরাণীর, আর যাদের ভুলে যাই আমরা, তারা কেরাণী-ঘরের বউ।

অভিনেত্রীদের ছবিতে-ছবিতে ছয়লাট আজকের সাময়িক-পত্র। তারা কী খায়, কী রাঁধে তার সচিত্র বর্ণনাই আজকের কাগজের একমাত্র অবলম্বন; তারা কী দিয়ে চুল বাঁধে, গায়ে কী মাখে, চায়ের সঙ্গে কী খায়, বিজ্ঞাপনেও তারই বিচিত্র ঘোষণা। অভিনেত্রী ছাড়া আর যাঁদের ছবি কখনও-কখনও ছাপা হয়, খবর-কাগজে খবর হন যাঁরা, তাঁরা মাননীয়া দেশনেত্রী। বিদেশে তাঁরা আমাদের দেশের বাড়িয়েছেন গৌরব। তাঁরা বিদূষী, তাঁরা উচ্চশিক্ষিত, তাঁরা বাগ্মী। বিপুল তাঁদের মহিমা, বিচিত্র তাঁদের স্বার্থত্যাগের ইতিহাস। তাঁরা সত্যিই বড়। তাঁদের চেয়ে অনেক ছোট পৃথিবীতে বাস করে মধ্যবিত্ত লোকের এই উপেক্ষিত জায়ারা। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্বেগ নেই তাঁদের, সমস্যা শুধু কালকে হাঁড়ি-চড়ার। খুব ছোট সমস্যা, সমাধান তাই বুঝি অনেক শক্ত।

শুধু সাধারণ লোকের নয়, অসাধারণ প্রতিভার বেলায়ও তাই। আমরা যারা মধুসূদনের মধুটুকু শুধু নিয়েছি, তাঁরা কী বুঝব কোন দিন নিমচাঁদের তিক্ততা হাসি মুখে তুলে নিতে হয়েছিল যে বিদেশী আইভিলতাকে, সে কত বড়।

কেরাণীদের সংসার ভেসে যেত কবে, যদি এই বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে না রাখতে পারত তাদের স্ত্রীরা। আজ গোয়ালার বাকী, কাল ছেলের পড়ার বই নেই, তার মধ্যে আছে আত্মীয়দের পীড়ন,

লৌকিকতার লজ্জা। সেক্সপীয়র পড়তে পারে না, মেট্রোর নাম শুনেছে, দেখে নি কোনদিন। তারা সোসাইটি লেডি নয়, ঘরের বউ। ওদের একজন ছেঁড়া জামা পরতে দুঃখ পায় না, লজ্জা পায়; আরেক জন পিঠ খোলা না রাখলে হাঁফিয়ে ওঠে, আপাদমস্তক ঢাকা পোষাক দেখলে বলে, বিশ্রী! ওদের এক জন ঝুটো-মুক্তো হলেও সাজতে ভালোবাসে। আরেক জন সোনার গয়না খুলে দেয় সংসারের তাগিদে। খুলে দিয়ে হাল্কা হয়—কারণ সোনার চেয়ে তারা খাঁটি!

এমন একটি কেরাণী-বউকে জেনেছিলাম। বুঝেছিলাম সোসাইটির দায়ের চেয়ে বড় সংসারের দায়িত্ব। *'Life'* উপভোগ করার চেয়ে অনেক বড় জীবন-সংগ্রাম। পাণ্ডিত্যের চেয়ে বড় চরিত্র।

সেই সামান্য কেরাণীঘরের অসামান্যা যে বউটির কথা বলতে যাচ্ছি, তার নাম দুর্গা।

চার

দুর্গা। কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল। সারা শরীর জুড়ে সৌন্দর্যের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্য, রূপের চেয়ে লাবণ্য। রং কালো। একটু বেশি দৃপ্ত, তেজী, চঞ্চল। হেঁটে ঘোরা-ফেরা করে, মনে হয় ঘোড়ার পিঠে ঘুরছে। টগবগ করছে সর্বদাই, কাজে আর কথায়। হাসিতে আর গানের সুর গুন্-গুন্ করায়। দু'টি চোখ জুড়ে একটি কবিতা: এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে হঠাৎ খুসী ঘনিয়ে আসে চিতে।

দুর্গার সঙ্গে পরিচয় সেই এতটুকু বয়েস থেকে। ফ্রক পরে লরেটোয় পড়তে যায় বাড়ীর গাড়ীতে। যখনকার কথা বলছি, তখন কলকাতায় নিজের বাড়ী ছিল অনেকের কিন্তু নিজেদের গাড়ী ছিলো বেশি লোকের নয়। বাবা কটন মিলসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। দাদামশায় ডাকসাইটে ব্যারিষ্টর। সে-দিনকার সেই পরিচয়ের ওপর ধুলো পড়ে গেছে অনেক। ভুলে গিয়েছিলাম দুর্গাকে। তারপর একদিন প্রথম বৈশাখের নতুন ঝড়ের দিনের এক সন্ধ্যেবেলায় উড়ে গেল অনেক দিনের ধুলো। বেরিয়ে এল সেই ছবি—যে ছবি অযত্নে মলিন হয়েছে, কিন্তু গ্লানি জমতে দেয় নি কোথাও!

কেমন করে দুর্গাকে আবার আবিষ্কার করলুন? নতুন পরিবেশে কেমন করে হল নতুন পরিচয়? সেই নব-জন্মান্তরের ইতিহাস আছে একটু। সে-ইতিহাস এই নতুন জন্মের চেয়ে কম বিচিত্র নয়। যেমন খেলায় জেতার চেয়ে কেমন-করে-জিতলর ইতিহাস নয় একটুও কম রোমাঞ্চর।

এই আবিষ্কারের জন্যে আমাকে যেতে হয় নি কোথাও। পায়ে হেঁটে হিমালয়ে নয়, রিপোর্টার হয়ে নয় দিল্লী, প্রত্নতত্ত্বের পাত্তায়

খারাপ করতে হয় নি চোখ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আমাকে দেয় নি এর পাঠ, বিদেশী গল্পের মধ্যে খুঁজতে হয় নি এর অভিজ্ঞতা। কলকাতায় কুড়িয়ে পেয়েছি এক দিন। ঘরের কাছে হাত বাড়িয়েই পেয়ে গেছি তাকে। বুঝেছি মানুষের চেয়ে বড় মানুষের জীবন। আগুনের চেয়ে বড় তার আলো। অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় অভিজ্ঞতার ইতিহাস।

সত্যিই আমার অভিজ্ঞতার ইতিহাসে ছবি আছে অনেক, কিন্তু তার পত্রসংখ্যা পরিমিত। ভ্যারাইটি আছে, গ্ল্যামার নেই। এ কোন বিনয়-বচন নয়, সত্যভাষণ। কারণ ট্রামে করে কার্জন পার্কে নেমে সেখান থেকে উট্রাম ঘ্যাকে এই আমার সব চেয়ে বড় ভ্রমণ।

ভ্রমণের মত বিভ্রম আর কিছু নেই, আমার ধারণা ছল এই। দেশে-দেশে, অথবা দেশে-বিদেশে নিত্য-ভ্রাম্যমাণদের আমি সমীহ করে চলি। তাদের মনের প্রসার হয়ত বিপুল, জীবনের অভিজ্ঞতা 'হয়ত' কেন, নিশ্চয়ই বিচিত্র। আমার তবুও সেই,—

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির-বিন্দু॥

আসলে হয়ত এ সব কিছুই নয়, আসলে আমি জাত-কুঁড়ে। পৃথিবীর সেই বারো জন বিখ্যাত কুঁড়ের কথা মনে আছে? ভগবান তাদের একদিন ডেকে বললেন; 'তোমাদের মধ্যে যে সব চেয়ে কুঁড়ে তাকে দেবো আমি একটি সোনার প্রদীপ।' কুঁড়েদের মধ্যে এই প্রথম চাঞ্চল্য। এগার জন তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। ভগবান বললে: না, তোমরা কিছু নও, এই প্রদীপ পাবে ওই

দ্বাদশ ব্যক্তি। একথা শোনবার পরেও, এখনো, ও যখন শুয়ে থাকতে পেরেছে, তখন ও-ই সত্যিকারের কুঁড়ে। এদের মধ্যে আমি পরিগণিত হতে পারি কি না জানি না, কিন্তু বাস্তবিকই আমি ভেবে পাই না কেন সাত দিনে পৃথিবী ভ্রমণ করতে না পারলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে ?

সমারশেট মমের লেখা আমার ভালো লাগে। পপুলার হওয়া সত্ত্বেও লোকটা সেন্সিবল। কিন্তু মমও যখন বলেন: 'লেখক হবার জন্যে সারা পৃথিবী চষে বেড়ান দরকার', তখন মমতা হয় এই অন্ধ খিয়োরী'দার ওপর। ব্যালজ্যাক কেমন করে তাহলে অত বড় লেখক হলেন ইচ্ছে হয় জানতে।

পতিতাগৃহে যারা যায়, তারা সবাই অধঃপতিত হয়ে তবে সেখানে যায়, না, সেখানে গিয়ে অধঃপতিত হয় ? এ-প্রশ্ন সমাজ-নেতাদের। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ যখন বলবার চেষ্টা করে যে, পতিতাগৃহে এসেছি পতিতার জীবন জানতে, বই লিখব বলে, তখন হাসি পায়। বেশ্যা-বাড়ী যায় লক্ষ লক্ষ লোক, তাদের মধ্যে চন্দ্রমুখীর বেদনা ধরা পড়ে ক'জনের লক্ষ্যে ? পতিতালয়ে গেলেই যদি পতিতা-চরিত্র সৃষ্টি করা যেত, তাহলে ছদ্মনাম গ্রহণ করলেই হওয়া যেত পরশুরাম !

লেখক পতিতাগৃহে যায় ডিটেলস্-এর জন্যে। কিন্তু যার চোখ আছে সেই না খুঁজবে ডিটেলস্। যার চোখ আছে সেই না ডিটেলস্ ছাড়া আরও কিছু খুঁজবে। মাত্র ডিটেলসেই যে খুসী, সে তো ফটোগ্রাফার। ডিটেলস ছাড়িয়ে যে দেখতে পায়, সেই না আর্টিষ্ট। আসল কথা, লেখবার কলম যার হাতে, আর দেখবার যাদু যার তৃতীয় নয়নে, সে সব সময়ই লিখছে। নিদারুণ অর্থাভাবে তার সময়ের অভাব হতে পারে, বিড়ি কিনে ফেলায় কাগজ কম পড়তে পারে তার; পৃষ্ঠপোষকের মানে পাব্লিশারের অভাবও হয়ত হয়, কিন্তু লেখার জন্যে বিষয়বস্তুর অভাব হয় না লেখকের। কোনও দিন না। কোথাও না।

তাই বলছি, দিল্লী যেতে হবে কেন ? হিমালয়ে কী আছে যা নেই কলকাতায় ? হিমালয়ের পরিচয় কী শুধু ২৯,২০০ ফিটে ? তেনজিং-এর বিজয়বার্তায় যে আছে, হিমালয় কি শুধু অতটুকু ? কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর তুষারের জমাটস্রোত। শুধু সূর্যের আলোয় সে গলে। তেমনি হিমালয়ের বুকে কান পেতে যে শুনতে চাইবে তার কথা, সে ট্যুরিষ্ট নয়, অভিযাত্রীদের সহযাত্রী খবরের কাগজের রিপোর্টার নয়, সে অন্য লোক। পাহাড় থেকে সে থাকে অনেক দূরে, তবুও শুধু সে-ই শুনতে পায় হিমালয়ের হৃৎপিণ্ডের ধ্বক্-ধ্বক্ ধ্বনি। অনাদি কাল থেকে অনন্ত কালে সে বয়ে নিয়ে চলেছে একটিমাত্র কথা, সেই একটিমাত্র কথাতেই সব কথার শেষ। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে !

তাই আমার চিরকালের জিজ্ঞাসা, সাহিত্যকে হয় স্বপ্ন নয় শ্লোগান হতেই হবে কেন ? সাহিত্য সর্বগ্রাসী। জীবনের ওপর তার ভিত্তি, যে জীবন সর্বংসহা। একটি 'রাজার' সার্থক চরিত্র সৃষ্টি করতে পারলে, সমস্ত সমাজই কি এসে দাঁড়াচ্ছে না তার মধ্যে ? দেবতার মূর্তি গড়তে বাদ দেওয়া যায় কি অসুরকে ? মানুষের জয়গান গাইতে লক্ষ-কোটি পরাজয়ের বেদনা ছায়া না ফেলে পারে কি কখনো ? সাহিত্যে সবাই আছে, সবাইকে নিয়েই সাহিত্য। যা-খুসী তাই লেখা হয়ত যায় না, কিন্তু যাকে খুসী তাকে নিয়ে নিশ্চয় লেখা যায় !

তাই, কলকাতার ওপরই কেন হবে না মহৎ কাব্য রচনা ? মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে নাটক হতে বাধা কিসের ? কুলি আর চাষা যদি হয় সর্বহারা, বড়লোকেরা যদি হয় ভিলেন, তবে মধ্যবিত্তেরা অন্তত ভাঁড় হয়েও কেন সাহিত্যে বেঁচে থাকবে না ? বিত্ত না থাকার জন্যে যারা মধ্যবিত্ত, তাদের চেয়ে বড় ভাঁড় আর কোথায় ? তাদের কান্না য়ে যদি এমন কোন নাটক না লেখা হয় যা পড়ে লোকে অন্তত তে পারে কিছুক্ষণ, তাহলে বুঝতে হবে লেখকেরই অভাব। লেখার যা দরকার অভাব নেই তার।

কলকাতার মহাভারতে আপনি সবাইকে পাবেন, সব কিছুকেই পাবেন। এমন কি যাহা নাই ভারতে অর্থাৎ মহাভারতে তাও পাবেন। সে হল এই মধ্যবিত্ত। রাজার বিদূষক নয়, বিদূষকের রাজা।

কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপনার কখনো কি মনে হয় নি, রাস্তার ধারের স্যাঙ্গুভেলাতে যে-ছেলেটি দোকান ঝাঁট দেয় সাতটার আগে, উনুন ধরায় নিজের হাতে, সারাদিন খদ্দেরের অর্ডার জুগিয়ে, পান থেকে চুন খসলে গালাগালি খায় মালিকের, রাতে শুতে যায় বারোটার পর, তার বয়স এখনও দশ নয়। যখন আপনার-আমার ছেলে বড়-বাড়ীর রাজপুত্রের মত কড্রয়ের ট্রাউজারের জন্যে বায়না ধরে, না পেলে বাপকে মনে করে অপদার্থ, নিজের জীবনকে ভাবে ব্যর্থ।

দুর্দান্ত গ্রীষ্মে গলে-যাওয়া পীচের রাস্তায় চট পেতে ঐ যে লোকটি শুয়ে মেরামত করছে গাড়ী, ওর জীবনের যে-কোন একটা ঘটনা নিয়ে ঘটানো যায় না অঘটন? মহাযুদ্ধের চেয়ে ও কি কম খবর?

কিংবা সঙ্গ নিন, রোজ টালা থেকে টালিগঞ্জ-করা বাস কণ্ডাক্টরের, ঘুরে আসুন একটা ট্রিপ। খোলা রাখুন চোখ, কানকে শুনতে দিন সব কথা। চরিত্ররা আপনি এসে দাঁড়াবে আপনার সামনে। সে-সব মানুষরা নেই কোনও মহাকাব্যে, আরব্য উপন্যাসে নেই ওর চেয়ে রোমাঞ্চ, ওরা কারা? ওরা কারা জানি না, কিংবা জানতে চাই না। তাই বলি, বাংলা দেশে লেখবার স্কোপ কোথায়, তকে কই বিদেশী সাহিত্যের? ধরুন ওদের, ওদের তুলে ধরুন। রে আর রেখায়। ছবিতে আর কবিতায়। গানে অথবা ছড়ায়। স্বর এবং সিনেমায়। দৃষ্টির স্বচ্ছতা দিয়ে; তার সঙ্গে মিশিয়ে হৃদয়ের গড়ে তুলুন ওদের। কারণ শত শত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়া পরে—'ওরা কাজ করে।' এপিক কি শুধু পাতার সংখ্যা দিয়েই নিরূপিত হয়? না,—সাদা পাতার ভেতর থেকে কালো কালির আঁচড়ে

বেরিয়ে আসে যে মানুষ, তার বেঁচে থাকায়., কাঁদায়, হাসায়, বলায় জন্ম হয় এপিকের? কে বলবে সে কথা? কে দেবে এর উত্তর?

যাদের কথা বললাম, তাদের সঙ্গেই বিত্তনিঃস্ব মধ্যবিত্তেরা গ্রামে না গিয়ে, শহরতলীতে না সরে যাবার চেষ্টা করে এখনও বেশীর ভাগই মজে আছে এই মজার শহর কলকাতায়। চৌরঙ্গীর চৌহদ্দিতে অফিস যাবার আর আসবার সময় দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। নিওন সাইনে, হকারের চীৎকারে, বায়স্কোপের বিজ্ঞাপনে, রেস্তোরাঁর খাবারের গন্ধে, মুহূর্তকাল সে বিস্মৃত হয়—কাল রেশনের দিন, মাইনে পেতে এখন অনেক দেরী। ঢুকে পড়ে কোন সিনেমা হলে, দাঁড়িয়ে যায় লাইনে। আজ তো দেখি, দেখা যাবে কাল কি হয়। তারপর দু'ঘণ্টা আলোকোজ্জ্বল অন্ধকার। এবং তার পর বেরিয়ে আবার সেই ছেঁড়া মশারি, বাচ্চার কান্না, গিন্নীর তাগাদা। সকালের অফিসের তাড়া। লেট খাতায় সই করার সব্বনেশে রিস্ক। তবু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, পুরুষানুক্রমে কলকাতার মায়ায় এরা সেই কামাখ্যার ভ্যাড়া।

নি:সন্দেহে গরু-ভ্যাড়ার মত। নিজেদের বলতে কিছু নেই। মাসের শেষের বাঁধা মাইনে এদের চালায়। লম্বা-বেঁটে, রোগা-মোটা, কালো-ধলো, [illegible] আছে, [illegible] চেহারা এক। [illegible]টো থেকে রবিবার সন্ধ্যে পর্যন্ত অফিসের খোঁয়া[illegible] থেকে মধ্যি পায়। ছাড়া পায় কিন্তু টের পায় না। রবিবারের রাত যদি[illegible] হবার আগেই সোমবারের আতঙ্ক। প্রমাণাভাবে ছাড়া পাওয়া রাজবন্দীদের জেল-গেট থেকে অর্ডিন্যান্সে ফের ধৃত হওয়ার মত।

এই মধ্যবিত্তরাও দিবাস্বপ্ন দেখে। শনিবার, রেসের মাঠে। রেস শেষ হবার আগেই সোমবারের ক্যাশ না মেলাতে পারার নিরুপায়তায় দিবা-স্বপ্ন দেখা দেয় নাইট-মেয়ার হয়ে।

মধ্যবিত্তদের আশ্বিনের দুর্ভাবনার-মেঘে বিদ্যুৎ চমকায়, একবার নয়, দু' বার। রেসের মাঠে আর লটারীর টিকিটে। বিদ্যুৎ চমকাবার পরেই অন্ধকার জীবন আরো অন্ধকার মনে হয়।

সেই মধ্যবিত্তের কলকাতার ওপর থেকে কালো পর্দার ঢাকা আমার চোখের সামনে খুলে গেল একদিন হঠাৎ। সাহেবদের হাত থেকে মোসাহেবদের হাতে এসেছে তখন ভারতবর্ষের ভার। শ্যাম-বাজারের পাঁচমাথার মোড়ে প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে আবিষ্কার করলাম একটি মুখ। ব্যর্থতায় বিষণ্ণ, নিরাশায় ম্লান। এমন একখানি মুখ, যার সঙ্গে চেনা না থাকলেও, জিজ্ঞেস করতে হয়, কী হয়েছে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে, দেখুন না, ছেলেটা শুঁষছে, একটা ইনজেকশন না কিনলেই নয়, অথচ রাস্তা বন্ধ, এখন ওপারে যেতে দেবে না।

কেন?—

আর কেন?—রাষ্ট্রপতি না কে যেন আসছেন—গাড়ী-ঘোড়া-রাস্তা সব বন্ধ।

আমি মুখে কিছু বললাম না। বললাম মনে মনে: লোকটা পাগল হয়ে গেছে নাকি। এত বড় লোক আসছেন, তাঁর সম্মানে দু'মিনিট দাঁড়িয়ে যেতেও আপত্তি? ছেলের অসুখ তো আছেই, কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে—স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি, কি বিপুল তাঁর প্রতিপত্তি, কত বড় অঙ্কে তাঁর মাইনে, সেই রাষ্ট্রপতিকে দেখা তো আর না-ও হতে পারে এ-জীবনে।

আর স্মরণ করলাম শ্মশান-যাত্রা থেকে বরযাত্রায়, দইএর সার্টিফিকেট থেকে চায়ের বিজ্ঞাপনে, উদ্বোধন উপলক্ষ্য থেকে নামকরণ প্রসঙ্গে যাঁর প্রতিভার দ্বিধাহীন স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, সেই বিশ্বকবিকে।

আবৃত্তি করলাম, চলে-যাওয়া রাষ্ট্রপতির গাড়ীর দিকে চেয়ে, জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে!

ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু তার অসামান্য প্রভাব পড়েছিল আ...
মনে। গাঁথা হয়ে গিয়েছিল, চিরকালের মত। কিন্তু ঘটনাটা
মনে থাকলেও ভুলে যেতাম সেই লোকটিকে নিশ্চয়ই। জীবনে
কত বই-ই তো পড়ি ; যতগুলি বই-এর নাম মনে থাকে তার চেয়ে
অনেক কম মনে থাকে পাত্র-পাত্রীদের নাম। বই-এর নামের
চেয়েও আবার বেশি মনে থাকে মোটামুটি গল্পটা। তাই নিশ্চয়ই
ঘটনা না ভুললেও ভুলে যেতাম তার চেহারা, যাকে নিয়ে তা
ঘটেছিল। যদি না—

হ্যাঁ। যদি না, সেই একই লোকের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে
যেত আরেক পরিবেশে। অমনি আকস্মিক। অমনি অভাবিত।
মনে থাকত না, যদি অমনি মনে রাখবার মত অপরূপ এক
পরিস্থিতির না হত উদ্ভব। আর দুর্ভাগ্যক্রমে সত্যিই যদি তা না
হত, তাহলে হত না দুর্গার সঙ্গে নতুন করে পরিচয়, লেখা হত
না এই কাহিনী, অসমাপ্ত থাকত অভিজ্ঞতার তীর্থ-পরিক্রমা। এই
দ্বিতীয় বার, তখনও পর্যন্ত আমার কাছে নাম-ধাম-অজ্ঞাত সেই
ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল যে অদ্বিতীয় বাৎসরিক প্রহসন
উপলক্ষ্যে, সে-প্রহসনের নাম ইঙ্গ-বঙ্গ ক্রিকেট ম্যাচ ; স্থান : ইডেন
উদ্যান, কাল : পুরাতন বৎসরের সারা এবং নব-বর্ষের শুরু
(দুই-ই সাহেবদের, তথা মোসাহেবদেরও)।

ক্রিকেট, শুধু খেলার রাজা নয়, রাজার খেলাও বটে।

লর্ডস গেম। ফুটবল খেলা যারা দেখে তারা কেউ কেউ কেন,
অনেকেই ক্রিকেট খেলারও ভক্ত, তবুও ক্রিকেট আর ফুটবলের
দর্শনী এবং দর্শক দু-এতেই পার্থক্য স্পষ্ট। জাতে এবং তারিফে
তফাৎ অনেক। উত্তেজনা আছে ক্রিকেটেও ; কিন্তু স্থূল নয়।
ফুটবল-দর্শকের মত, চেঁচিয়ে, গালাগাল করে, থুতু দিয়ে, লাফিয়ে-
ঝাঁপিয়ে, রেফারীর উদ্দেশ্যে তাড়া করে হুলুস্থুল কিছু হয় না ইডেন
গার্ডেনে। সারাদিন ধরে খেলা, তার লাঞ্চ আছে, টি আছে,

খেলোয়াড়দের এবং খেলা-দেখতে-আসাদের দু'জনেরই। এক ঘণ্টা হয়ে গেলে খেলা বন্ধ করে আছে জল খাওয়া। মস্ত বড় স্কোর বোর্ড ছাড়াও আছে দফায় দফায় ছাপা স্কোর-কার্ড। সমস্ত মাঠই এই নিস্তব্ধ, এই নিপুণ হাতের মারকে অভিনন্দন জানাতে, হাজার হাজার হাততালিতে ফেটে পড়া। যেন ক্লাসিক্যাল গানের অতি সূক্ষ্ম কাজকে বাহবা দেওয়া।

কিন্তু ক্রিকেট খেলার এ-রূপ বাইরের রূপ মাত্র। ইডেন উদ্যানে সাম্বৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচ দর্শক-বৈচিত্র্যে আসলে এক অপরূপ প্রহসন। প্রতি বছর আগে আসত কার্নিভ্যাল, এখন আসে ক্রিকেট দল। আসে ইংল্যাণ্ড থেকে, অষ্ট্রেলিয়া থেকে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে, আসে আসলে ভারতের সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু সাময়িক বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান থেকে। ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ-মেশানো বুড়ো-হাবড়ার বাতিল-করা দল। ভারতবর্ষ কী খেলবে,—এই ধারণা নিয়ে আসে। ফিরে যায় সেই ধারণাকেই দৃঢ়তর করে। ভারতবর্ষ খেলে,—খেলে তাদের এক-আধজন পৃথিবী-বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মতই। কিন্তু এগার জনে মিলে-মিশে এক-দল হয়ে খেলে না। ভারতীয় পলিটিক্সের চেয়েও প্যাঁচের খেলা বেশি চলে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড অফ ইণ্ডিয়ায়। এক জন ক্যাপ্টেন হলে অন্য কয়েক জন খেলবে না। বড় ভাই বিখ্যাত হলে তার শ্যালককে পর্যন্ত দলে নিতে হবে। খেলার চেয়ে না-খেলে খেলায় এখনও ভারতীয় ক্রিকেট শীর্ষস্থানে। মাঠে যে খেলা হয় আসল খেলা সেখানে নয়। পেছনে থেকে যাঁরা কল-কাঠি নাড়েন, মূল খেলা তাঁদেরই। ভারতীয় ক্রিকেটের সুনাম যাতে নির্মূল হয় তারই নির্মম খেলা চলে সিলেকশন বোর্ডে— প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে, ভোটাভুটির রঙ্গভূমিতে। বিখ্যাত সেই গানের সুরের আর কথার অনুকরণ করে বলা চলে: তোমার খেলা তুমি খেল গুপ্ত, লোকে বলে খেলি আমি।

ইডেন-উদ্যানে ইঙ্গ-বঙ্গ ক্রিকেট খেলার সঙ্গে উত্তম তুলনা চলে ক্যানিভ্যালের নয় সার্কাসের। সার্কাসের ক্লাউন খেলা দেখায়, ক্রিকেট খেলার মাঠে ক্লাউন খেলা দেখতে যায়।

কারা এই ক্লাউন? বনেদী-পরিবার নয়, এরা উঠতি-বড়লোক। এরা বহুপরিচিত, তবুও এদের পুরো চেনা শক্ত। লালবাজার থাকা সত্ত্বেও এরা কালো বাজারের কৃপায় সুপ্রতিষ্ঠ। যুদ্ধোত্তর কলকাতার গায়ে এরা ফুটে উঠেছে পারার মত। ওপরের দাগ এক দিন মিলিয়ে যাবে, ভেতরের ঘা শুধু শুকতে চাইবে না এখনও বহুদিন। ষ্ট্রীমলাইণ্ড গাড়ীর মাথায় এরা মস্ত বেলুন বাঁধে। বেলুন হচ্ছে হঠাৎ-বড়লোকদের যথার্থ প্রতীক। ফুলতে-ফুলতেই ফেটে যায়।

এদের বাড়ীর সবাই দল বেঁধে বড়ে গোলাম আলীর গান শুনতে যায়। না গেলে লোকে কি বলবে, তাই যায়। পঞ্চাশ হ'ক আর একশ' হ'ক, টিকিট বুক করে সাত দিন আগে। গানের মাঝে উঠে যেতে বাধে না তাই। ফলে, যারা শুনলে গোলাম আলী ধন্য হতেন, কৃতার্থ হত যারা শুনে, তারা প্রবেশপত্র পায় না এখানে। নিজের অন্ধকার ঘরে বসে গোলাম আলীর মানস মূর্তির সামনে রেওয়াজ করে। দ্রোণের সামনে একলব্য।

এদের বাড়ীতেই রবি ঠাকুরের বই-এর পাতা কাটা হয় না, কাড়া-কাড়ি পড়ে যায় ফিলম-ম্যাগাজিন এলে। দেওয়ালে ঝোলেন গান্ধী অথবা জওহরলাল, কিন্তু সত্যিকারের স্বপ্ন রাজকাপুর কি গ্রেগরী পেক হবার। এদের বাড়ীর মেয়েদের চোখেই সন্ধ্যের পর ওঠে সান-গ্লাস। এরা উৎকট, এরা খাপছাড়া, এরা ক্ষ্যাপা। কালচারের অভাব ঢাকবার চেষ্টা গ্ল্যামারের আবরণে। দাঁড়কাকের ময়ূর সাজতে গিয়ে দারুণ সাজা। না-মধ্যবিত্ত, না-বনেদী, বাঙালী সংসারে এরা সাহেবী সং।

ক্রিকেট মাঠে এদের পদার্পণ খেলা দেখবার জন্যে নয়, খেলা দেখাবার জন্যে। ক্লাউনের খেলা। এই পোট্যাটো চীপস। এই

প্যাটিস। তৃষ্ণায় জল নয়, ফ্লাস্ক থেকে চা। কার ডোনাটস-খোঁপা, কার সর্পিল বিনুনী,—মুখে খাবার আর তার সঙ্গে মুখে মুখে সেই মুখ-রোচক আলোচনার মাঝে মাঝে কেউ এল-বি-ডবলিউ হয়ে আউট হলে গম্ভীর চালে জিজ্ঞেস করে বসা : ক্যাচটা ধরলে কে ভাই!

ফ্লুয়েণ্টের চেয়ে বেশি ইন-করেক্ট্ ইংরেজীতে পারদর্শিতায় আর মাতৃ-ভাষাকে বিকৃত করে বলার বাহাদুরীতে যারা সর্বদাই মটমট করছে, সেই না-এদেশের, না-ওদেশের এই ললনা-কুলকে তবু সহ্য করতে হয় এ-যুগে আমরা পুরুষরা নেহাৎই অবলা বলে। কিন্তু এই না-হিন্দু, না-মুসলমান, এমন কি ক্রীশ্চানও নয়, এই অদ্ভুত সমাজের পুরুষরা আবার সম্পূর্ণ বিচিত্র জীব। টিকিট কেটে এদের দেখতে যাওয়া চলে।

এই সমাজের রমণীদের সঙ্গে চলে না আলোচনা, সমালোচনা করবে এমন সাহস কার? শুধু একটা কথাতেই সে কথা শেষ করি। শাস্ত্র-কাররা না বললেও, সেটাই পথি যারা বিবর্জিতা, তাদের সম্বন্ধে শেষ কথা। সে-কথা আর কিছুই নয়, সে-কথাটা হচ্ছে এই যে, দারিদ্র্য পুরুষের শতগুণ নাশে, আর স্বাচ্ছল্য নষ্ট করে রমণীর রমণীয়তা। তখন মেয়েদের জীবনে আর সব ফ্যাক্টর গৌণ, মুখ্য হয় শুধু ম্যাক্স-ফ্যাক্টর!

ও-সব সব্বনেশে আলোচনা বাতিল করে পুরুষদের কথায় আসা যাক। এই অদ্ভুত সমাজের পুরুষরা যে সত্যিই বিচিত্র এক জীব, সে-কথা বোঝা যাবে না, যদি না বিশেষ বিশেষ জায়গায় এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইডেন গার্ডেন এমনি একটি পবিত্র জায়গা! ক্রিকেট ম্যাচ হল তেমনি একটি মরসুম। ক্রিকেট ম্যাচ উপলক্ষ্যে গার্ডেনসে যা হয় তাকে বলা যায়, annual dress parade—তফাৎটা শুধু, লেডিসদের নয়, এটা for men only।

স্মরণাতীত এক কালে ভারতবর্ষের মেয়েদের লজ্জাই যেমন ছিল ভূষণ, তেমনি ক্রিকেট মাঠে, চড়া-টিকিটের খদ্দেরদের ভূষণই হল অন্যলোকের লজ্জার কারণ। ভারতীয় পুরুষদের আজকের প্রায়-জাতীয় পোষাক যে-দেশ থেকে এসেছে, সে-দেশের লোকেরাই বলে

থাকে যে সেই পোষাকই হল ভদ্রলোকের ভূষণ যা-তে চমক কম, যা চোখকে কপালে তোলে না, দৃষ্টিকে করে প্রসন্ন। সাহেবদের এ-কথাটা যে মোসাহেবদের ভালো লাগে নি, ক্রিকেট ম্যাচ উপলক্ষ্যে ইডেন গার্ডেনে গেলেই হয় তার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

ব্লাউজের মত নয়া-ডিজাইন এখানে কারুর সার্টের, কারুর জামার পেছন দিক চকোলেট, সামনে সবুজ! কারুর একটাও পকেট নেই জামার, কারুর চারটে। কারুর হাতে সিগারেটের টিন, কারুর হিপ পকেট থেকে একটুখানি মাথা উঁচু করে আছে সিগারেট কেস, কেউ ফুঁকছে পাইপ, আবার কেউ বাহারী হোল্ডারে বিশিষ্ট।

দোলের দিন ছেঁড়া জামা পরে বেরুই আমরা। রং-এর ছোপে জামা নষ্ট হয়, তাই বাতিল-করা জামা-ই হোলির দিনে সকলের বরাদ্দ। ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে আসা এই সব ভদ্র-লোকের জামার দিকে হঠাৎ নজর পড়লে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়, আজ দোল কি না! সমস্ত জামাটায় নানা রং-এর ছোপ-ছোপ দাগ। কোনটা হয়েছে ছবি, কোনটা হয়েছে এ-বি-সি-ডি লেখা। হোলির জামা পরে এদের এখানে-ওখানে-সেখানে, এর-ওর-তার সঙ্গে প্রতি-দিনের un-holy উৎসব কলকাতাকে করেছে আরেকটু কালো,বাঙালী কৃষ্টিকে দিয়েছে লজ্জা, ভারতীয় সভ্যতাকে করেছে ক্যারিকেচর। মার্কটোয়েন ভারতে এসেই বলেছিলেন, 'ভগবান বাঁদর সৃষ্টি করে কৃতার্থ না হতে পেরেই মানুষ সৃষ্টিতে হাত দেন।'

সেই ক্রিকেট খেলায় একবার দর্শক হয়েছিলাম, কেন জানি নে। ছেলেদের চেয়ে মেয়ে বেশি, মেয়েদের চেয়ে বেশি এসেছে বাচ্চারা, কিন্তু বাচ্চাদের চেয়ে বকছে বেশি মেয়েরা, খেলা দেখছে কম। দেখতে দেখতে উল বুনছে; নেষ্টমণ্ট খাচ্ছে। ছড়াচ্ছে কমলালেবুর খোসা। মুখে কখন আইসক্রীম লেহনের চুক-চুক আওয়াজ। ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের মত কাজুবাদামের ওপর ম্যাকলীনে মাজা দাঁতের মিষ্টি কামড়ের কুড় কুড় শব্দ, বেশ লাগছে শুনতে।

ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায় বিখ্যাত ... দেখে মন্তব্য। ভারতবর্ষের পর সেই মহাদেশ হল চীন, যেখানকার লোকে ...রা মেটিরিয়াল সাকসেসকে মনে করে নি মোক্ষ, যুদ্ধে মরার চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে ভাল ভাবে বাঁচার গৌরবকে, শ্লোগানের চেয়ে শিল্পে করেছে বেশি বিশ্বাস। মহাকাব্যের নয়, ছোট ছোট কবিতার, অতি সূক্ষ্ম কাজের করেছে তারিফ। চাইনিজ ওয়ালের চেয়ে চীনের জীবন-শিল্প অনেক বড়। সেই চীন দেশের এক জন, ইংরেজদের ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে বলেছিল, ইংরেজ আসল বণিকের জাত, রসের খদ্দের নয়। তাই বল মেরে নিজেরাই কুড়িয়ে আনছে। বুদ্ধিমান হলে চাকরদের পাঠাত বল আনতে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যতই বলুন, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না, রসিকেরা জানে অনেক ভজনা করেও অর্জুন পায় নি সত্যিকারের কৃষ্ণকে, আর কিছু না করলেও, কৃষ্ণ যাঁকে পেতে চেয়েছেন—তিনিই শ্রীরাধা। বল কুড়িয়ে আনার মধ্যে আছে কষ্ট, বল দূরে পাঠাবার মধ্যে আছে মজা, তারই নাম কেষ্ট।

খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ গ্যালারীতে হৈ-হৈ! কী ব্যাপার! ভেঙ্গে গেছে গ্যালারী! মূর্ছা গেছে কেউ? ভুল হয়েছে আম্পায়ারের? না, কে যেন এসেছে--দর্শকের আসন আলো করতে। পুরান দিনের কোন বড় খেলোয়াড়? রাজা? মহারাজা? না, তার চেয়ে অনেক বড়, যিনি এলে খেলা বন্ধ হয়ে যায়, খেলোয়াড় থেকে খেলা-দেখার দল, কারুর চোখেই পড়ে না পলক, সেই,-কে আবার, অশোককুমার। তরুণীদের চোখে কালিদাসের কালের কটাক্ষ। তরুণদের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। তিনশো সপ্তাহ-চলা 'কিসমতের' অশোককুমার সশরীরে। সত্যবানকে বেঁচে উঠতে দেখে এত কৃতার্থ বোধ করেন নি সাবিত্রী। ক্রিকেট কর্মকর্তাদেরও কার কানে যেন পৌছে গেছে সেই কথা। এক জন এসে নিয়ে গেলেন অশোককুমারকে। যে-কোন একজন নয়, স্বয়ং কুচবিহারের মহারাজা। যেতে যেতে অশোককুমার কার দিকে চেয়ে হেসে জন্ম সার্থক করলেন তার, কার অটোগ্রাফে সই

থাকে যে সেই পোষাকই হল ভদ্রলোকের ভূষণ যা-তে চমক কম, যা চোখকে কপালে তোলে না, দৃষ্টিকে করে প্রসন্ন। সাহেবদের এ-কথাটা যে মোসাহেবদের ভালো লাগে নি, ক্রিকেট ম্যাচ উপলক্ষ্যে ইডেন গার্ডেনে গেলেই হয় তার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

ব্লাউজের মত নয়া-ডিজাইন এখানে কারুর সার্টের, কারুর জামার পেছন দিক চকোলেট, সামনে সবুজ! কারুর একটাও পকেট নেই জামার, কারুর চারটে। কারুর হাতে সিগারেটের টিন, কারুর হিপ পকেট থেকে একটুখানি মাথা উঁচু করে আছে সিগারেট কেস, কেউ ফুঁকছে পাইপ, আবার কেউ বাহারী হোল্ডারে বিশিষ্ট।

দোলের দিন ছেঁড়া জামা পরে বেরুই আমরা। রং-এর ছোপে জামা নষ্ট হয়, তাই বাতিল-করা জামা-ই হোলির দিনে সকলের বরাদ্দ। ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে আসা এই সব ভদ্রলোকের জামার দিকে হঠাৎ নজর পড়লে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়, আজ দোল কি না! সমস্ত জামাটায় নানা রং-এর ছোপ-ছোপ দাগ। কোনটা হয়েছে ছবি, কোনটা হয়েছে এ-বি-সি-ডি লেখা। হোলির জামা পরে এদের এখানে-ওখানে-সেখানে, এর-ওর-তার সঙ্গে প্রতিদিনের un-holy উৎসব কলকাতাকে করেছে আরেকটু কালো,বাঙালী কৃষ্টিকে দিয়েছে লজ্জা, ভারতীয় সভ্যতাকে করেছে ক্যারিকেচর। মার্কটোয়েন ভারতে এসেই বলেছিলেন, 'ভগবান বাঁদর সৃষ্টি করে কৃতার্থ না হতে পেরেই মানুষ সৃষ্টিতে হাত দেন।'

সেই ক্রিকেট খেলায় একবার দর্শক হয়েছিলাম, কেন জানি নে। ছেলেদের চেয়ে মেয়ে বেশি, মেয়েদের চেয়ে বেশি এসেছে বাচ্চারা, কিন্তু বাচ্চাদের চেয়ে বকছে বেশি মেয়েরা, খেলা দেখছে কম। দেখতে দেখতে উল বুনছে ; নেষ্টমল্ট খাচ্ছে। ছড়াচ্ছে কমলালেবুর খোসা। মুখে কখন আইসক্রীম লেহনের চুক-চুক আওয়াজ। ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের মত কাজুবাদামের ওপর ম্যাকলীনে মাজা দাঁতের মিষ্টি কামড়ের কুড় কুড় শব্দ, বেশ লাগছে শুনতে।

ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায় বিখ্যাত [illegible] দেখে মন্তব্য। ভারতবর্ষের পর সেই মহাদেশ হল চীন, যেখানকার লোকে [illegible]নী মেটিরিয়াল সাকসেসকে মনে করে নি মোক্ষ, যুদ্ধে মরার চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে ভাল ভাবে বাঁচার গৌরবকে, স্লোগানের চেয়ে শিল্পে করেছে বেশি বিশ্বাস। মহাকাব্যের নয়, ছোট ছোট কবিতার, অতি সূক্ষ্ম কাজের করেছে তারিফ। চাইনিজ ওয়ালের চেয়ে চীনের জীবন-শিল্প অনেক বড়। সেই চীন দেশের এক জন, ইংরেজদের ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে বলেছিল, ইংরেজ আসল বণিকের জাত, রসের খদ্দের নয়। তাই বল মেরে নিজেরাই কুড়িয়ে আনছে। বুদ্ধিমান হলে চাকরদের পাঠাত বল আনতে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যতই বলুন, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না, রসিকেরা জানে অনেক ভজনা করেও অর্জুন পায় নি সত্যিকারের কৃষ্ণকে, আর কিছু না করলেও, কৃষ্ণ যাঁকে পেতে চেয়েছেন—তিনিই শ্রীরাধা। বল কুড়িয়ে আনার মধ্যে আছে কষ্ট, বল দূরে পাঠাবার মধ্যে আছে মজা, তারই নাম কেষ্ট।

খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ গ্যালারীতে হৈ-হৈ! কী ব্যাপার! ভেঙ্গে গেছে গ্যালারী! মূর্ছা গেছে কেউ? ভুল হয়েছে আম্পায়ারের? না, কে যেন এসেছে—দর্শকের আসন আলো করতে। পুরান দিনের কোন বড় খেলোয়াড়? রাজা? মহারাজা? না, তার চেয়ে অনেক বড়, যিনি এলে খেলা বন্ধ হয়ে যায়, খেলোয়াড় থেকে খেলা-দেখার দল, কারুর চোখেই পড়ে না পলক, সেই,-কে আবার, অশোককুমার। তরুণীদের চোখে কালিদাসের কালের কটাক্ষ। তরুণদের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। তিনশো সপ্তাহ-চলা 'কিসমতের' অশোককুমার সশরীরে। সত্যবানকে বেঁচে উঠতে দেখে এত কৃতার্থ বোধ করেন নি সাবিত্রী। ক্রিকেট কর্মকর্তাদেরও কার কানে যেন পৌঁছে গেছে সেই কথা। এক জন এসে নিয়ে গেলেন অশোককুমারকে। যে-কোন একজন নয়, স্বয়ং কুচবিহারের মহারাজা। যেতে যেতে অশোককুমার কার দিকে চেয়ে হেসে জন্ম সার্থক করলেন তার, কার অটোগ্রাফে সই

থাকে যে অর্থ করলেন, দেবী বীণাপাণিকেই বোধ হয়। এক জন চোখদুজের অভাবে দশ টাকার নোটখানিই বাড়িয়ে দিলেন সই-এর জন্যে। নোটে শুধু একজনের সই-ই চলে—তা চলুক। দ্বিতীয় সই করার জন্যে যদি নোটখানা বাতিল হয় হোক, তবুও অদ্বিতীয় হয়ে রইবে এই দশ টাকার নোট। টাকা অতি তুচ্ছ জিনিষ। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেছেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা।

আমি যেখানে বসে খেলা দেখছিলাম, তার একটু ওপরে একখানা ঘর থেকে রীলে হচ্ছিল খেলার বিবরণ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কৃপায়। কমেণ্টেটার বলছেন বেশ। শ্লিপ, মিড অন, সিলি মিড অন, স্কোয়ার লেগ, শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করে বসেছি পাশের অপরিচিত ভদ্র-লোককেই, এগুলো কী বলছে, বুঝতে পারছেন কিছু ?

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন হো-হো করে, বললেন : কেউ না, কেউ না, ওগুলো কেউ বোঝে না, বুঝবার ভান করে সবাই, বলে, বাড়িয়ে দিলেন একখিলি পান, এতক্ষণে প্রাণের কথা বলেছেন দাদা, আবার তাঁর প্রাণখোলা হাসি সচকিত করে তুলল আশে-পাশের লোককে।

মুখের দিকে তাকাতেই মনে পড়ল এ সেই শ্যামবাজারে পাঁচ মাথার মোড়ে দেখা হওয়া ভদ্রলোক না ?—হাঁ, নিশ্চয়ই সেই। বললাম : আপনার সঙ্গেই তো সেদিন দেখা হয়েছিল রাস্তায়, পথঘাট সব বন্ধ, রাষ্ট্রপতি না কে আসার জন্যে, আপনি ছেলের ইনজেকশন কিনতে বেরিয়েছিলেন—

ভদ্রলোক বললেন, এ-শমার নাম আদিত্য দে, আদি নিবাস ফরিদপুর, বর্তমানে কলকাতায়, জীবিকা কেরাণীগিরি—আর মহাশয়ের ?—

তার পর আস্তে আস্তে কয়েক দিনের মধ্যেই জমে উঠল আলাপ। জল যেমন করে জমে বরফ হয়, তেমন করে নয়, পাতলা রস যেমন করে আঠা হয়ে ওঠে জ্বাল দিতে দিতে তেমনি করে।

তার পর এক দিন নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে।

'ওগো শুনছ,' বলে ডাক দিতে যে বেরিয়ে এলো, তাকে দেখে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : দুর্গা? হ্যাঁ। দুর্গাই। সিংহবাহিনী নয়, তবু সংসারের অসুরের সঙ্গে, লড়াই করেও অক্লান্ত।

দুর্গা। জগজ্জননী দুর্গার মত নয় দশভুজা। মাত্র দু'খানি হাত। তার একটিতে চায়ের কাপ, অন্যটিতে ধরা খাবার রেকাবী। তাতেই মনে হচ্ছে যেন অন্নপূর্ণা আলো করে এসে দাঁড়িয়েছে। মাটির ঘরকে মনে হচ্ছে ইন্দ্রলোক।

দুর্গা, চায়ের কাপ আর খাবার রেকাবী নামিয়ে রেখে, মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে, বলল : বসুন, আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি।

পাঁচ

দুর্গা চলে গেল চা আনতে।

বসে বসে দেখতে লাগলাম দুর্গার সংসার।

আলো আর বাতাস ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান,—এ-কথা শুধু চারুপাঠের পাতাতেই সত্য। জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারের সঙ্গে হলে সাক্ষাৎ, ওই অলীক ধারণা ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যেতে দেরী হয় না। মধ্যবিত্তরা কেউ কেউ, নিম্ন-বিত্তরা প্রায় সবাই কলকাতার যে সব গলিতে যে-সব ঠিকানায় থাকে, শুধু ডাক-পিওনই তার নম্বর জানে মাত্র, পরিচয় জানে না, জানবার উৎসাহও নয় অমিত।

আদিত্য দের পঞ্চাশ টাকা-ভাড়ার সেই (বাড়ী বললে বাড়িয়ে বলা হয়,) মাথা গোঁজবার চোরা-কুঠুরীর বাইরের ঘরেও সূর্যের আলো অল্প, বাতাস প্রায় রুদ্ধ। দুর্গার পিতৃগৃহে একদা বেয়ারা-বাবুর্চিদের ঘর ছিল এর তুলনায় স্বর্গ। সেই স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছে দুর্গা বহু দিন। স্বর্গের হাসি কিন্তু লেগে আছে বুঝি এখনও এই অন্ধ গলির অপরিসর বাসের অযোগ্য বাসস্থানের প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে।

থলথলে সদাই-হাসি-খুশী আদিত্য দে জমাটি মানুষ। গোলগাল বেঁটে মানুষটা বাইরে থেকে মোটা, কিন্তু তার রসিকতা অতি সূক্ষ্ম। আমাদের দেশে যারা বেশি কথা বলে তাদের সম্বন্ধে সব কথাই 'অর্বাচীন,' এই বিশেষ একটি বিশেষণেই সেরে দেওয়া হয়। তাদের না হলে জমে না আসর, আড্ডা বসে না বেশিক্ষণ। তবু যারা গোমড়া-মুখ এবং স্বল্প-বাক তারাই আমাদের দেশে জীবনের ক্ষেত্রে-অক্ষেত্রে মুরুব্বী। কথা বলতে পারা যে একটা দুর্লভ ক্ষমতা, বাজে বকতে পারার মত বাজে জিনিসকে যে ওই দুর্লভ ক্ষমতা যোগে আর্টের

কোঠায় উত্তীর্ণ করে দেওয়া যায়, এ-কথা কে বলে ? যারা গম্ভীর হয়ে থাকে তারা যে কথা বলতে পারে না বলেই চুপ করে থাকে, সে-কথাটাই বা ক'জন বলে ? গাম্ভীর্য যে গর্দভের গায়ে সেই সিংহ-চর্মাবরণ, এ-কথা আর কেউ না বুঝুক, গাধাও না বুঝুক, সমাজে গম্ভীর বলে যারা সম্মানিত তারা বেশ বোঝে, তাই চুপ করে থাকে। ভালোই করে। এ-দেশে গুরুগম্ভীর বিষয় নির্বাচন করে তারপর যাই লিখুন তাতেই যেমন আপনার পণ্ডিত বলে পরিচয়, তেমনি এসমাজে ব্যক্তি গম্ভীর হলেই তার ব্যক্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। এ-দেশ সম্বন্ধে সব চেয়ে খাঁটি কথা বলেছিলেন ডি. এল. রায়ের আলেকজাণ্ডার : সেলুকস্ সত্যই কী বিচিত্র এই দেশ !

পরিহাস-রসিক আর অকারণে গম্ভীর, এদের মধ্যে তফাৎ শুধু এই যে প্রথম জন সিরিয়াসলি ফানি, দ্বিতীয় জন ফানিলি সিরিয়াস। সেই অ্যালোপ্যাথ আর হোমিওপ্যাথ, এক জন kills a man ; আর অন্য জন : lets a man die.

আদিত্য দে নড়তে সময় নেন, কিন্তু বকতে নন। সদ্যপরিচিতকে 'আপনি' থেকে শ্যালক সম্বন্ধে না হ'ক অত্যন্ত আপন জন করে নিতে সময় নেন সামান্যই। পরের কথায় কান দেবার সময় কম, কিন্তু ঘরের কথা পরকে বলার বাধা আরও অল্প। ঠকলে যাদের শিক্ষা হয়, যারা ঠকতেই ভালোবাসে, ঠকাতে চায় না কাউকে, আদিত্য দে তাদেরই দলের। সেই সাহেবের কথা ভুলব না কোন দিন, এক জনকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে এক দিন কী কারণে ডেকেছিলেন তাকে, সামান্য উপকার নেবেন বলে ; সাহেবের উপকার করা দূরে থাক, আসেওনি সে। পরে সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হল : এত উপকার পেয়েও লোকটা এল না কেন ? সাহেব জবাব দিলেন : that's his nature ! তারপর সাহেবকে যখন জিজ্ঞেস করা হল : আবার যদি ও বিপদে পড়ে, তুমি কি তখনও এগিয়ে যাবে ?—এর আর খাসা জবাব : Oh ! sure ! —কিন্তু 'কেন' বলতে পার ?

সাহেব প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন : Perhaps because that' my nature.

অত্যন্ত অল্প পথ যেতেও প্রথম যৌবনে আদিত্য দে রিকস নিতেন তখনও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের কোঠায় নেমে আসেন নি। জিজ্ঞেস করলে বলতেন : বাইরে থেকে দেখতেই এ রকম, আমার শরীর তো ভালো নয়, হাড় নরম, দাঁত খারাপ। কেউ উত্তর শুনে বিপুল বপুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললে নিজেও হেসে উঠতেন হো-হো করে। কেউ যদি বলত : তোফা আছেন দাদা, মুখ দেখেই বোঝা যায় খুব সুখী। আদিত্য মুখখানাকে করুণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলতেন : ঐ তো আমার ট্র্যাজেডী, মুখখানাকে এমন কমিক-কমিক করে পাঠিয়েছেন ভগবান, যে আমার যে কোন দুঃখ আছে সে কথা বলতে যাওয়াও, যারা শোনে তাদের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক হাসির কথা। ঠিক সার্কাসের ক্লাউনের মত বা হাসির গল্প লেখকের মত। পরের দুঃখে যাদের শেষ নেই কাঁদার, নিজের দুঃখকে তারাই পরের হাসি করেছে।

দুর্গার ঘরে বাইরের আলো-বাতাস যেমন অল্প—সেখানে হাসি-খুসীর তেমনি অফুরন্ত নির্ঝর। ঘরের মেঝেয় নেই ধুলো, দেওয়ালের কোণে নেই ঝুল। বড় দেওয়াল-ঘড়ির অভাবে, পকেটঘড়িটাকে লম্বা সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কড়িকাঠের এক প্রান্ত থেকে। অর্গান-পিয়ানো সোফা কোচ শূন্য অয়েল পেন্টিং বিহীন সে ঘর ড্রয়িং রুম নয় কিন্তু বিশ্রাম-ঘর নিশ্চয়ই। আরামের চেয়ে স্বস্তি, সে-ঘরের প্রথম বক্তব্য, কম্ফার্টেব চেয়ে আনন্দ সেই ঘরণীর প্রধান গর্ব।

আদিত্য দে থামবার পাত্র নন। প্রথম বিয়ের পর কী হয়েছিল, তাই বলছিলেন : তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে এবং অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ হয় নি। বিয়ে করাটাকেই একটা মস্ত কাজ করেছি মনে করে, অন্য কাজে উৎসাহ ছিল যৎসামান্যই। বাঁধা চাকরী তো ছিলই না, রোজ কাজে যাওয়াটাও দরকার মনে করতাম না। একদিন, দুর্গা, সরোষে বকলে : পুরুষ মানুষ সারাদিন ঘরের মধ্যে অপদার্থর মত

বসে ?—লোকে বলবে কী !—লোকে কী বলবে, সে ভাবনা করে দিন ভাবিনি, কিন্তু স্ত্রীলোকে কী বলবে, তার চেয়েও মারাত্মক স্ত্রী কী বলবে, এই দুর্ভাবনায় পরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে কাটালাম বাড়ীর বাইরে। ফিরে এসে গৃহিণীর মুখের বাণী আগের দিনের চেয়েও নির্মম : সারাদিন বাড়ীর বাইরে কর কী তুমি ? সংসারে কী দরকার না দরকার, একবার খোঁজ করাও প্রয়োজন মনে কর না ? প্রমাদ গুণলাম। কী করা যায় ? বসে থাকলে, অপদার্থ। বেরুলে, বে-আক্কেলে। অনেক ভেবে, পরের দিন একবার চৌকাঠের বাইরে, একবার চৌকাঠের ভেতরে—এই করছি যখন, তখন শুনলাম, দুর্গা পেছনের বাড়ীর ছাদের কোন মেয়েকে বলছে : ওঁর মাথাটা আজ একটু গোলমাল হয়েছে বোধহয়, উনি একবার চৌকাঠের বাইরে যাচ্ছেন একবার চৌকাঠের ভেতরে আসছেন। বুঝুন। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।

—"বাঃ—"

নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসা, আজকের পৃথিবীতে বাতিল হয়ে গেছে। এমন কি, স্ত্রীর উল্লেখ করলেও লোককে আজ হাসির পাত্র হতে হয়। ডিনারে স্ত্রীর নিমন্ত্রণ হয়, কিন্তু বসবার আসন নিজের পাশে করাটা বেয়াদপি, তার মার্জনা নেই। জীবনের পার্টনারের অলিখিত মানা আছে টেনিসের মিক্সড ডাবলসে স্বামীর স্বপক্ষে খেলার। তাই টেনিস হয়েছে সেই খেলা,—যে-খেলায় love means nothing.

আদিত্য দে-কে দেখে তারই দুর্লভ ব্যতিক্রম মনে হল। গৃহছাড়া গৃহিণীর যুগে—আদিত্য আর দুর্গার মিলিত সংসারযাত্রায় যা নেই, তা হল গোঁজামিল। সংসারের তীব্র অভাব তারা বুঝতে দেয় না। কেউ বাড়ীতে এলেই করে না কপালে করাঘাত। 'নেই নেই'—শুধু এই একটি রবেই সংসারে এক দিন সত্যিই কিছু থাকে না,—সর্বস্ব robbed হতে হয় ভাগ্যের কানে গেলে সে-কথা।

আদিত্য দে-র প্রতিটি কথায় স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ অল-

সাহেব প্রা স্বামীকে ঘিরে সারাক্ষণ একটি সপ্রেম সতর্ক দৃষ্টি ছলছল করছে দুর্গার দু'টি চোখে। ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বামি-স্ত্রীর এই সাজানো বাগানও ভাগ্যের নির্দয় কটাক্ষে শুকিয়ে যেতে পারে—কিন্তু তাতে ভাগ্যেরই কাপুরুষতার পরিচয় পাই— পুরুষকারের হার হয় না তাতে। আদিত্য-দুর্গার ছোট্ট সংসারে সব চেয়ে বড় কথা যা, তা হল ভাগ্য তাদের প্রতিও বিমুখ, তবুও তারা সংসার থেকে মুখ ফেরায় নি।

দুর্গা এল একটু বাদে, হাতে তেল-নুন মাখানো মুড়ি, তার সঙ্গে ছোলা, আর পাশে এক টুকরো তিলের নাড়ু।

আমার দিকে এগিয়ে দিতেই আদিত্য দে বলে উঠলেন ঃ একেবারে প্রথম দিনেই মুড়িতে নামিয়ে আনলে,—একটু ভালো কিছু—মিষ্টি-টিষ্টি ?

দুর্গা হাসলে, বললে ঃ ভালো-ভালো খাবার উনি অনেক খেয়েছেন, এতেই বরং মুখ-বদল হবে! সেই ঘণ্টার মত নিটোল কণ্ঠস্বর, হাসলে গালের ওপর ছোট্ট টোল, বদলায়নি কিছুই। দুর্গার হেঁটে আসা লক্ষ্য করলাম। মধ্য বয়সের মধ্যপ্রান্তে কোন বাঙালী মেয়ে হেঁটে এলে মনে হয় ঘোড়ায় চেপে এল, টগবগ করতে করতে—এমন মেয়ে, শুধু দুর্গাই। তার পর একটু থেমে সেই বীণায় আলাপ করার মত গলায় বললে ঃ রাজভোগ যে আমরা রোজ খাই না, এতক্ষণে উনি তা নিশ্চয়ই বুঝেছেন। আজ জোর করে এক[illegible] রাজ-ভোগ খাওয়ালে, আমাদের দুর্ভোগ বাড়ত, উনি হাসতেন মনে মনে। আমরা যা পারি তার চেয়ে বেশি না পারলে যে তাতে কোন লজ্জা আছে, এ-কথা আর যে যতই বলুক আমি স্বীকার করি না।

সত্যিই তাই। কালোবাজারে-বড়লোকের মেয়ের বিয়েতে গিয়ে এক পাত্র আইসক্রীম কফিতেই পরম পরিতৃপ্ত হই, মূল্যবান প্রেজেণ্টে-শান দিয়ে কৃতার্থ মনে করি। আর আমাদের সমান শ্রেণীতে কন্যাদায়-গ্রস্ত কেউ যখন ভুরিভোজে আপ্যায়িত করে, তখন খেয়ে উঠে ভালো করে না আঁচিয়েই মনে- মনে গালাগাল দিই তাকে ঈর্ষায়, বলি ঃ বড্ড

পয়সার গরম দেখালে, ট্যাঁকে তো কিছুই নেই, তবুও ধার করে বাহাছুরী কিনলে—আহাম্মক কোথাকার।

ছুর্গা আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে ; যাক ওসব কথা। এখন উনি আমার সম্বন্ধে কী সব ভালো ভালো কথা বলছিলেন বলুন তো শুনি—

আদিত্য দে সন্ত্রস্ত, আমি বেপরোয়া ; বললাম ; ওসব কথাও যেতে দেওয়া যাক, সতীর নিন্দে, স্বামীর খাগু, নইলে খরচ বাড়ে।

ছুর্গার এবারের জবাব চমৎকার ঃ 'খাগু'-কথাটা ঠিক বলেছেন—হাড়-মাস আমার কিছু কি খেতে বাকী রেখেছেন ? এমনি অভাব অভিযোগ সংসারে তো আছেই, উনি তার কতটুকুই বা জানতে পান, আর আমিও ওসব গায়ে মাখি না, কিন্তু এত বয়সেও এমন ছেলেমানুষ আছেন, অপ্রস্তুতে ফেলতে পারেন এত—

ছুর্গার কথা শুনতে না শুনতেই আদিত্য দে হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

ছুর্গা চেয়ে দেখে বললে ঃ হাসা হচ্ছে এখন—রাগে গা জ্বলে যায় আমার ব্যাপারটা মনে পড়লে—

—কী রকম ?

—শুনুন ঘটনাটা তাহলে। বাড়ীতে ছু'খানা ঘর, খাবার সময়ে ছেলে-মেয়েদের অন্য ঘরে আটকে রেখে, আরেকটা ঘরে খেতে বসি, নাহলে খাওয়া হত না। ছেলে-মেয়েরা তখন একেবারে বাচ্চা, বড্ড ছুরন্ত ছিল আর অবুঝ। সেই ঠিক ছুপুর বেলায় খাবার সময় আসতেন পাড়ার এক ভদ্রমহিলা, কোথায় তাঁকে বসাই, কোথায়ই বা আমরা খাই, এই ভেবে নাজেহাল হতাম। এক দিন এসেছে ওই খাবার সময়, ওঁকে বললাম,—দেখ তো ভদ্রমহিলার কেমন আক্কেল, এই অবেলায় কেউ গল্প করতে আসে ?—এই পর্যন্ত বলতেই সেই ভদ্র-মহিলা বোধ হয় কিছু আঁচ করে থাকবেন, তাড়াতাড়ি এসে বলছেন ঃ বড্ড অসময়ে এসে অসুবিধে করলাম না ? আমি ভদ্রতার খাতিরে,

বললাম, না, না, অসুবিধে করবেন কেন, ঠিক আছে। আমার কথা শেষ হয় নি তখনও, উনি স্নানের ঘরে ছিলেন, সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন,—না, না কী, এইমাত্র আমাকে বললে, ভদ্রমহিলার কোন হুঁশ নেই, অবেলায় এসে ভয়ানক অসুবিধেয় ফেলেন, এত কথা বললে এক্ষুণি, আর এখন কথা পাল্টাচ্ছ ?

বাঃ—একটু দম নিয়ে দুর্গা শেষ করলে কথাটা !—বুঝুন আমার অবস্থাটা, আর ভদ্রমহিলা সেই কথা শুনে বললেন : হুঁ, হুঁ, ওঁর সঙ্গে চালাকী নয়, উনি সাফ কথার মানুষ ! দুর্গার কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠলেন আদিত্য দে : আর ওর কথা তো শোনেন নি এখনও—এই ক'দিন আগের ঘটনা—ব্যাপারটা কুঁজো নিয়ে—

আমি জিজ্ঞেস করলাম : কুঁজো ?

দুর্গা সরোষে বললে : ফের !

তাতে দমবার পাত্র নন আদিত্য দে—হাঁ, শুনুন ব্যাপারটা কুঁজো নিয়ে। এক দিন ঘরে ফিরে দেখি বারোটা কুঁজো। জিজ্ঞেস করলাম গৃহিণীকে, কী ব্যাপার ? গিন্নী বললেন : সিংহীমুখওলা কুঁজোর বড় সখ ছিল, আজ পেয়ে গেলাম তাই কিনলাম। আমার প্রশ্ন : বারোটা ? —হ্যাঁ নিলাম, কারণ ডজনে এক আনা সুবিধে হল, আর লোকটাও বললে—এই গরমে আর কোথায় নিয়ে নিয়ে বেড়াব ?—আপনিই নিয়ে নিন সব কটা, সস্তা করে দেব।

—কত করে নিলে ?—ফের জিজ্ঞেস করি।

—এক টাকা করে—দুর্গার মুখের ভাব, যেন কিছুই হয় নি।

বারো টাকার কুঁজো, বুঝুন মশাই—শুনে সেই প্রথম যা কখনো হয় নি তাই হল, আমি শুয়ে পড়লাম ! কুঁজো সেই প্রথম চীৎ হল, একেবারে যাকে বলে গিয়ে চীৎপাৎ !

আদিত্য দে আর তার বউ দুর্গার সংসার খুব ছোট। ছেলে-মেয়েয় দু'টি। একটু বাদেই তারা এল। জিজ্ঞেস করলাম : এই সব ? না আরও আছে ?

আদিত্য দে বললে : না, আমাদের ঐ এক ঢোল আর এক কাঁসি, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

ইতিহাসে রাজায়-রাজায় যুদ্ধের আছে সবিস্তার বর্ণনা, উলুখড়ের প্রাণ যাবার প্রসঙ্গের সেখানে বড় জোর উল্লেখ হতে পারে, কিন্তু তার বেশি হয় না কিছু। বইয়ের পাতায় ছাপা হয় জীবনতত্ত্ব, ভগবান আছেন কী নেই, তাই নিয়ে জমে বিতর্ক-সভা। দেশে-দেশে, যুগে-যুগে, উত্থান-পতনের রক্তাক্ত ও রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তে আছে সবাই, রাজা-প্রজার, রক্তশোষণকারী আর রক্তশোষিতের, ঔদ্ধত্যের আর লাঞ্ছনার, অপচয়ের আর বাঁচবার দ্বন্দ্বে মুখর মহাকালের চাকা; তার সতর্ক ঘোষণা—শোন, সময়ের নির্ঘোষ শোন। পড়, দেওয়ালের লেখা পড়বার কর চেষ্টা।

শুধু এর মধ্যে কোথাও নেই মধ্যবিত্তেরা, তাদের আনন্দের অংশ নেবার নেই কেউ, কেউ নেই দুর্বহ বোঝা হালকা করবার। পৃথিবীর সব দেশেই মধ্যবিত্তরা দিয়েছে—শিল্পের, শিক্ষার, বিজ্ঞানের, নূতন আবিষ্কারের জন্ম। কিন্তু তাদের কথা মনে রাখেনি কেউ। তাদের সুখ-দুঃখ ধ্বনিত হয় নি চাষা আর মজুরের জয়ধ্বনিতে, গণজাগরণের শ্লোগানে নেই তারা, তারা নেই বিপ্লবের স্মৃতিকথায়। সংসারে যারা কিছুই দিলে না, অথচ পেলে সব, তাদের নিয়েই কাব্য-কাহিনী-নাটক-ইতিহাস; আর যারা দিলে সব, কিন্তু পেলে না কিছুই সেই মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে সবাই মৌন।

ভিখিরীদের সব আছে, নেই শুধু আত্মসম্মান। মধ্যবিত্তদের সব গেছে, শুধু আত্মসম্মান ছাড়া। তাই তারা ভিখারীর অধম হয়ে বেঁচে আছে আমাদের সমাজে। সে সমাজের সব চেয়ে নির্মম রসিকতা হয় তখনই যখন ভিখারীরা হাত পাতে মধ্যবিত্তের কাছে। এক জনের হাতে কিছু থাকলেও আবার চাইতে লজ্জা নেই; আরেক জনের হাতে কিছু না থাকলেও দিতে না পারার আছে লজ্জা।

তারপর এক সময়ে 'চা-টা' খেয়ে দুর্গার ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে পড়বার আগে কথা দিতে হল আবার আসবার। কথা না দিলেও আসতাম। দুর্গা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। মানুষের একটা বয়স আছে, যার পর নাকি সে আর অবাক হয় না। কোন কিছুই তাকে আঘাত করে না, জোগায় না বিস্ময়, সংসারের অভিজ্ঞতার পাথরে ঘষতে ঘষতে বিস্মিত হবার গুণটিই যায় ক্ষয়ে, আশ্চর্য বলে বস্তুটির ঘটে বিলুপ্তি। শ'য়ের একটি নাটকের একটি চরিত্রের মুখে আছে, surprised at this age? কথাটা শুনে এক সময়ে বলেছিলাম এমন কথা শ'য়ের কলমেই শুধু লেখা যায়। কিন্তু এখন বুঝি ও-কথায় শুধু চমক আছে, সত্য নেই।

সমুদ্রে তল আছে, সীমা আছে আকাশের, সব পথই কোথাও না কোথাও গিয়ে শেষ। শুধু অন্ত নেই অবাক হওয়ার। মানুষের জীবন—অনন্ত বিস্ময়ের বিরাম-বিহীন এক পালা।

অবাক করে দিয়েছিল দুর্গা আর কিছু দিয়ে নয়, একটি কথা মনে করিয়ে দিয়ে, দুর্গার সঙ্গে প্রথম পরিচয় যেদিন সেদিনকার দুর্গা বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, এখন সে কেরাণীর বউ। ভেবেছিলাম এই নিয়ে তার অনুযোগ নিশ্চয়ই প্রতিদিন বিঁধছে আদিত্য দে-কে; আড়াই শ'-টাকা মাইনের কেরাণীর কী দরকার ছিল সেই ঘর থেকে মেয়ে আনবার? বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা জুড়ে বাণিজ্য-বিস্তার যে-ঘরের, আর আধুনিক অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ,—অর্থাৎ কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ (বিকল্পে দিল্লী) চেনে যে-ঘরকে এক-ডাকে। সেদিন তেতলার ঘরে দুর্গার হাত থেকে পেন্সিল পড়ে গেলে চাকর আসত এক তলা থেকে কুড়িয়ে দিতে। আর আজ অত্যন্ত দরকারী কাজ করবার জন্যেও লোক রাখবার ক্ষমতা নেই, —তবু দুর্গার হাসি তেমনিই অকারণ, অমনি অবারণ! সত্যিই অবাক কাণ্ড!

দুর্গার ওখান থেকে বেরুলাম। কফি-হাউসে যেতে হবে। সেণ্ট্রাল এভেনিউর কফি-হাউসে দিনান্তে একবার হাজিরা দিতে না পারলে যাদের ভাত হজম হয় না, আমি হলাম তাদের একজন।

হলিউড হচ্ছে যেমন ফিলম-ম্যান, ফিলম ফ্যান,—উভয়েরই মোক্ষ, মুসলমানদের যেমন মক্কা, হিন্দুর যেমন কাশী, তেমনি যুদ্ধোত্তর কলকাতার প্রধান কেন্দ্র কফি-হাউস।

উকীলের সঙ্গে ব্যারিষ্টারের, ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসের, সিঁড়ির সঙ্গে লিফটের যে-তফাৎ স্যাঙ্গুভেলীর সঙ্গে কফি-হাউসের পার্থক্যও সেই মাত্র। স্যাঙ্গুভেলীতে চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে বসা চলে, চেঁচিয়ে ডাকা চলে বয়কে। এখানে বয়দের অঙ্গে বাবুদের চেয়ে দামী পোষাক, টেবিলের ওপরের কাচ আয়নার চেয়ে ঝকঝকে বেশি! ওখানে ভীড় কেরাণীর, এখানে আসে বিজনেস-ম্যান, অফিসের বস, বড়লোক বাবার বেকার ছেলে। স্যাঙ্গুভেলী-তে ধার রাখা চলে, কফি-হাউসে টিপস্ না দিলে উর্দিপরা বয়েদের হাত কপাল পর্যন্ত ওঠে না কিছুতেই।

আগে মান্দ্রাজ থেকে আসত শুধু ষ্টেনো, এখন আসছে কফি। কফি-গন্ধে ইতিমধ্যেই উতলা হয়েছে কলকাতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অদ্বিতীয় অবদান এই ইণ্ডিয়া কফি হাউস। এখানে এলেই বোঝা যায় বাঁচার কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন কিছুর নেই লক্ষ্মীশ্রী, সবাই কেমন ছন্নছাড়া। পরবার নেই রুচি, বলবার ভাষা জগাখিচুড়ী, আলোচনার বিষয় সিনেমা। ভোজনং যত্র-তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরের যথার্থ প্রতীক আজকের কলকাতা। কফি-হাউস তার যথার্থ প্রতিবিম্ব।

টি ফর টু, কিন্তু কফি ফর too many. তাই চায়ের কাপে কখন কখন তুফান উঠলেও, কফির পেয়ালায় Fun-ও জমে না ভালো করে। কফি-তে ঘুম নষ্ট করে কী না জানি না কিন্তু খেলে উৎসাহ বৃদ্ধি করে এমন কথা বিজ্ঞাপনে বলাও বড্ড বাড়াবাড়ি। তবুও কফি-

হাউস টিঁকে গেল কলকাতায়; এবং এখন শুধু চা আর সিগারেট নয়, কফি না খেলেও এখন বাঁচা শক্ত। মঘা-অশ্লেষা তো আছেই, তবু তৃতীয়টি না হলে কি তাকে ত্র্যহস্পর্শ বলা চলত? এই কফি-হাউসে ঢুকেই আমার চোখ খুলেছে প্রথম, কান সব সময়ে সজাগ থাকবার পেয়েছে ট্রেনিং।

সকালে দরজা খোলবার এবং রাতে বাতি নিবে যাবার আগে পর্যন্ত কারুকে-কারুকে এখানে দেখা যায় কখন কফি খাচ্ছে, কখন খাচ্ছে না, সিগারেট এই পুড়ছে, এই পুড়ছে না; কিন্তু চুপ করে বসে নেই এক মুহূর্ত। সবাই কথা বলছে। এক কথা, এক লোক, এক জায়গায়। স্থান-কাল-পাত্রে নেই কোন প্রভেদ। একটা চাপা গুঞ্জন উঠছে সব সময়। কাজের কথা নয়, অকাজের কথাও নয়, শুধু কথার জন্যে কথা।

কলকাতায় অনেক রাতেও ট্রাম-বাস ফাঁকা হয় না, কখন কখন দাঁড়িয়ে যেতে-আসতেও মেলে না জায়গা। কফি-হাউসেও খালি সীটের সংখ্যা সব সময়েই আঙুলে গোনা যায়। দেখে-শুনে তাই ভাবতে ইচ্ছে করে কলকাতার *বেশ কিছু লোক বুঝি ট্রামে-বাসেই থাকে, কফি-হাউসেই বুঝি দশটা-পাঁচটার চাকরী তাদের।*

দুটি প্রধান কফি-হাউস কলকাতায়। একটি এ্যালবার্ট হলে, আরেকটি সেন্ট্রাল এভেনিউ-তে। এ্যালবার্ট হলে যারা ভীড় করে, তারা ছাত্র-ছাত্রী—দেশের ভবিষ্যৎ। সেন্ট্রাল এভেনিউতে নিয়মিত হাজিরা যাদের, তাদের ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই এবং তাদের বর্তমান হচ্ছে অতীতে কি ঘটেছিল সেই স্মৃতির রোমন্থন মাত্র। দু' দলেরই সমান আকর্ষণ কফি-হাউসে। এক দলের নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার। আরেক দলের বর্তমানকে ভুলে থাকার।

কফি-হাউসের বিচিত্র জগতে চিত্র কম, চরিত্র বেশি। আমাদের টেবিলে এসে বসতেন গোবর্ধন বাবু। প্রথমে বুঝতে পারি নি, পরে অবশ্য নিঃসন্দেহ হয়েছি, ভদ্রলোক একটি রত্ন। কী একটা

গল্প বলেছিলেন, তাতে সম্ভবত হাসাবার প্রয়াস ছিল। আমরা না হাসায়, ভদ্রলোক গল্পটা আবার বলে এবারে আর ভুল করলেন না, ঠিক জায়গায় এসে ইংরেজীতে মনে করিয়ে দিলেন, Mark the humour. তার পরে গোবর্ধন বাবু আরেক দিন বলছেন: The man fell into the ditch. ভদ্রলোক খানার মধ্যে পড়ে গেলেন—সারা গায়ে কাদা, mud all over his body—এবং বলেই, সেই সঙ্গেই, প্রায় এক নিশ্বাসেই বললেন: মার্ক দি হিউমার। কিন্তু চূড়ান্ত হল সেই দিন, যেদিন কে একজন ওমলেট আনতে বলায় বয়কে ভদ্রলোক নিজের অজান্তেই বলে বসেছেন: ওমলেট খেতে গিয়ে আবার গুবলেট ক'র না যেন। —এবং আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বলে বসেছি: Mark the humour.

গোবর্ধন বাবু সেই থেকে আসা বন্ধ করলেন। এখনও আর আসেন না।

কিন্তু Mark the humour, ভুলতে পারি না, যখনই এদেশে ইংরেজী কি বাংলায় রস-রচনা নামক এক প্রকার রচনার সঙ্গে হয় সাক্ষাৎ। আমাদের খবর-কাগজের পাতায় পরিবেশিত কারুর সরস টিপ্পনি যদি একবার ভুলক্রমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পাঠিকার করে মনোরঞ্জন, তবে আর রক্ষে নেই! যা মাসে একবার পড়লে সত্যি আরেক বার পড়তে ইচ্ছে করে, বড় জোর সপ্তাহে একবার পরিবেশিত হলেও নিরাশ করে না হয়ত, তাই ছাপা হয় প্রত্যেক দিনে কাগজে আধখানা করে দু'টি কলামে বিভক্ত হয়ে। নেবু বেশি নিংড়লে তেতো হয়ে যায়। রবার বেশি টানলে ছেঁড়ে। আর রসগোল্লা বেশি চিপলে শুধু রস বেরিয়ে যায় না, হাত নোংরা করে।

সেণ্ট্রাল এভেনিউ-র কফি-হাউসে কেবিন নেই, কিন্তু মেয়েদের নিয়ে গেলে আসন সংরক্ষিত আছে সর্বদাই। ভেবে পাই না কি

আনন্দে রমণীকুলের সঙ্গে ওই হাটে গিয়ে বসা। নির্জনতায় যাদের সঙ্গ সত্যি রমণীয়, জনতায় তারা শুধু রমণীমাত্র। আধুনিক কালের বিনোদিনী বলতে পারেন সরোষে, কেন মেয়েদের সঙ্গে প্রেমালাপ ছাড়া চলে না কি অন্য আলোচনা? নিশ্চয়ই চলবে, না হলে সংসার হবে অচল, প্রয়োজন বস্তুটার থাকবে না দরকার, প্রেম হবে না দুর্লভ। মায়ের স্নেহের তিরস্কার, বোনের প্রীতির ভাই-ফোঁটা, গৃহিণীর সাংসারিক কথাবার্তা—কিছু না হলেই দিনযাত্রা অসম্পূর্ণ, কিন্তু প্রিয়ার সঙ্গে কথা শুধু ভালবাসার, প্রিয়াকে লেখবার মত শুধু প্রেমপত্র। ইনটেলেকচুয়াল তর্কেই যার অস্তিত্ব নির্ভর, সে মহিলা, কিন্তু মেয়ে নয়। তার আলো থাকতে পারে, উত্তাপ নেই। কার্ল মার্কস বলতে বিহ্বল হয় যদি কোন মেয়ে, সে বিদুষী হতে বাধ্য, কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় তার পাশ মার্কসও জুটবে কী না এমন গ্যারান্টি দিলে তা হয় প্রতিজ্ঞা করবার মত, যা নাকি করাই চলে, রাখা চলে না প্রায়ই।

কফি-হাউসের বিরতিহীন কলগুঞ্জনে সেদিন গলা মেলাতে পারছিলাম না কিছুতেই। থেকে-থেকেই চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল দুর্গা। এখনকার দুর্গাকে সবে দেখেছি। এখনও বাকী আছে দেখবার। সে বৃত্তান্তর উদ্ঘাটন হবে অল্প অল্প ক'রে ক্রমশ। মনে পড়ছিল দুর্গার প্রথম জীবনের দিনগুলো। তখন তার প্রথম যৌবনের রোদনভরা বসন্তের রঙ্গীন দিন। লোয়ার সার্কুলার রোডের সেই বাড়ী ছিলো বাংলা দেশের সব চেয়ে বড় ঠিকানা। সেখানে আসে নি বাংলা দেশের, অন্য প্রদেশের এমন কি বিদেশের এমন কোনও খ্যাতনামা কেউ ছিল না সেদিন। বাংলা দেশের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর পাওয়া যেত সে বাড়ীতে।

দাস-দাসী, লোক-লস্কর, গাড়ী-ঘোড়ায় গমগম করত দুর্গার দাদামহাশয়ের প্রাসাদ, উদ্ধত-বিনয়ে যার নাম দিয়েছিলেন তিনি পর্ণকুটির। সেই বাড়ীতেই কিশোরী থেকে তরুণীতে পদার্পণ করল

দুর্গা। আর ভালোবাসল একটি সকলের চোখে সাধারণ ছেলেকে। তার নাম নীলমণি। ঐ বাড়ীর তুলনায় সে কেউ না, কিছুই না। কিন্তু প্রেম অন্ধ। সে সাধারণের মধ্যে আবিষ্কার করে অসাধারণকে, অসামান্য বলে দেখে অতি-সামান্যকে। তাই দুর্গা খুঁজে পেল নীলমণির মধ্যে তাই, যা দুষ্মন্ত খুঁজে পেয়েও ভুলেছিলেন শকুন্তলার মধ্যে। দুর্গার কণ্ঠস্বর ছিল বাদ্যযন্ত্রের মত নিটোল। নীলমণি তাই তাকে দুর্গা বলে ডাকত না, ডাকত বীণা বলে। সেদিন নীলমণি তার ডায়েরীতে লিখেছে ঃ

নীলমণি, সে হাসির খনি
যখন-তখন হাসত।
তাকেই কিনা, গাইয়ে বীণা
ভীষণ ভালোবাসত।
যখন ইয়ে, হয়নি বিয়ে,
তখন দু'জন করত কূজন,
যখন-তখন যেত এবং আসত।
নীলমণি, সে হাসির খনি,
কাঁদার কথায় হাসত॥
সবুজ চিঠি কি নীল খাম!
আখর ত নয় ক্রিসানথিমাম,—
বীণার চোখের নীলমণি যে,
দেখত শুধু নীলমণি যে,
বাকী সবাই আছে কী নাই
কী-ই বা যেত আসত?

ছয়

হঠাৎ ঘা লাগলে যেমন চমকে উঠতে হয় তেমনি হঠাৎ জেগে উঠলাম স্বপ্নলোক থেকে, কোন একজনের প্রশ্নে : কাল মাঠে যাচ্ছেন তো? মনে পড়ে গেল এটা কফি-হাউস, দুর্গার পিতৃগৃহ লোয়ার সার্কুলার রোডের পর্ণকুটীর নয়, মনে পড়ে গেল সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতার ষ্ট্যাণ্ডার্ড-টাইম, নয় পঁয়ত্রিশ বছর আগের ফেলে-আসা জীবনের স্বর্ণকাল, প্রথম যৌবনের নানা রঙের দিন এ নয়, কিছুতেই নয়। আরও মনে পড়ে গেল কফি-হাউস তার দরজা আজকের মত বন্ধ করে দেবে আর একটু বাদেই। বাড়ী ফিরতে রাত হবে ন'টা। তার আগে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে বাসের অপেক্ষায়। বহু দূর থেকে বাসকে আসতে দেখে মনে মনে সেক্সপীয়র আওড়াতে হবে—2-B or not 2-B that is the Question.

ইতোমধ্যে আবার সেই একই ব্যক্তির দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা : কাল মাঠে যাচ্ছেন তো?

কী জবাব দেব এর? হাসলাম। হেসে বললাম : কালকের দিনটা মাঠে না মারা গেলে তো এ বছরটাই মাটি। কাল ভাইসরয়েস কাপ, থুড়ি প্রেসিডেন্টস্।

সত্যিই তাই। হর্স-রেসে না গেলে, খেলতে না হ'ক দেখতেও একবার যদি না যান হর্স-রেস, তাহলে হিউম্যান-রেসের অনেক দিক আপনার অজ্ঞাত থেকে যাবে। মানুষের আশা, মনের কত অন্ধকার দিক দেখা দেয় আমার আপনার এর-ওর-তার সকলের চোখে। দেখা দিয়ে দ্রুত মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবার দেখি আরেক দৃশ্য। ঠিক যেন ফিলমের রীল শুধু ছায়াচিত্র নয়, কায়াচিত্র!

শনি, ফকিরকে রাজা করে, রাজাকে ফকির; ফকিরকে রাজা করে যেমন ফের ফকির করবার জন্যে, তেমনি রাজাকেও ফকির করে কখন কখন আবার রাজা করবার জন্যেই; তাই শনিবারকেই যে রেসের জন্যে প্রকৃষ্ট দিন বলে গণ্য করা হয়েছে, তার পেছনেও ভাগ্যের নির্দেশ আছে কি না কে বলবে?

বহু কাল আগে এক দিন অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বকে যেতে হত মানুষের পেছন পেছন। আজ বিশ্বমেধ যজ্ঞের দিনে মানুষকে যেতে হয় অশ্বের পেছন পেছন।

সোনার পাথরবাটি কিংবা অশ্বডিম্ব, এ দুই-ই অলীক, অসম্ভব, অবাস্তব—যদি সত্যি সত্যি এ-বিশ্বাস মানুষের থাকত, তাহলে হর্স-রেসের হত না জন্ম, লটারী বলে থাকত না কোন বস্তু। জীবনের পাজল সলভ করতে না-পারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়দের জন্যেই না দেশে-দেশে ক্রশওয়ার্ড পাজল।

কিম্বদন্তীর কাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত মানুষ যত মিথ্যে জড়ো করেছে, তার মধ্যে কোন্ কথাটা সব চেয়ে বড় ধাপ্পা, ভাববার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে। যে-মানুষ মদ খেয়ে বলে দুঃখ ভোলবার জন্যে খাচ্ছি, এ-প্রাইজ তার প্রাপ্য, না যে রেসে গিয়ে বোঝাতে চায় যে এ তার ঘোড়া রোগ নয়, সে এসেছে sports-এর জন্য,—সব চেয়ে বড় মিথ্যে বলার সত্যিকারের কৃতিত্ব তারই।

কোন এক কালে রাজারা সিংহ-মানুষে লড়িয়ে দিয়ে, সুরার পাত্র হাতে নিয়ে মজা দেখতে দেখতে লুটিয়ে পড়তেন শাকীর গায়ে। সেদিন মানুষ ছিল পশুর চেয়ে ভয়াবহ। এই নর-সিংহের সংগ্রাম হ'ক না যতই পৈশাচিক, অসভ্যোচিত, এবং বিত্তবানদের প্রতিক্রিয়াশীল বদখেয়াল, তবুও এর মধ্যেই যেন ছিল সত্যিকারের সেনসেসানের পরিচয়, থ্রিলের রোমাঞ্চ। তার বদলে আজকের সার্কাসে আফিং-আসক্ত সিংহের খাঁচার মধ্যে সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে মাটিতে চাবুক আস্ফালন ন্যক্কারজনক

এবং মেয়েলী। মানুষের সেই অমানুষিক পৌরুষের দিন গেছে, এবং তার বদলে এসেছে একেবারে নিরামিষ খেলা, যেখানে গায়ে গা ঠেকলেই আছে পাহারাওলার বংশীধ্বনি। কিন্তু যে-খেলা দেখবার সময় বড় কথা নয় গা বাঁচানো, বড় কথা চোখ বাঁচানো। তাই গায়ে গা ঠেকে যাওয়া নয় কিছু, গায়ে গায়ে জড়াজড়িতেও বড় জোর *সরি অথবা excuse me, কিন্তু দেখতে গিয়ে সাদা চোখে দেখার নেই পাট, তাই চোখের ওপর সেখানে বাইনাকুলারের চোখ ওঠা বেশীর ভাগেরই।* এরই মধ্যে পুরাকালের সেই মানুষ-পশুর উন্মত্ত হু-হুঙ্কারের ক্ষীণতম সুর ধ্বনিত হয় অশ্বক্ষুরেই এক মাত্র। কিন্তু শুধু সেই থ্রিলের সন্ধানে যারা সেখানে যায় তারা ক'জন? যারা রেগুলার Race-goer, অর্থাৎ যাদের শনিবারের পাকা হাজিরা রেসের মাঠে, তারা Sportsএর থ্রিল খোঁজে না, অনুসন্ধান করে সিওর টিপস।

ভারতীয় রমণীর ঠোঁটে সিগারেট, এখনও বিলাতি মেয়ের গায়ে শাড়ীর মত দেখে অবাক হওয়ার। কিন্তু রেসের মাঠে শাড়ীর পাড় ট্রাউজারের ফোল্ডের পাশে কারুর কাছেই করে না বিস্ময়ের উদ্রেক। এই একটি মাত্র জায়গাতেই বলা চলে, নারী ও পুরুষে ঘোড়ার চক্ষে কোনও ভেদাভেদ নাই। এমন কি সেই সঙ্গেই আনাড়ী লোক এবং স্ত্রীলোকেরও এখানে সমানাধিকার প্রথম দিন থেকেই বিনা তর্কে স্বীকৃত।

শুধু তাই বা কেন?—যাদের পড়াশুনা Horse is a noble animal, (যার অপূর্ব অপরূপ বাংলা অনুবাদ হল ; অশ্ব অতি মহৎ জন্তু!) পর্যন্ত, মানে ফার্ষ্টবুকের সেই ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত যাদের দৌড়,—তাদেরও ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাবার নেই বিরাম।

এম. এ. থেকে ইউ. এম. মানে মাষ্টার অফ্ আর্টস্ থেকে আণ্ডার ম্যাট্রিক, রকফেলার থেকে রকে বসে যাদের নরক গুলজার, আশী বছরেও যাদের বুদ্ধি হল না সেই টাক-মাথা থেকে টাকার মূল্য

যাদের মাথায় ঢোকার বয়স হয়নি তখনও, এমনি অর্বাচীন পর্যন্ত। ইণ্ডিয়ান, খাস ইউরোপীয়ান এবং তার সঙ্গে না দেশী, না বিদেশী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের,—কারুর জন্যেই এখানে এই একটিমাত্র জায়গাতেই লেখা নেই ; No Vacancy !—তার বদলে এখানে অলিখিত আমন্ত্রণলিপি সর্বদাই পেশ করা আছে Wel-Come !—সু-স্বাগতম !

যারা মাঠে ঢুকল শুধু তারাই নয়, কিন্তু যারা মাঠের আশ-পাশ আছে জুড়ে তারা তো বটেই, যারা নেই মাঠের ধারে-কাছে, তারাও অনেকে নগদে অথবা ধারে খেলে, তাকিয়ে আছে ঘোড়দৌড়ের রেজাল্টের দিকে। কেউ একা, কারা বা অনেকে মিলে মেলাবার চেষ্টায় আছে ফোরকাষ্ট। পাঁচ টাকায় দিতে পারে দু'হাজার,—এই কল্পনায় গড়া তাসের ঘর বানাতে বানাতে বানাতে হিসেব থাকে না তাদের, যে, কত দু'হাজার, পাঁচটা টাকাও আনে নি পকেটে।

অশ্বঘোষ লিখেছিলেন বুদ্ধচরিত। মানুষ যে আসলে বুদ্ধু তা জানবার পর থেকে প্রতি শনিবার পৃথিবী জুড়ে রেসের মাঠে চলেছে অশ্বলিখিত বুদ্ধুচরিত রচনা। হর্স রেস নয় ; হিউম্যান রেসের যা প্রয়োজন, তা হল একটু হর্স সেন্স !

কিন্তু যারা যায় রেসের মাঠে তারা কি কেউ-ই বোঝে না যে, জুয়াতে রূপো চলে যায়, আসে না রুটি। রেস খেলে যদি রোজগার হত, তাহলে প্রয়োজন থাকত না উদয়াস্ত পরিশ্রমের, দশটা-পাঁচটার জন্যে মানুষ করত না দাসবৃত্তি, জিওমেট্রির মত সহজেই করা যেত un-employment Problem সল্‌ভ !

নিশ্চয়ই বোঝে কেউ কেউ এ তথ্য। কিন্তু যখন বোঝে তখন আর সময় থাকে না। শেষ সময়ে বড় ডাক্তারকে Call দেওয়ার মত। কলের জলের মত যখন টাকা খরচই সার হয়,—ডাক এসে গেছে যার তাকে আর ধরে রাখা যায় না তখন। কেউ কেউ যে ঠেকে শেখে, দেরী হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত যে বুঝতে পারে, তার

গল্প তো আমরা সবাই জানি। সেই দুর্ধর্ষ বড়লোকের এক মাত্র দুলালের কাহিনী। ইনসলভেন্সির এপ্লিকেশান নিয়ে যখন সে আদালতের শরণাপন্ন, তখন বিচারক জিজ্ঞেস করলেন: বসে বসে সাত পুরুষ ধরে খেলেও, আসল টাকায় যার ছাতা পড়ার কথা নয়, সেই অত টাকা তুমি ওড়ালে কিসে? 'আজ্ঞে', উত্তর দিল হৃতসর্বস্ব সেই ক্রোড়পতির একমাত্র তনয়, তখন তার চোখ খুলেছে, বর্ণপরিচয় নয়, বোধোদয় পর্যন্ত পাঠ নেওয়া হয়ে গেছে নির্মম বাস্তবের, সে বলল সুস্পষ্ট স্বরে, আস্তে আস্তে: 'It is due to Slow Horses & Fast Women, My Lord.

ঠিক তাই। জুয়া থেকে জুয়াচুরির পথও নয় খুব দূর। কারণ, টাকার জন্যে যাদের নেশা থাকে তারা যেমন একদিন টাকা করেই, নেশার জন্য যাদের টাকার দরকার তাদেরও কেমন করে না জানি যোগাড় হয়ে যায় টাকা। ধার করে, ধার না পেলে অফিসের ক্যাস ভেঙ্গে আসে সেই নেশার রসদ। সুরা আর ঘোড়া এই দুই থেকেই মোটা অঙ্কে টাকা জমা পড়ে সরকারের ট্যাক্স আদায়ের ঘরে। তবুও যে সর্বনেশে খেলায় সর্বস্বান্ত হয়েও লোভ যায় আবার খেলার, সেই খেলার থেকে টাকা আদায়ে আয়করের আয় বাড়ে বটে, কিন্তু সৎ-সরকারের মহিমা বাড়ে না তাতে।

মহাত্মাজীকে যখন বলা হয়েছিল যে 'যন্ত্র' জিনিসটা তো আর আদতে খারাপ নয়, যন্ত্রের জন্ম মানুষের উপকারের জন্যে, তাকে যদি মানুষ মন্দ কাজে লাগায় তার জন্যে যন্ত্রের অপরাধটা কোথায়? গান্ধীজী তার উত্তরে বলেছিলেন, 'না, যে জিনিস হাতে পেলে, যেমন নাকি অস্ত্র,' বেশির ভাগ লোকেরই বাসনা হয় আত্মরক্ষা নয়, অপরকে হত্যা করবার, বুঝতে হবে সে জিনিসের মধ্যেই কোথাও আছে গলদ।

'যার জয়যাত্রার মধ্যে গোপন আছে মানুষের পরাজয়বার্তা, মানুষের এক জন হয়ে আমাকে তার প্রতিবাদ করতেই হয়। অর্থাৎ যন্ত্র যদি দু'-একটি আরামের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম দিয়ে থাকে একাধিক

যন্ত্রণার, তাহলে অযান্ত্রিক যুগেই যেতে হবে বৈ কি ফিরে।' মদ আর জুয়া যদি বা দু-একটি লোককে হঠাৎ রাজা করেও দেয়, তবু যার নেশায় মানুষের অমানুষ না হয়ে উপায় নেই, সে-নেশা শুধু কখন থ্রিলের কখন অবসাদের যুক্তিতে বজায় রাখার পক্ষে সব ওকালতিই শেষ পর্যন্ত নিরুপায়।

জানি, অনেকেই আছে যারা ভাঙ্গে তবু মচকায় না। তাদের ভাব অনেকটা যেন রেসের মাঠে তাদের যাওয়া, টাকা জলে যাওয়ার জন্যেই। সেই যে পরিহাসপ্রিয় একজন বলেছিলেন, 'আমার বাড়ীর, টেলিফোনের, গাড়ীর, এমন কি আমার ছেলেপিলের সংখ্যা সবই Nine এবং সেই সঙ্গেই জুড়ে দিয়েছিলেন, ন'ঘোড়ার রেসে, যে ঘোড়াকে আমি ব্যাক করি সেও হয় Ninth।' নয়-এর পাকে পড়ে সব নয়-ছয় হয়ে যাওয়ার পরেও এই নিজেকে নিয়ে রসিকতার মধ্যে tragedy আছে, কিন্তু truth নেই।

ঘোড়ার বাজী যারাই ধরতে যায়, তারাই আশা করে ভোজবাজী একটা কিছু ঘটবেই। আশা করে প্রত্যেক বার। আর প্রত্যেক বারই তামাসা করে ঘোড়া। কিছু পাব না জেনে কেউ কারুর কাছে যায় না পৃথিবীতে। বিবেকানন্দও নয় ঠাকুরের কাছে। লটারী কেনে যারা তারা বলে বটে, 'দুটো টাকা কি চোদ্দটা টাকা তো মোটে, কত ব্যাপারেই তো বেরিয়ে যায়, যাক না লটারীতে, পাব না তো জানিই, তবুও—' এই তবুও-র বোরখা দিয়েই ঢাকা তাদের কুমারী 'আশা'। লটারী যদি এমনই, পাব না জেনে কিনত এত লোকে, তাহলে সকলের জানা অথচ আবার জানাবার মত এ গল্প চালু রইল কি করে?

সারা জীবন লটারীর টিকিট কিনে গেছেন টাকার যাঁর আর সত্যিই প্রয়োজন নেই এমন এক জন ধনকুবের। টিকিট কিনে গেছেন চল্লিশ বছর এক নাগাড়ে, কিন্তু কখন কিছু পাননি। তার পর মৃত্যুশয্যায় তাঁর ছেলেদের কাছে খবর এল, কয়েক লক্ষ টাকার প্রাইজের লক্ষ্য ভেদ করেছেন তিনি।

গৃহ-চিকিৎসককে ছেলেরা বললে: যাতে shock না লাগে হঠাৎ এমন ভাবে সইয়ে সইয়ে খবরটা দিতে হবে বাবাকে।

ডাক্তার গিয়ে বললে: ধরুন আপনি যদি হঠাৎ খবর পান যে, লটারীতে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছেন, তাহলে সে টাকা নিয়ে আপনি কি করেন?—আপনার তো এমনিতেই অনেক টাকা—?

মৃত্যুপথযাত্রী কিছু না ভেবে-চিন্তেই বলে ফেললেন: তোমাকে অর্দ্ধেক দেব ডাক্তার—

'এঁ্যা?'

হ্যাঁ, ইহলোকে ডাক্তারের সেই শেষ কথা বলা। মুমূর্ষু রুগীকে দেখতে আসা সেই ডাক্তারের death certificate দেবে কে, সেই হয়ে দাঁড়াল রুগীর শেষ চিন্তা!

কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। ব্যতিক্রম আমাদের খুনী বোস। লোকটাকে দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, হ্যাঁ, খুনী নাম সার্থক বটে। মিশকালো এলোমেলো চুল, ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে বোতাম-ছেঁড়া ফতুয়া ঠেলে, অনবরত জলে ভেজান গামছা দিয়ে মুখ মুছছে, মোছা হয়ে গেলে কখন মাথার ওপর, কখন হাতের কাছে রাখা আছে গামছা। হাই ব্লাডপ্রেসার। সামনে পানের বাক্স, একসঙ্গে চারটে করে মুখে। শুধু চেহারায় নয় লোকটা রাগলে সত্যি খুন করে ফেলতে পারে, আপনার ওপর খুসী থাকলে প্রাণ দিতে পারে আপনার জন্মে। দু'কাজই হাসতে হাসতে করবে, ফলের জন্যে করবে না অনুতাপ।

খুনী বোসকে দেখতে হয় শনিবার সকালে। গঙ্গাস্নান করে আসবার পর, ফিটফাট পোষাক সেদিন। মুখের ভাবখানা যেন গোটা টার্ফ ক্লাবটাই তুলে নিয়ে আসবে সেদিনে। শনিবার সন্ধ্যেয় দেখতে হয় আবার। কালো মুখ নীল হয়ে গেছে। জামার বোতাম চুলোয় গেছে। ফেরবার ভাড়া নেই। মুখে মটরদানা, যা নাকি রেসের ঘোড়ারও খাবার অযোগ্য, দিলে ঘোড়া রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

শনিবার রাতে ফিরে এসে শুয়ে পড়া। রবিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, রেস আর এ-জীবনে নয়। সোমবার ছুনিয়ার প্রতি বীতস্পৃহা। মঙ্গলবার রেস খেলার কুফল, এ-সম্বন্ধে বক্তৃতা, বুধবার একটু চাঞ্চল্য, রেসগাইড নিয়ে নাড়াচাড়া, মনকে প্রবোধ দেওয়া : খেলব তো আর না, বই নিয়ে দেখতে কি দোষ, বেস্পতিবার থেকে টিপসের আসা-যাওয়া, শুক্রবার অন্তর্দ্বন্দ্ব, যাব কী যাব না, শনিবার গঙ্গাস্নানের পর সোচ্চার ঘোষণা, আজই শেষ বারের মত রেসের মাঠে পদার্পণ। কখন কখন কথা রাখে খুনী বোস। কেন না, শেষ বারের মতই যাওয়া হয় সে-বছর, Seasonএর সেইটেই Last Race কি না।

খুনী বোস আপনাকে যে ঘোড়া খেলতে বলে হুস করে চলে গেল মাঠের আরেক দিকে, সে ঘোড়ার ওপর বাজী ধরে সত্যিই হয়ত আপনার জীবনে ঘটে গেল ভোজবাজী, ঘোড়া দিলে সাজ্বাতিক টাকা পাইয়ে। কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখেন চুপসে গেছে খুনী বোস। 'কী ব্যাপার দাদা?' 'আর দাদা, খুনী বোস একদম শেষ মুহূর্তে কোন জকির প্রণয়িনী ফিরিঙ্গী তরুণীকে অন্য ঘোড়ার ওপর বাজী ধরতে দেখে নিজের টিপস্ বিসর্জন দিয়ে এখন টিপসই দিয়ে টাকা ধার নিচ্ছেন অন্য লোকের কাছ থেকে।'

কিন্তু খুনী বোসকে আপনি বোঝাতে যান এ-সব কথা, বহু দিনের অন্তরঙ্গ হলে, সে আপনাকে খুন হয়ত না-ও করতে পারে, ঘুঁসি মেরে বলবে : তোমরা ভাই বি-এ এম-এ পাশ, বোঝ অনেক বেশি, জান অনেক কিছু, আমি মুখ্যু-শুক্কু মানুষ, কিন্তু রেস খেলেছি মদ খেয়েছি নিজের পয়সায়, কেউ বলতে পারবে না খুনী বোস তার পয়সায় বড়-লোকী করেছে। যে বলবে, সে-ই এ-শর্মার পয়সায় খেয়েছে, এ-শর্মা যায় নি কারুর কাছে হাত পাততে! এর কোন জবাব হয় না। জবাব দিলেও চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। খুনী বোসেদের মত লোককে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে, নিজের পয়সা বলেই শুধু

অপরাধ বেশি। নিজের পয়সায় যে করে সে নয়, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যে করে, সেই হল জাত ব্যবসাদার।

নিজের পাঁঠা যে দিকে খুসী কাটা যায়। সত্যিই যায়। কিন্তু নিজের পাঁঠা হলে তবেই! নিজে পাঁঠা হলে কিন্তু আর যায় না, তখন অন্যেই যে দিকে খুসী কাটতে থাকে, কেটে রাখে না কিছু আর।

কে যেন বলছে, নারীচরিত্র স্বয়ং শিবেরও অজ্ঞাত। যেই বলুক, সে ভুল বলেছে। নারীচরিত্র যদি বা জানা যায়, যা জানা শিবজনকেরও সত্যি সত্যি অসাধ্য তা হল মেয়েদের বয়স। কিন্তু তাও জানা যায় এই রেসের মাঠে আর লটারী খেলায়। সেই মহিলার গল্প আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি, যাকে কত নম্বরের টিকিট তুললে প্রাইজ পাওয়া যাবেই, এ-সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছিল, যে আপনার যা বয়স, সত্যি যা বয়স ঠিক সেই নম্বরের টিকিট ধরলে, প্রাইজ উঠবেই। মেয়েটি কি ভেবে একুশ নম্বর ধরল। দেখা গেল ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছে একত্রিশ নম্বর। কিন্তু এ কী!—মহিলাটি হঠাৎ কি কারণে কে জানে তখন অজ্ঞান হয়ে গেছেন। হুঁশ ফিরে আসতে মহিলাটি বললেন, কই হল না তো? তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হল: হবে, আসছে বছর, তখন কিন্তু বাইশ না ধরে বত্রিশ নম্বর টিকিটটা ধরবেন।

এই রেসের ঘোড়ার আবার বংশপরিচয় ঠিকুজী-কুলজী সব আছে। নিজের বাপ-ঠাকুর্দার নাম মনে রাখতে না পারলে কিছুই এসে যায় না, কিন্তু জানা চাই ঘোড়ার পেডিগ্রী। কোন ঘোড়ার বাচ্চা কে, তার দৌড় কত দূর নির্ভর করে তারই ওপর। এ-খেলারও আছে ক্যালকুলেসন! যে-ঘোড়া প্রত্যেক রেসে হারছে, সে ঘোড়ার ওপরই টাকা ধরুন প্রত্যেক বার, প্রত্যেক বার টাকার অঙ্ক যান বাড়িয়ে, কারণ এক সময়ে সে জিতবেই আর জিতলেই এত দিনের হার হয়েছে আপনার জয়।

কিন্তু সব মিলেরই গরমিল আছে, সব হিসেবেরই আছে ঠিকে ভুল। সারা সীজন বাড়িয়ে গেলেন খেলার টাকার অঙ্ক হারা-ঘোড়ায়

ওপর। সে সীজন ভর হেরে গেল ঘোড়া, পরের সীজনএ সে-ঘোড়ার করলেন না মুখদর্শন। এবং তখনই উন্মুখ হল সেই অকৃতজ্ঞ জীব। এবং শুধু উন্মুখ হল না। জীব বেরিয়ে গেলেও সেই করলে আপসেট, জিতে নিয়ে গেল বাজী, দশ টাকায় কত টাকা দিল তার হিসেবে আর যারই দরকার থাক আপনার ফুরিয়েছে প্রয়োজন। শুধু বাপ-ঠাকুর্দার খবর নয়, এর জন্যে আছে জ্যোতিষী। ঘোড়ার হাত নেই বলে আপনার হাত দেখেই বলে দেবে জ্যোতিষী-'জমিদার' কোন্ ঘোড়া ধরলে ঘোড়ার ডিম, আর কোন্ ঘোড়া ধরতে পারলে আপনি কালই ছ্যাকরা গাড়ী থেকে গাড়ীঘোড়া করতে পারবেন আজই। এর জন্যে আছে ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করা পর্যন্ত। যাবার সময় মা কালীকে বলে যাওয়া, মা, পাইয়ে দিও ট্রিবল টোটটা। যে গৃহস্থ আশ্রয় রক্ষার প্রার্থনা জানায় তার মুখেও মা কালীর নাম, যে ডাকাত আসে গৃহস্থের সর্বনাশ করতে তার মুখেও জয় মা কালী। কালীর নাম নিয়ে আপনি মুখে চুণকালি যাই মাখুন না তেমনি নির্বিকার; মড়ার ওপরই শুধু তাঁর খাঁড়ার ঘা।

কিন্তু সব জিনিসেরই কালোর মত একটা সাদা দিকও আছে। ডেভিলেরও আছে বই কি কিছু ডিউ। ফিলমষ্টার থেকে মিনিষ্টার সবাই জলচর, ময়ুর থেকে কেঁচো কেউ নয় তুচ্ছ। তাই রেসের মাঠও কাউকে কাউকে সত্যি রাজা করে দেয়। সদ্যবিবাহিতা একটি মেয়েকে শ্বশুরবাড়ীতে বরণ হয়ে যাবার পরই নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটি ছবির সামনে। ঘোমটায় মুখ ঢাকা বউটিকে বলছেন শাশুড়ী, 'প্রণাম কর মা এঁকে; প্রণাম কর; এঁর দয়াতেই আমাদের যা কিছু।' মেয়েটি প্রণাম করে উঠে দেখবার চেষ্টা করতে গেল, যাকে প্রণাম করল সে কে? দেখল, ঠাকুর-দেবতা কেউ নয়, প্রণাম করেছে সে একটি ঘোড়ার ছবিকে। হ্যাঁ, অবাক হবার কিছু নেই, বউটির শ্বশুরবাড়ীর যা কিছু ঐশ্বর্য সবই এসেছে রেসের ঘোড়ার কাছ থেকে।

এটা পড়েছিলাম, একটা ব্যঙ্গচিত্রের কাহিনীতে, এটা গল্পই। কিন্তু ঘোড়া সব সময়ই পিঠ থেকে ফেলে দেয় না,—কখনও কখনও মানুষকে পিঠে নিয়ে সওয়ার হয় সে—দিগ্বিজয়ের সওয়ার। কারণ? কারণ, ফার্স্ট বুকে পড়েছি Horse is a noble animal যার অপূর্ব অপরূপ বাংলা হল : অশ্ব অতি মহৎ জন্তু।

সাত

কফি-হাউসে 'রেস'-এর পরেই দ্বিতীয় মুখরোচক আলোচনা হল সিনেমা। 'মা'-এর জায়গা নিয়েছে আজ সিনেমা,—স্বর্গাদপি গরীয়সী। Twinkle Twinkle little star নয় আজ, তার বদলে—Twinkle Twinkle film star, How I wonder what you are?—পড়ছে নবযুগের বালক-বালিকারা। বর্ণপরিচয়ের প্রচ্ছদপট দেখে বই পড়বার আগেই তারা প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত ছবিটি চিনে ফেলে,—চিনে ফেলে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি বলে নয় পাহাড়ী সান্যালের ছবি বলে। সিনেমা চালু হবার আগে ছিল হিরো ওঅর্শিপের যুগ, এখন এসেছে হিরোইন ওঅর্শিপের হুজুগ।

সর্বাধুনিক ষ্টাইলের ঘড়িতে সবগুলো ঘণ্টার নেই উল্লেখ। দাগ আছে শুধু তিন-ছয়-নয় আর বারোটার ঘরে। এবং তা ঠিকই আছে। দেশের বারোটা বাজাবার জন্যে ৩টা ৬টা ৯টা'র অবদানই তো সবচেয়ে বেশি।

ঘরে চাল না থাকলে একদিন দেশে দুর্ভিক্ষের হত ঘোষণা। আজ চাল নয় আর, বাইরে যথেষ্ট চাল না মারতে পারলে—তবেই তাকে মনে করা হয় দুর্দিন। লোকের খেতে না পাওয়া কোন 'ঘটনা' নয় আজ, সিনেমায় যেদিন লোকের অভাব হবে, (স্ত্রীলোকের আর কী।) সেদিন সেইটেই হবে সত্যিকারের দুর্ঘটনা।

একদিন বারবনিতারাই শুধু সতী-অসতী দুই ভূমিকাতেই নামত। এখন আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই আছে 'চান্সে'র অপেক্ষায়। তাই কেরাণী স্বামীর স্ত্রী চাইছে রাজরাণী হতে। বাপের দারিদ্র্য মোচন করতে গিয়ে মেয়েকে পর্দায় অশ্রুমোচন করতে হচ্ছে গ্লিসারিন চোখে। বিশ্ববিদ্যালয় তাই বাধা দিচ্ছে না আর স্কুল ছাত্রকে ষ্টুডিওর ফ্লোরে মহড়া দিতে। তিনি ঠিকই বলেছেন যিনি বলেছেন, 'প্রগতির অনেক দূর গতি। অশেষ দুর্গতি তার সত্যিই।'

একটা জাতের পরিচয় না কি তার রঙ্গমঞ্চে—অর্থাৎ তার Stage-এ। তার ঐতিহ্যের, শিল্পের, সংস্কৃতির, রুচির মানের এক কথায় তার কৃষ্টির, তার মনোলোকের আয়না হল এই পাদপ্রদীপ। মঞ্চ হল জাতির সত্যিকারের মানস সরোবর, সেখানে সকল কালের সব মানুষের হাসি-কান্নার হীরা-পান্নার আলিম্পন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের দিন গেছে, তার বদলে এসেছে সিনেমা। পাদপ্রদীপ নয়, মাইক। প্রত্যক্ষ নয়, নেপথ্য। অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক নয়। তার বদলে সিকোয়েন্সে সিকোয়েন্সে সট-ডিভিশন।

Stage-এর চেহারা দেখেই যেমন বলা যেত দেশ কোথায় ছিল,— তেমনি সিনেমা-ই আজ বলে দিচ্ছে সেই দেশ আজ কোন Stage-এ এসে নেমেছে।

সিনেমার লেখকই আজ সাধারণের চোখে লেখক, সিনেমা ষ্টারই একমাত্র শিল্পী, সিনেমায় যিনি গান করেন, সুর দেন, তিনিই সঙ্গীতজ্ঞ। বেতারের অনুরোধের আসর মানেই ফিলম-সঙ্গীতের উপরোধ, জলসায় জনপ্রিয় শুধু—সেও সিনেমার গান। গ্রামোফোন রেকর্ডের রেকর্ড বিক্রি,—তাও সিনেমায় গাওয়া গানের কল্যাণেই।

সিনেমার খবর ছাড়া পত্র-পত্রিকা অচল। সিনেমা ষ্টারের ছবি ছাড়া দর্শনযোগ্য নয় কিছু। জীবনী মাত্রেই চিত্র-তারকার দিনপঞ্জী। বিজ্ঞাপন মানে হিরো হিরোইনদের সার্টিফিকেট। তাঁরা যে সাবান মাখেন, সেই সাবান, যে দাঁতের মাজনে তাঁদের বিশ্ববিগলিত দন্ত বিকাশ, সেই সাবান, সেই দাঁতের মাজনই বেচবার এবং কেনবার। শাড়ীর গা থেকে প্যান্টের পা, মাথার চুল থেকে কানের গয়না সব নির্দেশই তাঁদের। হোর্ডিং থেকে ফোল্ডার সুন্দর মুখের নয়, সিনেমা-মুখোদেরই সর্বত্র জয়-জয়কার।

পান করেন নি জীবনে একবারও এমন লোক কম, কিন্তু একেবারেই নেই, এমন নয়, ধূমপান করেননি জীবনে এরকম বয়স্ক লোকের নেই অভাব, কিন্তু সিনেমা দেখেন নি এমন লোক নেই একজনও।

এক-আধ জন লোক থাকলেও সেরকম স্ত্রীলোক সমাজে বাস করেন না, তাঁর অবস্থান যাদুঘরে। আট থেকে ঘাটের মড়া, বালিকা থেকে একাধিক নাবালিকার মা, রাঁচী থেকে করাচী, রাণী থেকে কেরাণী, রূপালী পর্দা সকলের জন্যই খোলা, পর্দানসীন থেকে পর্দা-উদাসীন সবাই তার দর্শক। আর যে ছবিতে এডালটারেশন যত বেশি, এডালট্‌স ওনলি-র তকমা ঝুলিয়ে তার জন্যে আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা তত জোরে।

রাধা মজেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতে, ধিনিকেষ্টরা আজকে বাঁশী বাজায় না 'সিটি' দেয় দূর থেকে। পৃথিবীতে সবচেয়ে জোরালো 'সিটি' হল সিনেমার পাবলিসিটি। সে সিটি শুনে আজকের তরুণ-তরুণীদের ঘুম টুটেছে, স্বপ্ন ছুটেছে।

আগে কিছু করতে না পারলে, হ্যানিম্যানের নামও শোনে নি এমন লোকও হোমিওপ্যাথি না জেনে হতো হোমিওপ্যাথ, রাশি-লগ্ন না জেনে জ্যোতিষী হওয়াও অনেক নিরুপায়ের ছিল শেষ উপায়। এখন দরকার হয় না তার। যার কোন স্কোপ নেই কিছু করবার, সে-ও করছে বায়স্কোপ।

বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় উপন্যাস লিখতে ভয় পেতেন। কারণ, উপন্যাস শুরু করা মাত্র, দামোদর মুখুজ্জে তার উপসংহার ভেবে রাখতেন। কিন্তু হায়, দামোদর নয় সিনেমার বর্বরেরা তখনও তাঁর চিন্তার অগোচর ছিল তাই, না হলে তিনি জানতেন 'উপসংহার' তবু এক রকম, কিন্তু চিত্রসংহার সে কল্পনার অতীত এক হঠকারিতা— উপন্যাসকে নস্যাৎ করবার সবচেয়ে বড় মারণাস্ত্র! আজ সাহিত্যের জনক কেন, সিনেমায় 'ক্লাসিকের' অমর্যাদায় মা-বাপ বলবার নেই কেউ!

চাকরীর ইণ্টারভিউ দিতে যাওয়ার চেয়েও লোভনীয় এখন কোন তরুণী চিত্র-তারকাকে ইণ্টারভিউ করতে যাওয়া। তাতে ইহলোক ধন্য। পরলোক কৃতার্থ। সেই 'ইণ্টারভিউ' করতে গিয়ে দেখা

জনমন-অধিকারিণী অভিনেত্রী পড়ছেন শিশুপাঠ্য ডিটেকটিভ বই ফিরে এসে কাগজে লেখা : দেশের অমুক নেতৃস্থানীয়া অভিনেত্রী তি জন লেখকের ভক্ত। একজন রাসেল, অন্য দু'জন বর্নাড শ রবীন্দ্রনাথ। সেই ইন্টারভিউ-এর সময় নিজের চোখে দেখা, সম্রাজ্ঞী অভিনেত্রী যখন পিয়ানোয় বসে, তখন বারান্দায় তাঁর স্বামী কোল দিচ্ছেন ছোট ছেলেটাকে ; ফিরে এসে কাগজে রিপোর্ট দেওয়া আপনাদের চিত্তে যার অচঞ্চল আসন পাতা সেই অমুক, ষ্টুডিও থেকে ফিরে স্বামী এবং পুত্রের সেবা করাকেই একমাত্র কর্তব্য মনে করেন সেই জীবন-সার্থক-করা ইন্টারভিউতেই প্রথম প্রত্যক্ষ করা : বক্স অফিস ষ্টার মাংস খাওয়াচ্ছেন এ্যালশেসিয়ানকে। ফিরে এসে কথা লিখে ফেলা : চিরতরুণী চিত্রনায়িকা এসে বললেন, 'ঠাকুর-ঘরে ছিলাম।' খবর কাগজ মানে আসলে খবর কগজ ? যিনি করেছিলেন এই উক্তি, তাঁকে স্মরণ করি শ্রদ্ধায়। সত্যিই, যে যত সত্য-অর্ধসত্য মিলিয়ে যত গজ লম্বা করতে পারে খবর, সেই তত বড় খবর-কাগজওলা।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বাঙালী কবে প্রথম কী করেছে, একদিন তাই জানাই ছিল সাধারণ জ্ঞানের প্রমাণ। আজ সিনেমায় কবে, কে, কিসে নেমেছে, তাই জানাই হল অসাধারণ জ্ঞানের নমুনা। সে কারণেই চাকরীর পরীক্ষায় 'অশোকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কী' ?— এর উত্তরে নির্বিবাদে শুনতে হয়, 'মহল'।

সিজার নয়, VINI—VIDI—VICI,—একথা সত্যি সত্যি বলতে পারে এক সিনেমা ইণ্ডাষ্ট্রীই। Silence যে সত্যি Golden তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে চলচ্চিত্র নির্বাক্ ছিল যেদিন, সেদিন-কার কথা স্মরণ করে। সবাক হয়েছে যেদিন থেকে ছায়াছবি সেই মুহূর্ত থেকেই বাজে বকতে আরম্ভ করেছে সে। সংলাপ নয়, ছায়াচিত্রের পাত্র-পাত্রীদের মুখে এখন যা বসানো হয় তা নিছক প্রলাপ।

চলচ্চিত্র আজও পায়নি আর্টের শিল্পমোহর। কোন ইনটেলেকচুয়াল তাকে এখনও দেয়নি শিরোপা। চার্লি চ্যাপলিনকে বাদ দিলে একজন চিত্রসেবীও পাওয়া যাবে না, 'প্রতিভা' বলে যে পেয়েছে স্বীকৃতি। ইংরেজী ছবি দেখতে দেখতে যতই 'লাল' পড়ুক আমাদের জিব দিয়ে, যতই কেন না গদগদ হই আমরা, —'এমন আর হয় না,'—বলে অভিভূত হই, ওদের দেশের মনীষীরা সিনেমার মধ্যে পায়নি রসের সন্ধান, চিন্তার উদ্দীপনা, জীবনের গভীরতার উৎস।

অভিনয়-কলায় সব চেয়ে নির্ভেজাল হচ্ছে 'যাত্রা'। আদি এবং অকৃত্রিম। দৃশ্য-পরিকল্পনা নেই, আলোক-সম্পাত নেই, সকলের সামনে শুধু মাত্র অভিনয়-ক্ষমতা নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া। তাতেই হাসানো কাঁদানো, নিষ্ঠুরতায় ভয় দেখানো, ভালোবাসায় ভাসানো। যাত্রা-র পর থিয়েটার। সেখানে কৃত্রিম ব্যবস্থা আছে কিছু কিছু নিশ্চয়ই। তবুও তার মূল আবেদন প্রত্যক্ষ এবং অভিনয়-সম্বল। কিন্তু সিনেমা গোড়া থেকে শেষ আগাগোড়া মেকানিক্যাল। তাই শিল্পের ধর্ম থেকে সে বিচ্যুত। কবিতার সঙ্গে গদ্যের যে পার্থক্য চিরকালের, থিয়েটারের সঙ্গে সিনেমার সেই চারিত্রিক তফাৎ কোন দিন ঘোচবার নয়।

তবে চলচ্চিত্রের জয়যাত্রা কোন্ মন্ত্রবলে? সে-মন্ত্র 'সিনেমা'-র বিশেষ মাধ্যমে নেই, আছে আধুনিক মানুষের বহু সমস্যায় জটিল মনের মধ্যে। যে আধুনিক মন কিছু বুঝতে চায় না তলিয়ে, শুধু ভুলে থাকতে চায় খানিকক্ষণ। তার সময় নেই। পাঁচশো পাতার ক্লাসিক পড়বার নেই ফুরসৎ। দশ আনার টিকিট কেটে রূপালী পর্দায় মোদ্দা গল্পটা দেখে এলেই সে তৃপ্ত। ছবি দেখবার জন্যে, দেখে হাততালি দেবার জন্যে খবর-কাগজ পড়তে পারার মত বিদ্যেরও হয় না প্রয়োজন। অথচ পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত বই-এর চিত্তাকর্ষক চুম্বক সংস্করণ শুধু চলচ্চিত্রই হতে পেয়েছে। যা

সত্তা তাই দিয়ে কিস্তিমাৎ করার জন্যে ব্যস্ত বিংশ শতাব্দী। সম্ভবত তার ট্র্যাজেডিও সেই কারণেই। আর 'চলচ্চিত্র' হল এই শতাব্দীর বুড়ো খোকাদের মুখের চুষিকাঠি।

তখনও 'সিনেমা'-র দিন আসেনি বলেই মহাকবি মানুষের পৃথিবীকে তুলনা করেছিলেন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে। কিন্তু আজ তিনি 'ওয়ার্ল্ড ইজ এ ষ্টেজ' বলতেন না, বলতেন ষ্টেজ নয়, ওয়ার্ল্ড ইজ এ ষ্টুডিও-ফ্লোর। বলতেন আমরা এর পাত্র-পাত্রী নই। আমরাই এর কাহিনী। সত্যিই, মানুষের 'জীবনে'র চেয়ে বড় 'সিনেমা' মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁরও অজ্ঞাত।

এ-সব কথা আমার মাথায় আসত না কখনই, যদি না দুর্গার কথা মনে পড়ত। দুর্গার অতীত ও বর্তমান পাশাপাশি যদি না এসে দাঁড়াত, যদি না দেখতাম রাজনন্দিনী হয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত গৃহিণী, সিল্কের নয় মোটা কাপড় গাছকোমর করে পরা, পাউডারের প্রলেপ নয়, সারা মুখময় ঘাম আর হাতে আর পায়ে ফোস্কা আর কড়া নিয়ে সংগ্রাম করেছে অনভ্যস্ত জীবনে। চাল-ডালের হিসেব করছে, কালকে কি করে চলবে সেই চিন্তায় আজকের রাতে আসছে না ঘুম,—দুর্গার জীবনের সঙ্গে সিনেমার তফাৎ কোথায়? চলচ্চিত্রের মতই চিত্রের পর চিত্র মোশনে এবং ইমোশনে মিলে দুর্গার জীবন—সব চেয়ে বিচিত্র মোশন পিকচার তো সেই।

চলচ্চিত্রের পরিভাষায় যাকে বলে ফ্ল্যাশ ব্যাক, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার যে-জীবন দর্শকের নেপথ্যে, বর্তমানকে ব্যক্ত করবার জন্যে সেই অতীতকে এনে দাঁড় করানোর যে-প্রথা আছে সেই প্রথাতেই এসে দাঁড়াল দুর্গার সেই কিশোরী থেকে তরুণীতে পদার্পণের পেছনে ফেলে-আসা মণি-মুক্তো-বসানো অহোরাত্রের আশ্চর্য ইতিবৃত্ত।

দুর্গার সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় তার দাদামশায়ের প্রাসাদের মত, লোয়ার সার্কুলার রোডের বিখ্যাত বাড়ী 'পর্ণ কুটিরে',—সেদিনকার কলকাতা আর আজকের কলকাতায় আকাশ-পাতাল ফারাক।

আজকের কলকাতা যেমন কেরাণীর, সে-কলকাতা ছিল তেমনি কাপ্তানের। গিলে-করা পাঞ্জাবীতে ধুলোয় লুটোন লম্বা কোঁচায়, দামী শাল আর হীরে-বসানো আংটিতে সেদিনকার পুরুষেরা এবং বেনারসী শাড়ী আর জড়োয়ায় জড়োসড়ো সে সমাজের মহিলারা, ইংরেজি শিক্ষা আর এদেশী সংস্কারের ছিলেন জীবন্ত গোঁজামিল।

দুর্গার পিতামহের গৃহ ছিল সে-কলকাতার তীর্থকেন্দ্র। টাকা ছাড়া মানুষের কোন দাম ছিল না। শিক্ষা বলতে শুধু ভালো ইংরেজি বলা; কালচার বলতে সুরায় ডুবে থাকা। নিজের স্ত্রী এবং একাধিক পুত্র-কন্যা সত্ত্বেও একজন রক্ষিতা থাকলে তবেই সে সমাজের স্বনামধন্যদের কালচারের সর্বস্বত্ব হত সংরক্ষিত। না হলে নয়।

দুর্গাদের বাড়ী গিয়েই আমি প্রথম দেখলাম নিজের চোখে বড়-লোকরা মানুষ হিসেব কত দরিদ্র হতে পারে। শুধু কি তাই দেখলাম? না, আরো দেখলাম যে-সব লোককে আমরা অসাধারণ বলে জানি, প্রতিভা বলে যাঁদের পায়ে জোগাই বিস্ময়ের প্রণতি, যাঁদের এক টুকরো 'সই' এর মূল্য এক একটি হীরে দিয়ে, সেই সব অসাধারণ পুরুষরা কত ব্যাপারে অতি সাধারণ যারা, তাদের চেয়েও কত ছোট। তাঁদের মধ্যে কেউ আইন জানে, কেউ অঙ্ক কেউ ডাক্তারীতে ধন্বন্তরি, কেউ রাজ-নীতিতে চাণক্য। কিন্তু ওই পর্যন্ত, স্বার্থবুদ্ধি, লোভ লালসা, হীনবুদ্ধির কালিমায় তারা, যাদের আমরা নগণ্য মনে করি, মনে করি কুসংস্কারা-চ্ছন্ন, অশিক্ষিত, তাদের তুলনায় আরো কত কালো আরো কত অধম। খ্যাতি এবং অর্থের নেশায় বুঁদ সেই সব পুরুষকারের দম্ভে স্ফীত পুরুষরা একদিন মিলিয়ে যায় বুদবুদের মত। যারা চিরকাল হাল ধরে থাকে, দাঁড় টানে, যারা কাজ করে তারা হল সাধারণ মানুষ। সকল যুগে, সব দেশে এদেরই মাথায় পা দিয়ে অসাধারণদের ধাপে ধাপে ওঠা। সেই ধাপ থেকে পড়বার দিন কত দূরে?—সেই ধাপ্পা থেকে আমাদের বাঁচবার?

দুর্গা, ছেলে হলে বলতাম, দৈত্যকুলে সে এসেছে প্রহ্লাদের মত, মেয়ে বলে বলতে হয় দেবীর মত। যে-ঐশ্বর্য মানুষকে

অমানুষ করে, যে-বিদ্যা দান করে না বিনয়, যে কালচার শুধু ওড়াতে শেখায় হাল্কা কথার রঙীন ফানুস, সেই আবহাওয়াতেই দুর্গা ফুটে উঠল ফুলের মত, বেজে উঠল আগমনীর মত, জ্বলে উঠল জলের ওপর সূর্যের আলোর মত।

কিশোরী থেকে তরুণী, স্কুল থেকে কলেজের ছাত্রী হল দুর্গা। সেই কো-এডুকেশন চালু কলেজে একদিন বিতর্ক-সভায় এল একটি ছেলে যে বিপক্ষতা করল দুর্গার। বিতর্কের বিষয় ছিল, মেয়েদের চাকরী করা উচিত না অনুচিত। দুর্গা বলল : অবস্থা বিপর্যয়ে মেয়েদের সব সময়ই এসে দাঁড়াতে হবে ছেলেদের পাশে,—এবং প্রয়োজন হলে জীবিকার ক্ষেত্রেও। কারণ তাতে কোন অন্যায় নেই। এবং এ-পৃথিবীতে দারিদ্র্যই একমাত্র অন্যায়, আর কোন অন্যায়কে সে করে না স্বীকার।

বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় প্রথম হল দুর্গা। দ্বিতীয়, সেই ছেলেটি। বিতর্ক-সভার শেষে সেই ছেলেটি বলল দুর্গাকে, বিচারপতিরা পুরুষ মানুষ, তাই এক জন মেয়ের ভাগ্যে 'প্রথম' পুরস্কার, নইলে— দুর্গা হেসে জবাব দিল : আচ্ছা আসছে বার মেয়ে-বিচারক রাখতে বলব আপনার জন্যে।

সেই প্রথম দেখা, কিন্তু শেষ নয়।

দ্বিতীয় বার : পরীক্ষা হচ্ছে ; ছেলেটির কলমে গেছে কালি ফুরিয়ে! দুর্গা নিজের কলমটা বাড়িয়ে দিল।

আপনি কি দিয়ে লিখবেন?—প্রশ্ন শুনে মিষ্টি করে হাসল দুর্গা, তারপর বলল : আমার না লিখলেও চলবে, পরীক্ষকরা পুরুষ মানুষ, কাজেই আপনার ধারণায় প্রথম হওয়া তো আমার বাঁধা। হাসতে হাসতে বলল দুর্গা। বিতর্ক-সভার কথা সে ভোলেনি, ভুলতে পারল না এবারের দেখা হওয়াও। হাসল সেই ছেলেটাও।

পরীক্ষার পর রাস্তায় দুর্গাকে বলল : আমার নাম নীলমণি।

দুর্গা বলল : আমার নাম দুর্গা।

আট

যদিও স্যাঙ্গুভেলীকে বলেছি, মধ্যবিত্তদের যৌবনের রঙ্গভূমি, এবং সে-কথা মিথ্যেও নয়, তবুও সেই সঙ্গে যে-কথা না বললে সত্যের অপলাপ হয় তা হল মধ্যবিত্ত কলকাতাকে মনে মর্মে জানতে হলে যেতে হবে বাজারে এবং ঘুরতে হবে ট্রামে-বাসে।

যেমন ভগবান নেই মন্দিরে, নেই তীর্থস্থানে, ভগবানকে যেমন পাওয়া যাবে না পুঁথির পাতায়, মন্ত্রেও নেই, মন্ত্রণা থেকেও তিনি অনেক দূরে, ভগবান আছেন যেখানে পাথর ভেঙ্গে কাজের মানুষ বানাচ্ছে পথ, চাষা যেখানে বারো মাস কাটছে ধান, যেখানে মহাকালের চাকা কর্ম্মমুখর, ঘর্ম-মুখ-মানুষদের যেখানে ভাববার সময় নেই, ভগবান আছেন কি নেই, ভগবান আছেন যেমন সত্যিকারের শুধু সেখানেই, তেমনি মধ্যবিত্ত কলকাতা আছে বটে কেরাণীদের কর্মক্ষেত্রে, ফুটবল গ্যালারীতে, সিনেমার কিউ-তে, কিন্তু সেখানে শুধু 'আছে' মাত্র; নামে মাত্র আছে; কিন্তু সত্যিকারের মধ্যবিত্ত জীবন বেঁচে আছে মাছের আর আলু-পটলের বাজারে। এখানে থলি হাতে, ট্যাঁকে শেষ কড়ি সম্বল, অফিস লেট করার সম্ভাবনায় রুদ্ধশ্বাস, কাদা-ছপছপে যাতায়াতের পথে হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে যে দেখে নি, সে দিনের আলোয় তাজমহলের মধ্যে দেখেছে শুধু স্থাপত্য কর্ম, জ্যোৎস্নালোকে দেখে নি মৃত মর্মরপাত্রে টলমল করছে জীবনের অমৃত।

বাজার-প্রসঙ্গেই প্রথম যে-কথা মনে আসে তা হল বাঙালী-চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন সহরের কোন বাঙালীরই 'আজ বাংলা কত তারিখ?' জিজ্ঞেস করলে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যেমন এই জায়গায় সব সহুরে বাঙালীরই মিল আছে তেমনি আছে বাজার-প্রসঙ্গেও। মাছের থলি হাতে বাজার ঢোকবার

ঠিক মুখে আপনার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনার দরকার নেই, মুখ-চেনা হলেই হবে, দেখবেন সে ঐ অবস্থায় দেখা হওয়া সত্বেও জিজ্ঞেস করে বসেই আছে: 'বাজারে যাচ্ছেন বুঝি?'—শুধু বাজার-প্রসঙ্গেই বা কেন, জীবনের অন্যান্য প্রসঙ্গেও দেখুন, বেলা বারোটা, হাতে সাবান, এমন কি, হয়ত স্নানের মগ সঙ্গে করেও আপনি এলেন, কাঁধে গামছা, মাথায় তেল থাবড়াতে থাবড়াতে, এমন সময় যে-বন্ধুটি দেখা করতে এসেছেন, তিনি যিনিই হন, শুধু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হলেই তাঁর অনিবার্য প্রথম প্রশ্ন হবেই; 'চানে যাচ্ছেন বুঝি?'—ইচ্ছে করে ঠাস করে একটা জবাব দিই, 'না, চানে যাব কেন, ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছি।'

অবশ্য এ-প্রসঙ্গের সম্মুখীন হতে হয় যদি প্রশ্নকর্তা এবং আপনি, দু'জনের কেউই কানের মাথা না খেয়ে থাকেন তবেই। কারণ? কেন, আপনারা কেউ সেই দু'কালার গল্প জানেন না? বাজার যাবার পথে, দু'কালার ট্রামে হঠাৎ দেখা। এক ট্রাম লোক, কাজেই কেউ স্বীকার করতে চান না কানের খাটতা। প্রথম কালা এক রকম নিশ্চিন্ত হয়েই জিজ্ঞেস করেন: 'বাজারে যাচ্ছেন বুঝি?' দ্বিতীয় কালা শুনতে পেলেন না, কিন্তু সে-কথা বুঝতে দেবেন কেন, তাই জবাব দিলেন বিজ্ঞের মত: 'না, বাজারে যাচ্ছি।' প্রথম কালার কানে একটি কথা না গেলেও, তিনি যেন শুনতে পেয়েছেন এমন ভাব করে মহাবিজ্ঞের মত এবারে বলেন, 'তাই বলুন, আমি ভাবছি, বাজারে যাচ্ছেন বুঝি!'

বাজারের প্রসঙ্গেই আরেকটি বৈশিষ্ট্যও সমান উল্লেখযোগ্য। এবং এখানেও সব মধ্যবিত্ত বাঙালীই সমান। সেই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়টি গুরু না হলেও তার হাস্যকর গুরুত্ব কম নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে, উনিশ শ' চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, যখন বাজার দর এখনকার তুলনায় ছিল কিছুই না, এখন যেমন, তখনও তেমনি কিন্তু লোকের এক আর্তনাদ: বাজারে কিছু ছোঁবার উপায় আছে, সব আগুন! সাত টাকা মণ চালের দিন আর ষাট টাকা যখন

চালের মণ, দু'সময়েই মধ্যবিত্তদের সমান হাল। এ হচ্ছে গত শীতে, এমন ঠাণ্ডা পিতার জন্মে কখন পড়ে নি, বলবার পর এবারে শীত পড়তে না পড়তেই কাতরানো : 'এবারের শীত-টা বড্ড বেশি না হে?' আসল কথাটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত মন কিছুতেই খুসী নয়; উত্তমেও নয়, অধমেও নয়; মধ্যবিত্ত নয় শুধু, মধ্যবর্তী মন তার। তাই উত্তম এবং অধম,—দু'দলই মধ্যবিত্তদের যখনই সুবিধে পাচ্ছে, তখনই উত্তম-মধ্যম দিয়ে নিচ্ছে নয়, দুয়ে নিচ্ছে একটুও দ্বিধা না করে।

কিন্তু সব চেয়ে বেশি মিল যেখানে, সে ঠিক বাজারে নয়, সে হচ্ছে বাজার করায়। পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় যে কোন লোকের কাজ যদি তার হ'য়ে আপনি করে দিতে চান, তাতে কৃতজ্ঞ বোধ করবে না এমন আহাম্মক স্বনিধনকামী মনুষ্যজাতির এ্যাটমবোমা আবিষ্কারের যুগেও একজনকেও পাবেন না, বলতে পারি এক রকম হলফ করেই। কিন্তু বাড়ীর রান্না করার ঠাকুরকে একবার বলে দেখুন দেখি যে, 'ভাই তোমার কষ্ট করার দরকার নেই, আমিই বাজার করে দিচ্ছি,' বলা শেষ হবার আগেই দেখবেন সে ঠাকুরের আপনার বাড়ীতে হাতা-খুন্তী ধরা সেই মুহূর্তেই শেষ। এখন যারা রান্নার কাজ করে তারা তো চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে কাজে ঢোকবার সময়ই, মাইনে, কাপড়-চোপড়, কাজের সময়, ক'জন লোক, সব সুবিধে-অসুবিধে শোনবার পর জিজ্ঞেস করে, বাজার কার হাতে? ঠাকুরের হাতে বাজার না থাকলে সে ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে বেহাত।

সব পাষাণই যেমন ঠাকুর নয়, যদিও সব ঠাকুরই পাষাণ, তেমনি সব উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারেই একজন রাঁধবার ঠকুর থাকলেও সব পরিবারের কর্তাদের পেশা আলাদা কিন্তু নেশা এক : বাজার করা। এঁরা কেউ কেউ হয়ত পরের মুখে প্রায়ই ঝাল খেয়ে থাকেন, বাড়ীর রান্না ঠাকুরে করে বলে, পরের হাতে ঝোল না খেয়েও তাদের উপায় নেই কিন্তু ঝাল এবং ঝোল, দু'য়েরই উপাদান তাদের নিজেদের কেনা চাই। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, সতীদাহ প্রথা যেদিন গেছে, সেদিন

এ বিশ্বাসও বিদায় নিয়েছে। কিন্তু স্বামীর বাজার-নৈপুণ্যে যে সতীর সত্যিকারের পুণ্য, আজকালকার গৃহিণীরাও সে কথা অস্বীকার করেন না। এমন কি কোন বৃদ্ধ এখনও কর্মক্ষম আছেন এ কথা বোঝাতে হলে, 'উনি এখনও নিজে বাজার করেন', না বলে উপায় নেই।

বাজার-নিপুণ এই ব্যক্তিরা এক একটি চরিত্র। কোন বাজারে গেলে কোন্ জিনিসটি ক'ত্রয় পাওয়া যায়, এ তাঁদের নখদর্পণে। পচা আর টাটকা, ঠিক আর বাড়িয়ে বলা দাম, এক নজর দেখে বলে দেওয়াই এদের বাহাদুরী। কেউ তাদের চেয়ে সস্তায় কোন ভাল জিনিস নিয়ে গেলে এদের যে আপশোষ, সীতাকে হারিয়ে রামের বিলাপ তার কাছে কিছুই নয়!

সারা দিনের কাজ পড়ে থাকলেও ক্ষতি নেই,—কিন্তু বাজার থেকে ফিরে এসেই বাজারের হিসেব না লিখে ফেলতে পারলে এদের সারা দিনটাই নষ্ট, সমস্ত জীবনই যেন ব্যর্থ। সংসারের সার চিনেছে এরাই।

অন্য দিকে যারা টাকার বাজারে প্রথম পর্যায়ে, বাজারের টাকা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। এদের স্ত্রীরা সদাই শঙ্কিত। তাদের স্বামীকে জগতে সবাই ঠকাচ্ছে, এই হায়-হায় ধ্বনিতে তাদের গৃহ সর্বদাই প্রতিধ্বনিত। দু' টাকার জিনিস দশ টাকায় কেনে এরা, কোন অনুতাপ না করে। তাতেই তাপমাত্রা বাড়ে সুগৃহিণীর মেজাজের। সেই তাপের ওপর তপ্ত আগুন জোগায় পাশের বাড়ীর গৃহিণীর কর্তার সব চেয়ে সস্তায় সব চেয়ে ভাল জিনিসটি কেনার সালঙ্কার বর্ণনা। শুনে দুঃখের অন্ত থাকে না আর, স্বামীর প্রতি রাগের মাত্রা যত সীমা ছাড়ায় স্বামীর অনুরাগের সীমাও মাত্রাতিরিক্ত মূল্যে কেনা মান ভাঙ্গানোর হার অভিমানের মালা হয়ে ততই দোলে স্ত্রীর গলায়। রাগতে গিয়েও এমন ছেলেমানুষের ওপর যে রাগ করে সে মেয়ে নয়!

কিন্তু সত্যিই কি এরা বোকা?—না। এরা বোকা সাজতে ভালবাসে। জীবনের হার-জিতের আসল খেলায় এরা এত বার এত

জিতে গেছে, এমন অনায়াসে, যে কোথাও কোথাও এরা হারতেই ভালবাসে, বেঁচে যায় কারুর কাছে হার মানতে পারলে। দশ টাকার জিনিস এরা কেনে একশ' টাকায়। কারুর হাসি তাই এদের জীবনে জোয়ার আনে, কারুর চোখের জল এদের রাত্রিকে করে বিনিদ্র, দিবসকে বিষণ্ণ। কারুর স্মৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে মেসিনগানের সামনে এদের কানে শোনায় যুঁই ফুলের গান। প্রবাসের আকাশ মনে হয় বন্ধুর প্রসন্ন হাসি, নির্বাসনের অন্ধকার দিনগুলোকে মনে হয় প্রিয় নারীর সঙ্গে একদিন সুনিশ্চিত মিলনের মধুর প্রতীক্ষার মত। এ পৃথিবীতে সবাই সবাইকে ঠকাতে চায় না, কেউ কেউ ঠকতেও চায়, তাই মুষ্টিমেয় কয়েক জনের জন্যেই বাকী সকলের বাসযোগ্য হতে পেরেছে এ-বসুমতী।

দেশবন্ধু, শোনা যায় মেয়ের বিয়েতে লোক খাওয়ানোর জন্যে কত টাকার বাজার করতে হবে জিজ্ঞেস করেছিলেন সরকারকে। মাথা চুলকে সরকার বলেছিল : 'আজ্ঞে পনের হাজার টাকার মত লাগবে।' দেশবন্ধু নাকি হেসে বলেছিলেন, তার জবাবে, 'পনের হাজার তো চুরিই হবে, সব মিলিয়ে কত লাগবে তাই বল।'

মুসুরির ডাল খাব, অথচ পেঁয়াজ দেব না, এর যেমন কোন মানে হয় না, ফুটবল খেলা দেখার নেশা যার সে যেমন মাঠেই যায়, রেডিওতে ধারা-বিবরণী শুনে কিছুতেই পায় না তৃপ্তি, দেশভ্রমণ যার উদ্দেশ্য সে যেমন সাত দিনে উড়োজাহাজে পৃথিবী ভ্রমণ করতে না পারলে মনে করে না মহাভারত অশুদ্ধ, তেমনি মধ্যবিত্ত বাঙালীর সত্যিকার চেহারা যে দেখতে চায় না সেই বাজারের সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে চাকরকে দিয়ে চটপট মাল তুলে নিয়ে ভাবে বাজার করা হল। বাজারে যেতে সকলের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ট্রামে বাসে, পায়ে হেঁটে সকলের সঙ্গে মিশে না গেলে জানা হয় না মধ্যবিত্ত জীবন, সংসারের সত্যের সঙ্গে হয় না সাক্ষাৎ। টলষ্টয়ের ওয়ার এণ্ড পীস কেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তা সম্যক ~ নয় সম্পূর্ণ বইখানাই পড়া

দরকার। সে বইএর মার্কিনী চলচ্চিত্র সংস্করণ দেখে বা তার ডাইজেষ্ট পড়ে কখনই তা সম্ভব নয়। দূরকে আরও দূরে ঠেলে নয়, দূরকে নিকট করে তবেই মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়। মনে পড়ে সেই—

উড়ে যেতে চাও উড়ে যেতে পারো,
মেসিন পক্ষীরাজে,
যেতে চাও কাদা ছুঁড়ে যেতে পারো,
মোটর যানে তা' সাজে ;
সস্তার হারে ট্র্যামে যেতে চাও—
ট্রেনের টিকিট কাটো,
মানুষকে যদি কাছে পেতে চাও,
সবার সঙ্গে হাঁটো।

সত্যিকারের সৎ বা মহৎ সৃষ্টির অভাবেই আজকের বাংলা সাহিত্যের বাজার নিয়েছে হাল আমলে যাকে বলছি আমরা রম্য রচনা। আসল খাদ্যের দেখা নেই, পরিবেশিত হচ্ছে নিছক চাটনী। বক্তব্যের জায়গায় চুটকী। দুধের বদলে পিটুলি-গোলা। কিন্তু সত্যিকারের জীবন্ত রম্য-রচনার যদি পেতে চান স্বাদ, তাহলে ঘুরুন ট্রামে-বাসে। রম্য রচনা নয় রমণীয় রচনা! একেকটি লোক একেকটি টাইপ। কেউ অল্পেই মারমুখো, কেউ কিছুই গায়ে মাখে না, কেউ গাম্ভীর্যে কালপেঁচা, কেউ রসে টইটুম্বুর। মন্তব্যের শেষ নেই, মতান্তরের আদি। বিশ্বকর্মা থেকে অকর্মার বিশ্ব নব এই 'চব্বিশ জন বসিবে ও চুরাশী জন দাঁড়াইবে'—এরই মধ্যে। বিশ্বরূপ দর্শনের জন্যে দরকার নেই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন ; ট্রামে-বাসে রোজই কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড ঘটছে কখন না কখনই।

এই বাসে করেই আপনার যদি যাতায়াতের অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বাসের কণ্ডাক্টর মাত্রই চীজ-বিশেষ। শহরের কোন একটি রাস্তায় এসে সে যখন চিল্লাতে থাকে : "ম ইয়ানবী উতারিয়ে", তখন কি আপনার না

মনে হয়ে উপায় আছে যে, দেশবিশ্রুত রাসবিহারী বুঝি তার 'ইয়ার' ছিলেন। এই বাস-কণ্ডাক্টর যারা প্রায়ই পাঞ্জাব-তনয়, তাদের সব চেয়ে মারাত্মক উক্তি অবশ্য : "জেনানা হায় বাঁধকে" ; মনে হয় যেন এরা আজও রয়েছে পৃথ্বীরাজের যুগে, যখন পরের মেয়ের পাণিগ্রহণের জন্যে তাকে জোর করে বেঁধে নিয়ে গেলেও,. মেয়ের বাবা নারীহরণের অভিযোগে পেনাল কোডের নিতেন না শরণ। সত্যি সত্যি বীরভোগ্যা ছিল সেদিন বসুন্ধরা।

ট্রাম আর বাসে যত পার্থক্য, এত তফাৎ তাজমহলের সঙ্গে নেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল ভবনের; রাগবী থেকে লুডো খেলা নয় তার চেয়ে দূরে; অধুনা চলতি বাঙালী লেখকদের স্মৃতিকথার সঙ্গে নেই পুলিশের ডায়রীর বেশি বৈসাদৃশ্য। ট্রাম হচ্ছে কেরাণী, বাস পুরো বোহেমিয়ন; ট্রাম যেন ড্রয়িংরুমে দেখানোর একাঙ্কিকা, বাস তার বদলে শিবরাত্রির 'Whole Night performance', বড়লোকের বাড়ীতে বাচ্চাদের সুইমিং পুলের সঙ্গে যদি তুলনা চলে ট্রামের, বাস তাহলে বর্ষার দিনের বেগবান পাহাড়ী-নদী।

লাইন-টানা এক্সারসাইজ বুকে লেখার মত ট্রামগাড়ীর যাতায়াতও বাঁধা রাস্তায়। বাস বেপরোয়া; পুলিশের হাত, মানুষের পা, ল্যাম্পপোষ্টের গা, রাস্তা-পেরুন কুকুর-বেড়ালের ছা, টায়ারের হাঁ, অবতরণরত যাত্রীর অনবরত 'হাঁ', 'হাঁ',—কিছুতেই তার তোয়াক্কা নেই।

ট্রাম কারেন্টের অভাবে যেমন অচল, তেমনি ষ্ট্রাইকের আণ্ডার-কারেন্টেও মাঝে মাঝেই তার নিরুদ্দেশ যাত্রা। ট্রামের ঘর-বাড়ী আলো-হাওয়া সব আছে, মেরামত, হাসপাতাল সব। বাস অচল হলে রাস্তায় পড়ে থাকে, রোদে জলে পোড়ে। ট্রাম বড়লোকদের সাত রাজার ধন এক মাণিক; বাস Self-made যান।

তাই ট্রামের আর বাসের যাত্রায় নয় শুধু, যাত্রীতে যাত্রীতে

সাম্য সামান্যই, অমিল অনেক। ডিভাইড এণ্ড মিস-রুল ;—এই প্রথায় রাজ্য শাসন থেকে ট্রাম গাড়ী সবই চালু করেছে যারা তাদেরই বিজয়-পতাকা হল ইউনিয়ন জ্যাক। ট্রামের ফার্স্ট-এর সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়ার তফাৎ দু' পয়সা, কিন্তু মেজাজের ফারাক আসমান-জমীন। সেই কারণেই ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে যেতে যত সঙ্কোচ, ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হতে নয় তত লজ্জা। প্রত্যেকটি কথার মানে হয় কিন্তু সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ বাক্যের কোন অর্থ হয় না, এরকম যতগুলি বক্তব্য ভাষায় চালু আছে তার মধ্যে যে-দু'টির দাবী সর্বাগ্রে, তার একটি হল দেওয়ালের গায়ের : Stick no bills, আর অন্যটি ট্রামের মান্থলীতে : Not Transferable। শুধু মান্থলীতে কেন, রোজই ট্রামের ভীড়ে টিকিট ফাঁকি দেবার ইতিহাস নয় দুর্লভ। ট্রামের কণ্ডাক্টর মাইনের গুণে কি ভদ্রতাজ্ঞানে ভীড় হলেই সরে দাঁড়ায়।

কিন্তু বাসে? ভগবানকে ফাঁকী দেওয়া যত শক্ত, বিবেককে প্রবঞ্চনা করায় যত অপচেষ্টা বাসের কণ্ডাক্টরকে চোখে-ধূলো দিতে যাওয়ার তুলনায় সেগুলি অকিঞ্চিৎকর, নেহাতই বালসুলভ, নিছক অবিমৃষ্যকারিতার বেশি কিছু নয়। শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর ফুটবোর্ডে এক পা এবং কখন শূন্যে কখন ফুটপাথে এক পা দিয়ে, নামবার আগে দেখবেন—জানলা গলানো একখানি লোমশ হাত আর শুনবেন নেপথ্য-কণ্ঠ "টিকিট সাব!"

কিন্তু ব্যতিক্রম ছাড়া যেমন প্রমাণ হয় না নিয়মের নির্ভ্রান্তি, তেমনি বাসেও একবার এরকম একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মনে মনে জানিয়েছিলাম 'সাবাস!' যখনকার ব্যাপার তখন বাসে মান্থলী চালু ছিল। একটি বিধবা প্রৌঢ়া মহিলা। মোটা, কালো, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। মান্থলীটি দেখানো মাত্র বাঙালী কণ্ডাক্টরটির আপত্তি-ব্যঞ্জক চীৎকার: "এ কি, আপনি পরের টিকিট নিয়ে উঠেছেন?" বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আস্ফালন।

"দেখুন মশাই, ব্যাটা ছেলের নাম লেখা টিকিট আর উনি দেখাচ্ছেন নিজের বলে !"

সঙ্গে সঙ্গে মহিলার গর্জন এল কানে : "তবে রে !—ড্যাকরা মিনসে, আমার নিজের ছেলের টিকিট, সে হল আমার পর,—আর ওর চোদ্দ পুরুষ আমার কেউ নয়, উনি হলেন আমার আপনার,"—মহিলার গর্জন যত বাড়ে, এক-পা, এক-পা করে কণ্ডাক্টর ততই পশ্চাদপসরণ করে, যাকে বলে গিয়ে সাকসেসফুল রিট্রিট।

ট্রামে যাত্রীরা প্রায়ই বাবু ; বাসে মেহনতী মানুষ। ট্রামে যেতে নাকে এসে লাগে ফিরিঙ্গী তনুর উংকট গন্ধ ; বাসে পাগল করে গাত্রঘর্মের মিশ্রিত সুবাস। ট্রামে গায়ে গা ঠেকাবার আগেই 'Excuse me !', বাসে পা থেঁৎলে ফেললেও যদি 'উঃ' করে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য : 'অত কষ্ট হলে ট্যাক্সী করতে হয় !' বাসে বামাল নিয়ে উঠলে আলাদা টিকিট লাগে তার। ট্রামে ঘোমটা টানা বামার কাছে টিকিট চাওয়াই বারণ ; অনেক দূরে আরেক প্রান্তে-বসা তাঁর কর্তাকে খুঁজে বার করা কণ্ডাক্টরের মহৎ কর্তব্য।

ট্রামে আর বাসে সবই গরমিল ; মিল শুধু এক মারাত্মক জায়গায়। বাসের মালিক আর ট্রাম কোম্পানীর ডিরেক্টর, এদের কাউকেই ট্রামে বাসে চড়তে হয় না কখনও।

রমণীয় রচনার কথা তুলেছিলাম। ট্রামে-বাসে যেতে যেতে এই সব কথা-বার্তাই পথের দুঃখ ভোলায়। যেমন কলকাতার ট্রামে চড়েছে অথচ কাশীদা'র কথা শোনেনি এমন বাঙালী-অবাঙালী নেই বললেই হয়। কাশীর জর্দার চেয়েও বেশি সচল কাশীদা'র মুখের দরজা। অফিস কামাই আছে কাশীদা'র কখন কখন, কিন্তু মুখের কামাই নেই তাঁর কখনই।

যখন যে কথাটি দরকার দুষ্ট সরস্বতী তখনই সেই কথাটিই তাঁর

মুখে জোগান। কাশীদা' ট্রামের ফেমাস করেক্টর, কলকাতার লোকদের কাছে লিজেণ্ডারী ফিগার। তাঁর চতুর্মুখে ছড়ানো অগুন্তি অনির্বচনীয় উক্তির একটি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে: কাশীদা' ট্রামে যেতে যেতে কাকে যেন বলছেন: "কাল বাড়ীতে ঝুলন পূর্ণিমার উৎসব, অথচ বড় সাহেব ছুটি দেবে না।" "কেন?" "আর কেন, সাহেব বললে, ইংরেজিতে বুঝিয়ে বল what is that।" "তারপর?" "বললুম—বলে ফেললুম। যা থাকে কপালে বলে ঝুলন পূর্ণিমার ইংরিজি করলুম: 'Divine Honey moon'!—সাহেব ছুটি দিতে পথ পেল না আর।"

জীবনের অনেক ঘটনাই তো মনে নেই, পরকালের নেই চিন্তা, ইহলোকের কথাও বিস্মৃতপ্রায়; কিন্তু ভুলব না কোন দিন এই ডিভাইন হনিমুন। আর বেঁচে থাক কাশীদা'। শুধু কাশীরাম দাসের কথাই নয়, কাশীদা'র কথাও অমৃত সমান; যে শুনেছে সে পুণ্যবান কি না, জানি না কিন্তু ভাগ্যবান নিশ্চয়ই।

অতি তুচ্ছ, এই ট্রামের বুকেই লটকানো একটি নিশানার মধ্যেই সাহেবরা তাদের নিজেদের কবর খুঁড়েছে নিজেদের অজান্তেই। দেখে চমকে উঠতে হল একদিন। এতবার সে নিশানা দেখেছে কিন্তু বুকের মধ্যে কখনও বাজেনি এমন করে। সেদিন শাল উনিশ শ' বিয়াল্লিশ, আগষ্ট বিপ্লবের আগুনে রাঙা দিন। সামান্য ক'টি কথা কিন্তু অসামান্য তার প্রভাব। দাঁড়িয়ে ছিলাম এসপ্লানেডের ঘুমটিতে। দূর থেকে দেখলাম, ট্রাম আসছে। ধর্মতলা-হাওড়ার ট্রাম, গায়ে লেখা: DHUR-HOW!—আমি পড়লাম: "দূর হও"—মনে পড়ল গান্ধীজীর মুখনিঃসৃত মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্র: "Quit India",—ইংরেজ, ভারত ছাড়!

৩

নয়

পাওনা কখনও কখনও মারা গেলেও, পাওনাদাররা কখনই মারা যায় না। অন্তত আমার বিশ্বাস হল তাই। মর-জগতে এক তারাই শুধু অমর। মধ্যবিত্তের সংসারে দার পরিগ্রহের পর বাকী থাকে পাওনাদারের নিগ্রহ। সংসার আছে কিন্তু পাওনাদার নেই, এ যেন টাকা রোজগার আছে, কিন্তু তার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা নেই। মহাজনরা যে-পথে এগিয়েছেন সেই পথই নাকি পথ। সে-কথা আর বলতে। যে-কোন দায়ে যে-কোন বেকায়দায়, মহাজনদেরই পায়ে তো মধ্যবিত্ত পরিবারের জনে জনে মাথা মুড়োন!

জগতের চেয়ে বাস্তব কিছু না থাকলেও অনেক জগজ্জয়ী দার্শনিক বলেছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। তেমনি পাওনাদার 'বাজে লোক' হতে পারে, কিন্তু 'ধার' খাঁটি বস্তু। ধার ছাড়া উদ্ধারের আশা কম। এবং ভালো করে ভেবে দেখলে, দেখতেন, ধার করার মধ্যে নেই কোন লজ্জা। থাকলে সাহেবরা তাকে বলত না 'ক্রেডিট'। ব্যাবসা আছে অথচ বাজারে ক্রেডিট নেই, এ-যেন মা-বাপ-ভাই-বোন নিয়ে সংসার আছে, কিন্তু নিজের 'পরিবার' নেই।

'র‍্যাশন'-প্রথা যেদিন উঠে গেল সেদিন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল শহরের সব মধ্যবিত্ত-ঘরে। তাদের কাছে র‍্যাশনের দোকানের সুখের চালের চেয়ে মুদির দোকানের ধারের সোয়াস্তিই ছিল বেশি কাম্য। কিন্তু একটা কথা তারা প্রথম উত্তেজনার মুখে ভাবতেই ভুলে গিয়েছিল। র‍্যাশনের দোকানে যেমন ভয়াবহ পরিস্থিতি 'নগদা-কারবারের,' তেমনি র‍্যাশন যত দিন চালু ছিল তখন যে-কারুর কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ান যেত এই বলে যে 'টাকা ক'টা না দিলে আজ র‍্যাশন আসবে না'; র‍্যাশন যত দিন ছিল তত দিন এই অপারেশন সাকসেসফুল ছিল। মুদির দোকানে আবার বাকী রাখা

চলছে বটে,—সেই সঙ্গে ধার আনবার বাদ-বাকী রাস্তা অব্যাহত রাখাও আর চলছে না মোটে। এই থেকেই সেই বহু-প্রমাণিত সত্য আরেক বার প্রমাণ হচ্ছে। সব মঙ্গলের মধ্যেই অমঙ্গলের বীজ নিহিত আছে।

পৃথিবীতে এমন লোক আজও আছে যারা হাসিমুখে শুধু মরতে নয়, বাঁচতেও জানে; মৃত্যুভয় নেই তাদের, তবুও ধারকে তারা যমের মত ভয় করে। তারা ধার নেবে না, 'ধার' দেবেও না। জীবনের রাজপথে তারা চোখের দু'পাশঢাকা ঘোড়ার মত রাস্তা চলতে চায়। একটু এধার-ওধারও পছন্দ নয় তাদের। বাঁধা-মাইনের শেকলে বাঁধা। মাইনে পেলেই যা'র যা পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আগেই চুকিয়ে তবেই তাদের পরের পদক্ষেপ। তাই তাদের উত্তেজনাও কম, আক্ষেপও অল্প। ইনস্যুরেন্স পলিসি থেকে রিটায়ার-পরবর্তী জীবনের প্ল্যান সব তাদের ছক-কাটা। বাড়ির প্ল্যান থেকে ছেলের ভবিষ্যৎ কর্ম-সংস্থান, মেয়ের বিয়ে, মাকে তীর্থদর্শন করানো,—সব কিছু ছবির মত পর পর সাজানো, ফুলের মত ফোটানো। এরা কৃতী, কৃতবিদ্য, কীর্তিমান। সংসারের সং-এদের মধ্যে সার চিনেছে এরাই।

'সুখী কে?' বকের এ প্রশ্নে যুধিষ্ঠির নাকি বলেছিলেন, অঋণী অবস্থায় নিজ কুটীরে যিনি শাকান্নে তৃপ্ত,—তিনিই যথার্থ সুখী। এ-কথায় বক সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হয়েছিলেন, কিন্তু আজকে আর হতেন না। বক নয়, কোন বক-ধার্মিকের পক্ষেও এত বড় মিথ্যে কথাটা বলা আজ অসম্ভব হত। শাকের কথা ছেড়ে দিন; শুধু অন্নের জন্যেই এখন স্বয়ং অন্নপূর্ণার ঋণ করা ছাড়া উপায় নেই, কাজেই বাকীটা হত ধারের বোঝার ওপর শাকের আঁটি—শাক নয়।

রবীন্দ্রনাথের সব গানেরই নাকি একটি আপাত অর্থ এবং আরেকটি গভীরতর অর্থ থাকে। আপাত-অর্থে সে-গান একজন নারী বলতে পারে আরেক জন পুরুষকে। পুরুষ বলতে পারে নারীকে; আর গভীরতর অর্থে রবীন্দ্রনাথের সব গানই ভগবানকে

উদ্দেশ্য করে রচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি গান অন্তত খুঁজে পেয়েছি যার তৃতীয় একটি গভীরতম অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের সেই গান হল ঃ—

অনেক দিন তো ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশী…

এ-গান মধ্যবিত্তদের 'ন্যাশন্যাল এন্থেম' হওয়ার যোগ্য। মধ্যবিত্তরা যে প্রায়ই যা দেয় তার চেয়ে অনেকে বেশী নেয়, এ-কথা তার প্রতিবেশীর মত আর কে জানে।

অন্য বাঙ্গালী লেখকদের কথা না হয় বাদই দিলাম, রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যেও একটিও জাত-পাওনাদারের চরিত্র অনুপস্থিত। কিন্তু পাওনাদারের যেমন একেকজনের একেক রকম টাইপ, তেমনি ধার নেওয়ারও একটা চরিত্র আছে।

ধার দেওয়াই যাদের জীবিকা, তারাই জাতে আদি, অনাদি, অকৃত্রিম মহাজন। আবার ধার নেওয়াই একমাত্র জীবিকা যাদের, অর্থাৎ ধার-ই যাদের রোজগার তারাও মহাজন না হতে পারে, কিন্তু মহৎ লোক নিশ্চয়ই। এদের নিয়েই জগৎ চলছে। সেই—দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।

এই মহাজনরা একটু ছোট-বড় ইতর-বিশেষ হলেও, 'টাইপ' এদের এক। এরা টাকা দিতে জানে, টাকা নিতে জানে। আসল টাকার চেয়ে সুদের ওপরই এদের প্রথম লক্ষ্য। টাকা দেওয়ার সময় এরা সুদ কেটে নেয়, আসলের চেয়ে বেশি টাকা সুদে উশুল হয়ে যাওয়ার পর এরা আসলের জন্যে মামলার ভয় দেখায়। বাড়ী-ঘর গয়না-জমি বন্ধক রেখে, না পেলে গ্যারেন্টের পেলেও এদের কাছে টাকা পাওয়া চলে। কিছু না পেলে শুধু লোক দেখে এরা দেয়, তার পর রাস্তায়-ঘাটে বাড়ীতে আপিসে লাঞ্ছনা আর লাঠির ভয় দেখিয়ে এরা আদায় করে সুদ, আদালতে এরা যায় না, কেন না আদালতে গেলে সুদের মহিমায় অধমর্ণের পরে, আগে 'জেল' হবার সম্ভাবনা এদেরই।

কারণ আইন বড় সাজ্ঘাতিক জিনিস। বে-আইনি কিছু করতে হলে আইন জানা চাই সর্বাগ্রে। আর আদালত বড় কঠিন ঠাঁই; আদালতে যাবার ভয় দেখালে তবেই আদালতে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচা যায়। আদালতে গেলে কিন্তু আর বাঁচা যায় না,—অধমর্ণ-উত্তমর্ণ কারুরই না।

এরা নয়। এরা ছাড়াও আছে পাওনাদার। তারাই অসংখ্য, অনন্ত, ব্যাপ্ত-সর্বচরাচর। তারা প্রত্যেকে বিশিষ্ট, দুর্লভ, বিচিত্র চিজ্। মহাজন যেন সেই ভগবান,—এক এবং সর্বশক্তিমান; আর এরা তেত্রিশ কোটি দেবতা; কেউ মহাদেবের মত বেলপাতায় তুষ্ট; কেউ মা কালীর মত, অনুষ্ঠানে সামান্য ত্রুটি হলেই,—আর রক্ষে নেই।

এই সব পাওনাদাররা কেউ বাড়ীওলা, কেউ মুদি, গয়লা বা ধোপা, কেউ মনোহারী দোকানের মালিক, কেউ বন্ধু, কেউ ডাক্তার, কেউ উকীল, কেউ কাপড়ওলা, কেউ নেহাৎই চাকর-ঠাকুর, আবার কেউ মেয়ের বিবাহে পাত্রপক্ষের কর্তা।

এরা কেউ গলায় গামছা দেয়, আবার কেউ টাকা ফেরৎ চাওয়ার কথা মুখে আনতে পারে না। বাড়ী থেকে উচ্ছেদের নোটিশ হাতে আসে একজন। আরেক জন টাকা দিয়ে অন্য বাড়ীতে উঠে যেতে সাহায্য করে, "যা গেছে তা গেছে, আর কেন যায়"—এই সান্ত্বনায় ভোলায় নিজের মনকে।

বন্ধু যারা আছে, তাদের মধ্যে টাকার কথা এলেই কারুর কারুর আর দেখা নেই! কেউ কেউ টাকা ধার না দেবার শপথ আছে বলে পথ মেরে রাখে। কেউ দিয়ে যায়,—অজস্র আছে বলে, ফেরৎ পাবার সময় যাকে দিয়েছিল তার দেখা না পেলে মনে করে, 'এখন পারছে না, পারলেই দিয়ে দেবে।'

এদের মধ্যে এক দল আছে, যারা টাকার গল্প করবে, একে দিয়েছি, ওকে দিয়েছি বলে, তারপর দেবার সময় বলবে, 'ক'দিন

আগে চাইতে পারলে না?'—এবং তারপরেও আছে; তারপর সবাইকে বলে বেড়াবে, 'অমুক বড় কষ্টে আছে, এই তো আমার কাছে এসেছিল ধারের জন্যে।'

এই বিচিত্র রকমের মিত্রদের মধ্যে সাবধান শুধু 'এক ধরণ' থেকে। এরা গায়ে পড়ে এসে টাকা ধার দেয়; একবার নয় বার বার। টাকার কথা তুলতে গেলেই চাপা দেয়; যেন এ তার লজ্জা, যে নিয়েছে তার কিছুই নয়। এদের থেকে একশো হাত দূরে। না হলে অদূর ভবিষ্যতেই আছে আদালত। এবং সে বিবাদ শুধু কাঞ্চন নিয়ে নয়। তার সঙ্গে 'কামিনী'র নামও জড়ায়।

ধার করার মধ্যে একটা লজ্জা অতি অবশ্যই লুকান আছে। কিন্তু আমাদের আজকের সমাজে সেটা শুধু টাকা ধার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কেন, অনেক সময়ে আমি সে-কথা ভেবে কোন সদুত্তর পাই নি। ওদের আইনে ভিক্ষে করা ক্রাইম; ধার করা নয়। আমাদের সমাজে ভিক্ষে করায় লজ্জা নেই, ধার করায় আছে। ধার করায় যদি লজ্জা থাকে, ধার দেওয়াতেও থাকা উচিত ছিল। ভিক্ষে চাওয়া যে আইনে বারণ, ভিক্ষে দেওয়াও সে আইনে নিশ্চয়ই ক্রাইম। ধারের বেলায় কিন্তু ধার করাতেই যা-কিছু লজ্জা।—ধার দেওয়া?—সে হল ব্যাবসা। অর্থাৎ পতিতাদের রাখো সমাজের বাইরে; কিন্তু পতিতাদের কাছে নিত্য যাতায়াত যার, তাকে কর সমাজপতি।

ইনস্যুরেন্স কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, মায় যারা সোনারূপোর দোকান দিয়ে করে 'বন্ধকী'র কারবার, কেউ ধার না নিলে তাদের কী হাল হত তাই ভাবি। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আসল সত্য হল সেই পুরানো কথা। অর্থাৎ একজনকে মেরে ফেললে তা হয় হত্যা, কিন্তু হাজার-হাজার হত্যা করলে তা হয় ধর্মযুদ্ধ। এক-আধ টাকা ধার করার মধ্যেই লজ্জা, কিন্তু World-bank থেকে ধার নিয়ে আসতে পারলে আপনি প্রথম শ্রেণীর ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিষ্ট।

যদি বলেন, ধার নেবার মধ্যে নেই লজ্জা, এক-আধ টাকা নেবার মধ্যেও নেই ; লজ্জা হচ্ছে সেটা সময়ে ফেরৎ না দিতে পারার মধ্যেই —তাহলে বলব, সে লজ্জাও এই টাকাটা এক-আধ টাকার অঙ্ক বলেই। লাখ-লাখ টাকা ফেরৎ দিতে না পেরে ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করছে, তাতে মামলা আছে, কিন্তু লজ্জা কোথায়? ব্যাবসার সাইনবোর্ড নাম পালটাচ্ছে পাওনাদারের হাত থেকে আইনসম্মত উপায়ে বাঁচতে, তাতে মামলাই বা হচ্ছে কোথায়, লজ্জাই বা পাচ্ছে কে? আগে দৈবাৎ কখনও ব্যাঙ্ক ফেল পড়লে, সে একটা খবর হত ; ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা আইনের চেয়ে বেশী শাস্তি পেতেন নিজের বিবেকের হাতে। তাঁরা সমাজে বেরুতে লজ্জা পেতেন। অন্ততঃ পাবলিক কেরিয়ার শেষ হয়ে যেত তাঁদের। কিন্তু আজ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ছে এ-বেলা, ও-বেলা। তাতে আর না হয় খবর, না হয় কর্মকর্তাদের লজ্জা। বরং যে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়েছে তারই উপর সকলে আজ-কাল bank করে বেশী। আজকের যুদ্ধোত্তর কলকাতায় সেই তো সত্যিকারের Public Man, Public Money নিয়ে যে পারে অবাধে ছিনিমিনি খেলতে। 'চক্ষুলজ্জা' বস্তুটা এখনও যদি এদের মধ্যে কারুর কারুর থেকে থাকে, তো তা' এড়াবার জন্যে দরকার নেই দু'কান কাটার ; কারণ তাদের সেই 'বাজে' লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যেই তো বেরিয়েছে গগলস, না কি কী বলে যেন ওকে?—Sun glass!

'ঐতিহ্য', 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি' কিংবা ইংরেজি করেই বলি (মাতৃভাষার চেয়ে সাহেবদের ভাষায় বললেই মোসাহেবদের বুঝতে সুবিধে হয় কী না!) ভারতীয় 'ট্র্যাডিশন,'—যা বলেই চিল্লাই না কেন, আমাদের আজকের 'ট্র্যাডিশন' ধার করা 'ট্র্যাডিশন'। আমাদের ভাষা, আমাদের পোষাক, আমাদের পেশা, আমাদের চিন্তা, আমাদের নেশা, আমাদের ঘর-বাড়ী সাজানো এমন কি আমাদের আশা,— সবই ধার করা।

হতে পারে পরাধীনতার জন্যেই আমাদের এই হাল। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাও যে পুরোটা অর্জিত নয়; তার অনেকটাই ধার করা। তাই স্বাধীনতা ধার দিয়ে যাবার সময়, সুদ হিসেবে আগেই ভারতবর্ষের খানিকটা কেটে দিয়ে, ইংরেজরা এ-দেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করে তবে গেছে।

পাওনাদার এবং দেনদারের সম্পর্ক সব সময়ই বিরস নয়; কখনও কখনও রসের সম্পর্কও বটে। মার্ক টোয়েন একবার তাঁর প্রতিবেশীর লাইব্রেরী থেকে বই ধার চান একখানা। প্রতিবেশীটি রসিক। মার্ক টোয়েন কী করেন, দেখা যাক,—এই ভেবে খানিকটা মজা করবার জন্যেই যেন বললেন: 'আমার লাইব্রেরীর কড়া নিয়ম হল এই যে, এখানকার বই যে পড়তে চাইবে তাকে আমার এখানে বসে পড়তে হবে।' মার্কিন সাহিত্যের রসস্রষ্টা কিছু না বলে চলে এলেন। কয়েক দিন বাদে প্রতিবেশীটি এসেছেন মার্ক টোয়েনের কাছে তাঁর ঘাসকাটার যন্ত্রটি ধার চাইতে। বোধ হয় বই-এর ব্যাপার ভুলে গেছিলেন এত দিনে। কিন্তু মার্ক টোয়েন ভোলেন নি। তিনি বললেন, 'আমার এখানে নিয়ম হচ্ছে, যে আমার ঘাসকাটার যন্তর ধার নেবে তাকে আমার বাগানেরই ঘাস কাটতে হবে।'

বই-ধারের কথায় মনে পড়ল, পরের বই যে ধার নিয়ে আসতে পারে না সে বই-ই পড়ে না। বই কেনে ধনবানে কিন্তু বই ধারে জ্ঞানবানে। আজ পর্যন্ত কি পাবলিক কি প্রাইভেট, বই ধার না নিয়ে এলে কোন লাইব্রেরীর পক্ষেই টেঁকা অসম্ভব। এবং পৃথিবীতে বহু লোক Poor Mathematician কিন্তু প্রায়ই ভাল Book keeper!

আমাদেরই দেশে দুর্লভ নয় সুলভ বই-ও একজনে কেনে, কিন্তু ধার করে পড়ে অন্তত দশ জন। পত্র-পত্রিকার ললাটেও সেই একই ভাগ্য। ফলে এক এডিশন বাংলা বই কাটতেই জগতে বহু Edison জন্মেও খোঁজ করে মরে যায়, তবুও...। বই ধার

কেন, আমাদের ট্রামের এবং লোক্যাল ট্রেনের মান্থলী টিকিটও তো ধার করেই চলছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী ধার নিয়ে না ফেরৎ হচ্ছে—দেশলাই। সিগারেট চাইলে দিতে হয়; ম্যাচবক্স চেয়ে নিয়ে Matchless করবার পর ফেরৎ না দিয়ে ধরা পড়লে তাতে বড় জোর আছে হেঁ-হেঁ করে হাসি, না আছে লজ্জা, না আছে অপরাধ।

পাওনাদার এবং দেনদার, এদের সব সময়ই শার্দুল-মেষ সম্পর্ক নয়। অর্থাৎ সব সময়ই গলায় গামছা দেবার নেই সুযোগ। পাওনাদার এবং দেনদারে সাক্ষাৎ প্রায়ই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

দুই বন্ধু মেসে থাকে। বাকী পড়েছে তিন মাসের। এক বিকেলে তারা যাবে খেলা দেখতে, ঠিক সেই সময়ই মেঘে-মেঘে বজ্রাঘাত। মেসের ম্যানেজার খবর করেছেন। একজন বিরসচিত্তে বললে: খেলাটা মাটি করলে আজ। বন্ধুটি আশ্বস্ত করবার জন্যে জবাব দিল: আসছি। ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে দেখল, 'হুণ্ডি' রেডি। সাড়ে সাতচল্লিশ টাকা বাকী পড়েছিল। এখন 'হুণ্ডি'-তে 'আনা' লেখা যায় না বলে, সাতচল্লিশ টাকার 'হুণ্ডি'-তে সই দিতে বলল ম্যানেজার। যাকে সই করতে বললে, সে একটি চিজ। সে বলল: আট আনা ছেড়ে দেবেন কেন শুধু শুধু, ওটাকে আটচল্লিশ টাকা করুন। আটচল্লিশ টাকার নতুন হুণ্ডিতে সই করে এবারে সেই চিজটি বলল: আমিই বা আট আনা বেশী দিই কেন—ওই বেশী আট আনাটা আমায় ক্যাশ দিয়ে দিন। এবং সত্যি-সত্যি নগদ আধুলি নিয়ে বন্ধুর কাছে ফিরে আসবার পর সেদিন আর সেই বন্ধুর কাছে মেস-ম্যানেজারের ডাক এলো না,—তার বাকীর জন্যে।

কিন্তু সব সময়ই হাওড়া ইউনিয়ন যে 'বগী'-টিম হবে এ কেমন কথা? মোহনবাগানেরও অন্তত এক-আধবার জেতা চাই তো।

তেমনি পাওনাদার আছে যে, যত বড় ল্যাজে-খেলান ঘড়ীবাজ হ'ক না কেন, তাকেও মাঝে মাঝে 'দ'-য়ে মজায় বৈ কি। যেমন সেই দেনদার নাছোড়বান্দা-পাওনাদারকে এড়াতে না পেরে দিল দেড়শ টাকার চেক। ব্যাঙ্কে একশ' চল্লিশ টাকা আছে মাত্র, কাজেই 'চেক' ফেরত যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই তবে দিল। কিন্তু এ-পাওনাদার সে-পাওনাদার নয়। ব্যাঙ্কের কেরাণীর কাছ থেকে কায়দা করে জেনে নিল, আছে একশ' চল্লিশ। পকেট থেকে কুড়ি টাকা বার করে দেনদারের একাউণ্ট জমা করে, বার করে নিয়ে গেল দেড়শ' টাকা। দেনদার পান চিবুতে চিবুতে যখন এল 'ব্যাঙ্কে' তখন Better late than never,—নয়, তখন : Better never than late !

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতার মধ্যবিত্তকে উপদেশ দেওয়া সহজ, ধার কোরো না। যেমন সহজ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে চাকরী পাবার আশা। শুনেছি কে একজন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় রোজ দাঁড়িয়ে থাকত। ভেতরে ঢুকত না কখনও। তার পর এক দিন এক্সচেঞ্জের সব চেয়ে বড় কর্তা যিনি, বেরুবার পথে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই ? জবাব এল : আজ্ঞে আপনার সঙ্গে আমার এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ করতে চাই।—এর উত্তরে বড় কর্তা কী বলেছিলেন জানি না, কিন্তু এটুকু জানি মানুষের যিনি স্রষ্টা, সেই জীবন-বিধাতা আজকে আর এ প্রস্তাবে 'না' করতেন না।

যে-কলকাতায় মধ্যবিত্ত পরিবারের রোজগার মাসিক ছু'শ' টাকা; আর যেখানে ছু'খানা ঘরের ভাড়া ষাট টাকা, বে-আইনী সেলামীর বদলে সেখানে ছ'মাসের ভাড়া অগ্রিম আদায়ের আছে আইনের ফাঁক; তিন পোয়া জলে এক ছটাক ছুধের (বাকীটা ওজনের গরমিল) দাম এক টাকা যেখানে, ইস্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাতে গেলেও যেখানে ইস্কুলের মাষ্টারকে প্রাইভেট টিউটর

রাখতে হয়, মাছের সের যেখানে সাড়ে তিন টাকা,—সেখানে হয় ভিক্ষে না হয় ধার,—এ-ছাড়া গত্যন্তর কী ?

তার পর অবশ্য ধারও এক সময়ে আর পাওয়া যায় না,—এধার-ওধার কোথাও হাত পেতে নয়। তখন ?—তখন সেই করুণ নাটকের পুনরাবৃত্তি হয় গ্যাসপোষ্টের তলায়-তলায় সন্ধ্যার অন্ধকার কালো না হয়ে আসতেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ছিল শুধু পতিতা; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাস্তায় বেরিয়েছে যারা তারা অর্ধ-পতিতা।

এদের নিয়ে হাসি-মস্করা ঠাট্টা হয়; ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করুণা করা যায় সবই। হয়ত সামাজিক নীতির সতর্ক অনুশাসন-বাণীও করা যায় উচ্চারণ। কিন্তু ফল হয় না তাতে। কারণ, যে-সমাজ মেয়েদের সম্মান করতে ভুলে গেছে; বিয়ের পণ দিয়ে তবে যাদের আজও পার করতে হয় বিবাহের বৈতরণী, তাদের তরী যদি মাঝপথে ডোবে, তার জন্যে তাদের দায় কতটুকু ?—যত দায়িত্ব সমাজের হাল ধরে যারা বসে আছে, তাদের তুলনায়।

পঙ্কিলতায় এই আশ্রয় নিতে বাধ্য করিয়েছি তো আমরাই। ম্যাসাজ হোম বন্ধ করা যায় আইন করে; পতিতা বৃত্তি নিরোধের সুরু করা যায় আন্দোলন,—কিন্তু চোরা গলি আর সর্পিল অন্ধকারে পাপের অতল অতলান্তিকে তবুও ঠেকানো যায় না নিমজ্জন। কারণ, পেটের ক্ষুধা মেটানোর অনিবার্যতার কাছে আরেক জনের দেহের ক্ষুধা মেটানোর লজ্জা নয় বড়।

সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়ে একটি সাঙ্ঘাতিক সামাজিক অন্যায় বন্ধ হয়েছে; বিধবা বিবাহ কিন্তু আইন-সম্মত হয়েও সাধারণের হৃদয়ে পায় নি অধিকার। অথচ মধ্যবিত্ত মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথ আজও বন্ধ। পণপ্রথা কিন্তু তেমনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। ওদিকে পূর্ববঙ্গ থেকে এসে যারা পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে পাততে চেয়েছে সংসার,—তাদের মূলধনহীন জীবন নির্মূল হয়ে যাবার আগে,—তাদের

মা-বোন-বৌদেরই এসে দাঁড়াতে হচ্ছে পথে। আর সব দেশে সব মেয়েই জানে ঘর থেকে পথে গিয়ে একবার দাঁড়ালে ঘরে আর ফেরা যায় না। পেটের আগুনে সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কারণ দারিদ্র্যই একমাত্র পাপ—আর কোন পাপ আজকে আর পাপ নয়।

অভিশপ্ত এই সমাজ ভাগ হয়ে গেছে দু' ভাগে। তার দু' তলায় যারা থাকে তারা পিয়ানো বাজায়, রেফ্রিজারেটরে জল খায়, ঘর সাজায় সোফা-কৌচে। নীচের তলার খবর রাখে না তারা। নীচের তলা একেবারে ধ্বসে গেলে তারাও যে ধ্বংস হবে, একথা বোঝায় কে? ওপরের তলায় 'নীরো' তাই তখনও বেহালা বাজায়, নীচের তলার 'রোমে' যখন আগুন লাগে। কিন্তু আর কত দিন? চোখের ওপর ভাসছে Great Dictator-এর শেষ দৃশ্য। মানুষের হাতে নির্যাতিত মানুষ মাটি থেকে মাথা তুলে দেখছে ঈশান কোণে মেঘ। তার বেদনার্ত চোখে জ্বলে উঠছে আলো। বিপ্লবের মেঘ। এবারে ঝড় আসছে! এই ছবি ভেসে আসছে চোখের ওপর, আর আওড়াচ্ছি মনে মনে :—

দু' মুঠো ভাতের জন্য
আমরা করব মা-বৌ-বোনেরে পণ্য ;
তোমরা লুঠবে হীরা-জহরৎ-পান্না,
আর না!
জেনো নিশ্চয় জিতব এবার হারব না—
আর না!

এই কথা বলছিলাম আদিত্য দে-কে এক দিন। আদিত্য দে শুনে হাসল। বলল: তাহলে আমার কথা তোমাকে বলি; ঠিক আমার নয়, দুর্গার।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক। সেই তো এ কাহিনীর শেষ কথা; আদিত্য-দুর্গার কথা। তার আগে বাকী আছে দুর্গা-নীলমণির

কাহিনী। সে-কাব্য সুরু করেছি মাত্র। সেই সুরু শেষ করলে
তবে তো শেষটা সুরু করতে পারব। বই সুরু করার আগে যেমন
ভূমিকা সারা করা। মেইন ফিচার দেখানো আরম্ভ যেমন নিউজ
রীল দেখানো শেষ হলে। রাত হয়ে যাবার আগেই যেমন সন্ধে
দেওয়া।

যতই হাস্যকর হ'ক সেই বিজ্ঞাপন, একমাত্র তারই সঙ্গে তুলনা চলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কলকাতার সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতার বিপুল পরিবর্তনের। সেই,—যে সচিত্র বিজ্ঞাপন, যাতে ধুঁকছে এমন একটি লোককে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এত বড় করা হয়েছে যে, সে অনায়াসে হাতীকে এক হাতে তুলে নিয়েছে মাথার ওপর ; অর্থাৎ শুধু বোঝাবার জন্যে যে ঔষধ খেতে মিছেই বলা নয় ; এমন একটি ওষুধের কথা সত্যি-সত্যি বলা এখানে যা খাওয়ার আগের অবস্থার সঙ্গে খাওয়ার পরের অবস্থার এমনই বিষম পার্থক্য। আলাদীনের আশ্চর্য-প্রদীপের মতই যেন কিসের ছোঁয়ায় রাতারাতি বদলে গেছে কলকাতা।

কিন্তু আলাদীনের আশ্চর্য-প্রদীপে শুধুই কি বিস্ময় ছিল ? না, সেই আশ্চর্য আলোর আরেক দিকে পড়েছিল বেদনার ছায়া। প্রদীপ পাবার আগে যে ছিল নিঃস্ব, প্রদীপ হাতে আসবার পর সমস্ত পৃথিবী মুঠোয় পেয়েও সেই মানুষ তবু কেন তা-হলে নিজেকে মনে করেছে নিঃসহায় ? সব পাবার পরেও কিছু না পাওয়ার ট্রাজেডীর আগুনেই সকল কালে আলাদীনের আশ্চর্য-প্রদীপ হয়েছে আলো ! স্বপ্নাতীত সাফল্যের ছেলে-ভুলোন রূপকথার অংশে নেই সেই আশ্চর্যের ইঙ্গিত। সমস্ত সাফল্যের শেষে যে অকারণ নির্মম ব্যর্থতা বোধ, তাতেই সে করেছে বিস্মিত, বিমূঢ়। আত্মীয়-রক্তে কলুষিত কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন থেকে জয়ী হয়ে হৃতরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আসন্ন মুহূর্তেও, সংগ্রাম-সাঙ্গ সেই স্বর্ণ-সন্ধ্যায় যুধিষ্ঠিরের চোখের কোণে চিক্ চিক্ করে উঠেছিল, গভীর আনন্দ নয় সুগভীর বেদনা। আলেকজ্যাণ্ডার ডুমার থ্রি মাস্কেটিয়ার্স দিগ্বিজয়ের প্রান্তে এসে দিক

হারানোর চিরন্তন ট্রাজেডী। মানুষের নির্মম নিয়তি। প্রকৃতির দুরন্ত পরিহাস।

কলকাতা যত না রাতারাতি বদলছে, তার চেয়েও মেক-আপ বদলেছে তারাই অনেক তাড়াতাড়ি যারা রাতকে দিন আর দিনকে রাত করার জেনেছে মন্তর। চোরা-গলির অন্ধকার পথে যাতায়াত করতে-করতে কোন্ সময়ে তারা বড় রাস্তায় বানিয়েছে বাড়ি, যার ছাদ থেকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় আকাশকে। তারপর যেতে আসতে এক সময়ে আবার সেই যে পিছল পথে মুখ-থুবড়ে পড়েছে, আর পারেনি উঠে দাঁড়াতে। আর পারেনি সেই সঙ্গেই এবং আর কোন দিন পারবেও না উঠে দাঁড়াতে এই অবাক-সহর কলকাতা; পারবে না সে আর সুস্থ হতে, সহজ হতে, স্বাভাবিক হতে; পারবে না আর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে। ক্ষয়ের 'ঘুণ' ধরিয়ে দিয়ে গেছে তার শিরদাঁড়াতে যুদ্ধের বিষ।

যুদ্ধে যাদের জীবন গেছে, বেঁচে গেছে তারা। যারা বেঁচে আছে জীবন-যুদ্ধে তারাই আজ মার খাচ্ছে, যুদ্ধের জীবনকালে নিজেদের অবস্থা গুছিয়ে নিয়েছে যারা, তাদের হাতে। শাণ-বাঁধানো শহরের পাষাণে নিজের হাতে খোদাই করে দিয়েছে সেই কথাই এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সেই করছে কলকাতার হৃদয় হরণ।

উনিশশ' পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত কলকাতা ছিল কেরাণীর শহর। সে শহরের ঘুম ভাঙ্গত সকাল দশটায়; রাত ন'টায় ফের ঘুম আসত তার চোখে। ঢিলে-ঢালা, হাইতোলা, অলস, অনন্ত অবসরের একমাত্র কাজ ছিল আড্ডা। সে-কলকাতায় উদ্বেগ ছিল অল্প; উত্তেজনা ছিল অনুপস্থিত। রসদের অভাব হয়নি তখনও মর্মান্তিক; তাই রসের গল্পে মজে ছিল যারা, তারা বেশ ছিল। উনচল্লিশ সালে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে গৃহাঙ্গন হয়েছে যুদ্ধপ্রাঙ্গণ; কিন্তু তখনও বেশ কাটছে কলকাতায়; আবেশ কাটছে না তখনও। ঘুম ভাঙ্গবার আগের মুহূর্তে আবার ভালো করে

চাদর মুড়ি দেবার মত। তার পর একদিন ঘুম ভাঙ্গল কুম্ভকর্ণের; 'সাজ' 'সাজ' রব পড়ে গেছে চতুর্দিকে। ভারত-ভাগ্য-বিধাতা তখনও ইংরেজ। তাঁরা যুদ্ধের সাজ দিতে গেল ভারতবর্ষকে। কিন্তু বাধ্য হলেও বধ্য হতে চাইল না এবার কংগ্রেস। দু-'এর টানাটানির মাঝে পড়ে এ-দেশের মানসচিত্র হল বিচিত্র। তারই প্রতিক্রিয়ায় কলকাতা সৈনিক সাজতে গিয়ে সং সাজল। প্রতিরোধ উপকরণের অভাবে, পরাজয়ের পর পরাজয়ের সঙ্গে তাল রাখা সাফল্যমণ্ডিত পশ্চাদপসরণের লজ্জা ঢাকতে গ্যাস বাতির কাচকে করা হল কালো। ঘরের জানালায় মারা হল কাগজ। সার্কাসের ক্লাউনের অভাবে এল এ-আর-পিরা। লোকে বললে এ-আর-পি নয় এয়ার্কি। পোষ্টার পড়ল দেওয়ালে-দেওয়ালে; দেশরক্ষার আহ্বান। লোকে বলল: পোষ্টার নয় ইস্পষ্টার।

দশটার আগে ঘুম ভাঙ্গত না যে সহরের, ভোর পাঁচটার আগেই জেগে উঠল সে। শঙ্খধ্বনিতে নয়; সাইরেনের শব্দে। নিশীথ কলকাতার কালো রাতের পাখায় ভর করে হেঁকে গেল 'বজ্রগর্ভ মেঘ' এক। স্পীটফায়ার, ভ্যাম্পায়ার, যেমন তাদের নাম তেমনি তাদের আওয়াজ। কিন্তু শূন্য-কুম্ভ নয় তারা; বরং পূর্ণগর্ভ পূর্ণ বজ্র-গর্ভ।

র‍্যাশনের থলি হাতে সদ্যোজাতরা শুরু করল জীবন। রূপোর চামচ নিয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য হয়েছিল যাদের তারাও কাঠ-খড়-কেরোসিনের খবর করতে রোদে পুড়তে লাগল, ভিজতে লাগল জলে।

রকে বসে নরক গুলজার করত যারা তারাও দাসত্বের-স্বর্গে উন্নীত হল যুদ্ধের কৃপায়। তারপর একদিন 'খাকী'-দের দেখা গেল কলকাতায়। জানা গেল সব চেয়ে সিভিল এ-সহরও আর নয়,—সিভিলিয়ানদের। 'নিখাকীর মা'-রা যেমন কিছুই খায় না, তেমনি 'খাকী'-পরাদের দেখা গেল অখাদ্য বলে নেই কিছুতে বীতস্পৃহা;

জলে খাবার ভেসে যায়। সে-খাবার শুধু বিস্বাদ হয় না; বিষ হয়ে যায়!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কলকাতাকে দিয়েছে ভালো খাবারের স্বাদ: ভালো পোষাকের সন্ধান; আর মন্দ মেয়ের সান্নিধ্য। তার জন্যে শুধু টাকায় কুলোয় নি; প্রয়োজন হয়েছে কালো টাকার। কালো বাজার আলো করেছে কলকাতার মধ্যরাত্রি। তার 'দিন'-কে করছে কর্মব্যস্ত, নিদ্রা-কে ব্যাহত; ঘরের চিন্তাকে অপসারিত।

অথচ আশ্চর্য এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'দাগ' রইবে না বাংলা সাহিত্যে। যেন তা ঘটে নি। হয় নি তের শ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ; দেশ ভাগ হয়ে পথে এসে দাঁড়ায় নি পূর্ববঙ্গের মানুষেরা সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে; পশ্চিম-বাঙলার ফুটপাথে, ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, বস্তির অন্ধকারে উদ্বাস্তু কলোনীর আজ এখানে কাল-ওখানকার অনিশ্চিত ভিখিরীর আখড়ায়।

বিশ্বপ্রেমে মশগুল বাংলা সাহিত্য নিজের দেশের কথা বললে নিজেকে মনে করে প্রাদেশিকভাবাপন্ন; স্বজাতির কথা ভাবলে তার আন্তর্জাতিক সাহিত্যের জাতে ওঠায় বাধা পড়ে। বাইরে প্রতিপত্তি চাই তার! ঘরে হোক না চাল বাড়ন্ত। যে খবর বলতে চায় না খবর; চিত্রে যা উপস্থিত হয়েও সবাক নয়। চলচ্চিত্রে যা সবাক হবার চেষ্টাতেই সেন্সরড্; বেতারে যা বললে তাল কেটে যায় শান্তির, গ্রামোফোনে রেকর্ড হবার নয় যা; সাহিত্যই তার একমাত্র আশ্রয়; সকল কালের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশিয়ে নিজের দেশ ও কালের কথা বলবার স্পর্ধা রাখেন শুধু ভারতী। মূঢ়-মূক-নির্বাকজনের মুখে জোগান চিরকালের ভাষা। তাই মনে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য বাংলা দেশের বেদনায় ও আনন্দে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়; নয় অণুপরিমাণ উত্তেজিত। এ সাহিত্য সজীবও নয়, সত্যও নয়, এ-সাহিত্য বোবা এবং বধির।

বাসে যেতে যেতে মন্তব্য শুনেছি: আজ-কালকার ছাত্ররা কী

হয়েছে। বলতে পারিনি মার খাবার আশঙ্কায় যে আজ-কালকার মাষ্টার-মশাইরাও যা হয়েছেন। কিন্তু তা নয়। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি থেকে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা সন্ত হাঁটতে শিখেছে যারা তাদের কথাও বলেছি, ক'জন সুস্থ জীবনের দেখেছে চেহারা? মনে পড়েছে, পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীর কথা। ব্যাঙ্কের কেরাণী, বিধবা বোন, তার ছেলে-মেয়ে, নিজের ভাই-বোন-মা নিয়ে শুধু বিচিত্র নয়, বিরাট সংসার! বিদেশী ব্যাঙ্কের একটু মানুষের মত মাইনেতেও কুলোয় না সকলের, একার রোজগারের কুলায় এতগুলি মুখ ক্ষিদেয় হাঁ করে থাকে! সন্ধ্যের পর বেরুতে হয় কাচের কারখানায়; রাত দশটায় ছুটি মেলে যখন, তখন বাড়ী ফেরার পথে অবাক হয়ে শোনে আকাশ-বাণীতে রবীন্দ্রনাথের গান: চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে! তাকিয়ে দেখে আকাশে, অনেক উঁচুতে সত্যি সত্যি পূর্ণিমার গোল চাঁদ; হাসছেও। কিন্তু চাঁদের হাসি নয় সে; সে হাসি চার্লি চ্যাপলিনের,—পরের দুঃখে আমরা যারা মুখ টিপে হাসি, আমরা কোন দিন বুঝব না চার্লিকে; কারণ নিজের দুঃখকে সে পরের হাসি করেছে।

কয়লার অভাবে পুরানো চেয়ার ভেঙ্গে তার কাঠ দিয়ে সেদিন রান্না হচ্ছে আমার প্রতিবেশীটির বাড়ীতে। এমন সময় খবর এল, কয়লা পাওয়া যাচ্ছে কাছের এক দোকানে। আড়াই সের মাথা-পিছু। অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য, অসম্ভব সুখের এক সু-খবর। যেন স্বর্গ মিলেছে হাতের মুঠোয়। দৌড়ে যেতে যেতেও দোকানে পঞ্চাশ-ষাট জনের লম্বা সারি হয়ে গেছে। খাওয়া বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু অফিসের খাতা নয়। তাই ভদ্রলোক তিনটি ভাইপোকে থলি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন যখন, তখন কিউ আরও লম্বা হয়েছে বিশ হাত, কয়লার আশা তখন আরো বাহান্ন হাত জলের তলায়। তবুও সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এলেন আপিস থেকে। কিন্তু ভাইপোরা ফেরেনি তখনও। তারপর অবশ্য একসময়ে ফিরে এল তারা। এক জন

আড়াই সের কয়লা নিয়ে, অন্য হু'জন খালি হাতে। তাদের বাড়ি একটা, মুখ যতগুলিই হোক, কাজেই কয়লাও আড়াই সের হয়েছে বরাদ্দ। কয়লা থেকে থেকে হীরের নাকি জন্ম। হবে হয়ত। কত হীরের টুকরো ছেলে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতায় এমনই কয়লা আর চাল-ডাল-চিনির জোগাড়ে হারিয়ে গেল, সে খবর আজকের কলকাতা যখন অনেক পুরানো হবে, প্রাচীন হবে আধুনিক কলকাতা, তার কেশে ধরবে পাক, তখন সেই অতি-বৃদ্ধ কলকাতার ইতিহাসে থাকবে না লেখা। কারণ, যুদ্ধের এবং জীবনের ইতিহাস একই। যারা জিতল এবং যারা হেরে গেল, ইতিহাস তাদের জন্য। কিন্তু যারা এই জেতা আর হারার, এই হার-জিত খেলার রসদ জোগাতে গিয়ে নিজেরা গেল হারিয়ে তারা কোন দিন ইতিহাস হয় না। তারা ইতিহাসের নয়, তারা সকল কালেই উপহাসের পাত্র।

মনে পড়ছে রোল্যাণ্ড রোডের বিরাট কারখানার হেড-অফিসের সেই তরুণ কেরাণীর কথা। পাশের ঘর থেকে শুনছিলাম, কার সঙ্গে কথা বলছে। কে যেন জিজ্ঞেস করল: 'খেয়ে আসেন নি?' 'না'। ছোট্ট জবাব। 'যান গিয়ে খেয়ে আসুন কিছু?' জবাব যে দেবে সে এবারে যা বলল, কোন দিন ভুলব না সে-কথা। 'অনেক দিনই তো এমন না খেয়ে আসি। মাসের মধ্যে পনের দিন কিছু না খেয়ে আসা তো ডাল-ভাতের মত হয়ে গেছে আমার কাছে।' অনেক সময়ে এখন ভাবি, মধ্যবিত্ত বাঙালী কেরানী ভাতের সঙ্গে নুণ নিয়ে খেতে বসে কোন ছুখে! ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে তার যে চোখের জল প্রতি 'গেরাসের' সঙ্গে মেশে, সেই চোখের জল কী কিছু কম লবণাক্ত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতায় যাদের কৈশোর জাত হল তারাই এ-যুগের সবচেয়ে হতভাগ্য ছেলে-মেয়ে। চোখের ওপর তারা যে-সব জিনিস দেখল চোখের আড়ালেই সে-সব জিনিস চিরকাল

হয়ে এসেছে ; সে-সব জিনিসকে মানুষ চিরকাল মনের আড়াল করে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধ শুধু জীবন-নাট্যের ওপর মৃত্যুর যবনিকা মাত্র নয় ; যুদ্ধ সাধারণ লোকের চোখের ওপর থেকে লজ্জা-অপসারণের সব চেয়ে বড় সহায়। মৃত্যুর কালো পর্দা নেমে আসা নয় শুধু, যারা বেঁচে আছে তাদের চোখের পর্দা চিরকালের মত উঠিয়ে দেয়াও যুদ্ধেরই অবদান ;—A war-product.

মাত্র কয়েক দিন আগের ঘটনা। দক্ষিণ-কলকাতার এক পার্কের পাশেই এক বাড়ীতে বসে আছি। হঠাৎ হৈ-হৈ ; তুমুল গণ্ডোগোল ; প্রচুর হল্লার সঙ্গে পালিয়ে-যাওয়া পায়ের এলোমেলো হুলুস্থুল। পার্কের মালী দৌড়ে এল, যে-বাড়ীতে বসেছিলাম সেখানে। কী হয়েছে ? "ফোন করব থানায় ?" "কেন ?" "এই দেখুন না ছ'দলে ফুটবল খেলতে কী গোলমাল হয়েছে,—ব্যস। একজন দৌড়ে এসে আমাকে বললে : 'মালী, দরজা খুলে দাও' ; আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কেন ?' 'হাতবোমা তৈরী করব' —শুনুন বাবু।"

যারা শুনছিল তারা হেসে উঠল। যেমন হেসেছিল একদিন অনুমান করতে পারি আদালত সুদ্ধ সবাই যখন বিদ্যাসাগরের ভুবন তার মাসীকে কানে কানে কথা বলার ছল করে কান কেটে নিয়ে বলেছিল, 'মাসী তুমিই আমার ফাঁসীর কারণ'।

আজকে যারা কথায়-কথায় হাত-বোমা ছোড়ে ; হোলির দিন সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে সেই ব্যবহার করতে ভরসা পায় প্রকাশ্য রাজ-পথে, অত্যন্ত পরিচিত মহিলার সঙ্গে ঘরের মধ্যে যার ভগ্নাংশতম ভঙ্গীতে লজ্জা পাওয়ার কথা, বাসে, ট্রামে, বাড়ীর রকে, পার্কে, রাস্তায়, রেস্তোরাঁয় সে-সব গর্হিত উক্তি বাহাদুরীর সঙ্গে তারস্বরে হয় উচ্চারিত,—তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সে অভিযোগ আকাশে থুথু দেবার চেষ্টার মত হয় ; সে-থুথু নিজের মুখেই শেষে এসে পড়ে। ভুবনের মাসীর মতই এই

বিশ্ব-ভুবন-জোড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের যৌবনকে করেছে বিকৃত ; তারুণ্যকে দিয়েছে বিপথ-গমনের লজ্জা ; জীবনকে করেছে জীবন-দেবতার ব্যঙ্গচিত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যা ছিল বেকার যুবকদের আড্ডা দেবার স্বর্গ, আজ সেই রক হয়েছে যুদ্ধের-চাকরী-যাওয়া সিনেমা-ষ্টার-হতে-চাওয়া ছোকরাদের নরক ; যুদ্ধের আগে এ-দেশের সাধারণ মানুষের রুচি ছিল সেখানে শুধু স্থূল ঃ আজ যুদ্ধ-পরবর্তীকালে সেখানে বিকৃত বিগর্হিত বাসনার, অশোভন রুচির হুলুস্থুল ; যারা আগে শুধু বখাটে ছিল, এই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ তাদের করে তুলেছে বিশ্ব-বখাটে !

Curd-Seller's Song—দইওলার গানে, কবি ঠিক বলেছেন যে যুদ্ধের সময় সব কিছুর দাম বেড়েছে, সব হয়েছে দুর্মূল্য, শুধু মানুষের জীবনের মূল্য ছাড়া ! ঠিক ; কিন্তু এর অতিরিক্ত যে-কথা, ঠিক সে-কথা হল শুধু জীবনের মূল্য নয়, জীবনকে যা শোভন করে, যা সুন্দর করে, যা ফুলের মত ফোটায়, প্রসন্ন করে বন্ধুর হাসির মত, সেই আদর্শ, ঔচিত্যবোধ, নিঃস্বার্থ নীরব আত্মনিয়োগের মূল্যও আজ আর কিছু নেই ! যুদ্ধে জীবন যায় তাতে এসে যায় না ; কারণ যুদ্ধ থামে কিন্তু জীবনযুদ্ধ কখনও থামে না। যুদ্ধে যা যায় তা জীবন নয়, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা।

পেটে বোমা মারলে যাদের 'ক' বেরোয় না, যুদ্ধের বোমা পড়তে আরম্ভ হওয়া মাত্রই তারা এগিয়ে এসেছে। 'লক্ষ্মী' স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন লক্ষ্মীছাড়াদের হাতে। টাকার অভাব মানুষকে কোথায় নামায় জানি ; কিন্তু টাকার প্রভাব মানুষকে কতদূর অমানুষ করে তাই দেখলাম যুদ্ধের সময়। Money is the root of all evils ; যুদ্ধের সুসময়ে কয়েক জন মাত্র মানুষই খুঁজে পেয়েছে সেই root ; আর তাই বাকী লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ হয়েছে up-rooted তাদের ভিটে থেকে ; বঞ্চিত হয়েছে মুখের 'গেরাস' থেকে ; নিজের ঘরের

চাল অপর বিচিত্র রসের চিত্রগুলিকে খুলে ধরেছে সিনেমা-পত্রিকা।
তাই যাদের কাছে লজ্জা আছে; ব্যাবসায়ে নেমেও ব্যাবসার ঘণ্টা-
কয়েক জনের কাছে [illegible] 'ন্যাকামী' করতে নয় অভ্যস্ত। দেহ দিয়ে তার
কাছে Money bitter-এর প্রতি তার কিছু শ্রদ্ধা থাকে অবশিষ্ট। কিন্তু
চোখের জলের চেয়েও বিস্বা[illegible] নয়, কেউ কেউ যেভাবে নিজেদের ছবি
চালের সঙ্গে কাঁকর মিশিয়ে [illegible] তাতে মনে হয় নির্লজ্জতাই বুঝি
পাকা-রাস্তায় এগুবার পেল সাহস; তরুণীদের সিনেমাবতরণের পর
শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে বিবেককে গলা[illegible] থাকাই ভালো।
স্থির-প্রতিজ্ঞ হল: জীবনে দুটি জিনিস ছাড়া [illegible] দিন এই ছবি দেখতে
না। একটি কামিনী; অপরটি কাঞ্চন। করছে উত্তম মধ্যম-

যুদ্ধ শেষ হবার আগে মার্কিনী সৈন্য এল এ[illegible] মূর্তির বদলে
দেশের মানুষের কাছে বিকিয়ে দিল নিজেদের, এ্যাংলো।
Doll-রা; মার্কিন সৈন্যরা ভারতীয়দের বোধ হয় মানুষ বলে গণ্য করতে
না,—তাই চোখের ওপরই সবাই দেখতে পেল ব্যালজ্যাকের Dro
Stories;—বই পড়বার আর হল না দরকার।

যাদের চোখের ওপর এই নির্লজ্জ পৈশাচিক লীলা পার্কে, ট্যাক্সীতে, প্রকাশ্য রাস্তায়, লেকের পাড়ে নিত্য-নৈমিত্তিকের ঘটনা হয়ে উঠল, তারা দশ থেকে আঠারো বছরের মধ্যে; তাদের চোখের ওপর যা ঘটল তা চোখের ওপর থেকে একদিন সরে গেলও বটে, কিন্তু মনের ওপর তারা কি দাগ রেখে গেল? যুদ্ধকালের এই বীভৎসতাই চিরকালের মত শিথিল করে দিয়ে গেল তরুণ চরিত্রকে, তাকে ভুলতে শেখাল নীতিবোধ, অশ্রদ্ধা করতে শেখাল সৎ-সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে।

যুদ্ধ থেমে গেল; সৈন্যরা ফিরে গেল; শুধু মুছে গেল না তরুণ-মন থেকে এই নারকীয় উল্লাসের নয়নলোভন ছবি। এই পথ দিয়েই সুযোগ বুঝে এল বোম্বাই-মার্কা ছায়া-ছবি। জার্মান সিলভার যেমন জার্মান নয়; বোম্বাই-আম মানেই বোম্বায়ের নয়; তেমনি বোম্বাই-

বিশ্ব-ভুবন-জোড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের যৌবনকে মার্কা ছবি
বিকৃত ; তারুণ্যকে দিয়েছে বিপথ-গমনের লজ্জা ; জীবের নামে উল্টো
জীবন-দেবতার ব্যঙ্গচিত্র। মার নামে পয়সা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যা ছিল বেকার যন্ত্রচনা' যেমন আসলে
স্বর্গ, আজ সেই রক হয়েছে যুদ্ধের-চাকরী-য'
চাওয়া ছোকরাদের নরক ; যুদ্ধের আগে দেখেছিল দশ থেকে আঠারো
রুচি ছিল সেখানে শুধু স্থূল : আজ সঙ্গে সঙ্গে সে ছবি হল অদৃশ্য।
বিগর্হিত বাসনার, অশোভন,ল-বৃদ্ধ। একেবারে জলজ্যান্ত না হ'ক
বখাটে ছিল, এই দ্বিতীয়ে এসে হাজির হল বোম্বাই-মার্কা ছবি।
বিশ্ব-বখাটে ! সে বস্তু। বরং বলা চলে আরো, তাকে বরণ করে

Curd-Seller প্রথম নববধূ বেশে তরুণীকে বরণ করে নেয় ছেলের
যে যুদ্ধের সংকে একবার শরীরে ঢুকতে দিলে যেমন তার হাত থেকে
মানুষের রেহাই নেই, বেগম পারার বেলাতেও তাই। একবার বরণ
ঠিক লে সম্বরণ করার আর সাধ্য কী ? এল বেগম, সুরাইয়া, নার্গিস।
যে কৌশলে বিশেষ বিশেষ কামিনীরা চিরকাল ভুলিয়েছে পুরুষকে
সেই পথ ধরেই, উজ্জ্বল, উদগ্র রূপ ধরেই এগিয়ে এল কামিনী
কৌশলরা। Hero-worship-এর যুগ পালটে গেল ; এল
Heroine-worship-এর হুজুগ !

পাপীকে ক্ষমা করতে বলেছেন প্রভু ; কিন্তু পাপকে নয়।
Sinner-কে ক্ষমা কর ; Sin-কে নয়। Sin-কেও যদি বা ক্ষমা
করা যায় ; ক্ষমার অযোগ্য হচ্ছে এই চটুল সিনেমা। সেই সিনেমা-
কেও যদি বা ছেড়ে দেওয়া যায়, যাকে কিছুতেই মাফ করা চলে না
তা হল যুদ্ধোত্তর কালের, হাল আমলের সিনেমা-পত্রিকা।

রকে বসে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গেই কেবল মাত্র যে ইয়ার্কি সম্ভব সেই
অসম্ভব উক্তি সিনেমার পর্দায় 'সংলাপ' বলে জাহির হল বুক ফুলিয়ে
যুদ্ধের পর। ঠিক তেমনি যে সব ছবি যৌবন-সম্মুখে তরুণেরা লুকিয়ে
দেখত একা, এখন অনেকের সামনে সেই ছবি, তারই কাছাকাছি

ভঙ্গিমার, বিচিত্র রসের চিত্রগুলিকে খুলে ধরেছে সিনেমা-পত্রিকা। পতিতাদের কিছু লজ্জা আছে ; ব্যাবসায়ে নেমেও ব্যাবসার ঘণ্টা-গুলো বাদে অন্য সময়ে 'ন্যাকামী' করতে নয় অভ্যস্ত। দেহ দিয়ে তার রোজগার ; তাই 'দেহ'-র প্রতি তার কিছু শ্রদ্ধা থাকে অবশিষ্ট। কিন্তু সিনেমার হিরোইন, সবাই নয়, কেউ কেউ যেভাবে নিজেদের ছবি তুলে ধরে সিনেমার কাগজের পাতায় তাতে মনে হয় নির্লজ্জতাই বুঝি নারীর ভূষণ। এই সব ভদ্র-সমাজের তরুণীদের সিনেমাবতরণের পর 'বসন' কী রকম হয়, সে কথা এখানে অনুক্ত থাকাই ভালো।

সিনেমায় আর সিনেমা পত্রিকায় দিনের পর দিন এই ছবি দেখতে দেখতে আজকের মেয়েরা ঠাকুর দর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করছে উত্তম মধ্যম-অধম 'কুমারদের' সন্দর্শনে। আজকের ছেলেরা দেবীমূর্তির বদলে ফিল্ম-হিরোইনের বাঁধানো ফটোতে করতে চাইছে প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

ইতিহাসের পাতায় মোগল বাদশাদের ঠিকুজী কুষ্ঠি মুখস্থ করতে হত যেমন একদিন নিজের বাপ-ঠাকুর্দার নাম ভুলে গিয়ে, আজ তেমনি সিনেমা-ষ্টারেরা কী দিয়ে রাঁধে, চুল বাঁধে কেমন করে, তারই খবর করছে এরা।

কিন্তু সবেরই মূলে সেই 'যুদ্ধ'। যেমন ক্ষয়রোগের মূলে ভাইটালিটির অভাব। এই যুদ্ধের সময়ে আজ তারা 'কেউকেটা' হয়ে উঠেছে যুদ্ধের আগে যারা ছিল 'কেউ নয়' এর দলে। যেমন এই যুদ্ধের আগে যারা ছিল 'বালা' তারা যুদ্ধের পর সিনেমার কল্যাণে সবাই আজ 'দেবী' !

এগার

এ কলকাতার কথা থাক ; এখন হোক সে কলকাতার কথা। যে-কলকাতার মুখ কালো ছিল না এত ; হৃদয় ছিল না এত হৃদয়হীন ; বড়লোকী বস্তুটা ছিল না যে-কলকাতায় এত দরিদ্র। সে-কলকাতায় আদর ছিল আতরের। বারো আনার সেন্টের উৎকট গন্ধ ছিল অনুপস্থিত ; কাগজের ফুলে সাজাতে হত না ড্রয়িং-রুম। সত্যিকারের ফুল কলকাতার সন্ধ্যেকে দিত সুন্দরের স্পর্শ : মাতাল-করা গন্ধে পাগল হত মন। ফুল সে দিন রমণীর অলকে হত রমণীয় ; ফুল সেদিন যেমন-তেমন খোঁপাকে করত আরেকটু বিউটিফুল। এ-কলকাতা যেমন কেরাণীর, সে কলকাতা তেমনি ছিল শুধু কাপ্তানের।

দেড় টাকা সিরিজের বই আজ বিদ্যাকে করেছে ব্যাবসা। দশ আনা দামের সিনেমার টিকিট সাহিত্যকে করেছে স দের অনধিকার চর্চা। যা সুদুর্লভ তাকে সুলভ করতে গিয়ে ব্যবসায়ী হয়েছে লাভবান ; কিন্তু রসিকের হয়েছে ক্ষতি ! Mass-এর জন্য নয় যে সব জিনিস, তাকে জোর করে ম্যাসের জন্যে করতে গিয়েই সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্প ম্যাসাকার হয়ে গেছে এ যুগে। জীবনে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বিভেদ নয় বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে বোধ হয় অধিকারী-অনধিকারীর বিভাগ মেনে নেওয়াই ভালো। জীবনের মুখ না চেয়ে জনতার মুখ চেয়ে সৃষ্টি করলে তা সৃষ্টি না হয়ে অনাসৃষ্টি হয় ; সাহিত্য না হয়ে হয় শ্লোগান ; গান যতক্ষণ ছিল দু'একটি তৈরী কানের জন্যেই মাত্র, ততক্ষণ তা ছিল গান। মেসিনের মাধ্যমে যেই সে বেরুল সকলের পেছনে ধাওয়া করে, সেই সে আর গান রইল না ; সেই মুহূর্ত থেকে সে হল মেসিনগান ; গ্রেস দিয়েও যে ব্যর্থতাকে আর সৃষ্টির জাতে তোলা গেল না কিছুতেই, তারই নাম দেওয়া হল প্রোগ্রেস।

প্রোগ্রেসের বাংলা করা হল প্রগতি। আর সেই প্রগতির, "অনেক দূর গতি, অনেক দুর্গতি তার।"

সেই সুখের কলকাতায় সখের পায়রা ওড়াতেন বাবুরা। রক্ষিতার কাছ থেকে পয়সা খরচ করে কিনে আনতেন অসুখ। পানপাত্র আর পতিতা ছিল বড়লোকীর অপরিহার্য দু'টি প্রয়োজন। বাঁদরের বিয়েতে খরচা হত লক্ষাধিক টাকা। কিংবদন্তীর সেই কলকাতায় ফিরঙ্গী বণিক এসেছে মস্ত আয়না বেচতে। খদ্দের না পেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, সওয়া লক্ষ টাকার সওদা করবার লোক নেই কলকাতায়, তাই সে ফিরে যাচ্ছে সহর ছেড়ে ধিক্কারে। ফিরঙ্গী বণিক জানত বিজ্ঞাপনের তীর লক্ষ্যভেদ করবেই; লক্ষ নয় লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন ছাতু বাবু লাটু বাবু। বুকে বাজল তাঁদের। কিনলেন সেই আয়না। খোয়া-বাঁধানো চৌরঙ্গীতে ডেলিভারী দিতে বললেন তাঁরা। ভোর ছ'টায় রাস্তার ওপর আয়নাকে শুইয়ে রেখে অপেক্ষা করছে ফিরঙ্গী বণিক; টাকা নেওয়া হয়ে গেছে তার। Received in good condition-এ সই পেলেই, এবার তার ছুটি। ভোর সাড়ে-ছটায় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ খোয়া-রাস্তায়। আয়নার কাছে এল গাড়ী। ঘোড়ারা মুখ দেখল সেই আয়নায়। কিন্তু ঘোড়াদের মালিকরা নয়। গাড়ী থামল না। লক্ষ টাকা দামের সেই আয়নার ওপর দিয়ে ছাতু বাবু লাটু বাবু গাড়ীকে দিলেন গড়িয়ে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া কাচের টুকরোর সামনে মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে সেই ফিরঙ্গী বণিক সেদিন কী ভেবেছিল তা দেখবার জন্যে দাঁড়ানো দরকার মনে করেন নি ছাতু বাবু লাটু বাবু। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বাড়ীর পথ ধরেছেন তাঁরা। আস্তে আস্তে যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই খোয়ার তরঙ্গের ওপর দিয়ে তীরের মত চলে গেছে তুরঙ্গ-শাবকেরা।

সেই কলকাতারই এই অন্ধকারের মত আলোর দিক ছিল এক নয়, অনেক। আলোর,—আলেয়ার নয়। বিদ্যুতের নয় রেডিয়

তেলের আলোয় সে কলকাতায় দেশের বর্ণপরিচয় করাতে বসেছেন বিদ্যাসাগর। কয়েদীকে হাত-কড়া পরাতে ব্যস্ত হননি ব্যারিষ্টর মাইকেল; মাতৃভাষাকে সংস্কারের বেড়ীমুক্ত করতে উন্মুখ হয়েছেন কবি শ্রীমধুসূদন। পায়ের তলায় পরাধীন দেশের মাটি, তারই বক্ষ-বিদীর্ণ করা মন্ত্র পড়েছেন সেদিন বঙ্কিম; বন্দে মাতরম্। ম্যাট্রিক পাশ করানো মাষ্টারী নয়; শিক্ষার পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছেন ভূদেব। তারও আগে রামমোহন আহ্বান করেছেন পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকদেরও এগিয়ে আসতে। সুপুরুষ নয় শুধু; পৌরুষের প্রতিমূর্তি বিবেকানন্দ বয়ে এনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী; যার রুটি রোজগারের নেই ক্ষমতা, তার কী অধিকার ভগবানকে ডাকবার? ডলারের দেশ অ্যামেরিকাকে ডলাই-মলাই করে ছেড়েছেন; বলেছেন: My sisters & brothers of America.···

শিবনাথ শাস্ত্রী এসেছেন শাস্ত্র নিয়ে নয়, কাজ নিয়ে। 'মরবার সময় নেই,'—এ-কথা শুধু মৌখিক বাহুল্যে নয় জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন শিবনাথ। যেদিন তিনি মারা গেলেন সেদিন সত্যি সত্যি মরবার সময় ছিল না তাঁর। তখনও অনেক কাজ বাকী। রামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় ডেকেছেন শিবনাথকে। শিবনাথ এলেন অনেক পরে। রামকৃষ্ণ অনুযোগ করলেন।

শিবনাথ বললেন: আপনার কাছে আসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আপনার ভক্তদের জন্যে আসা সম্ভব হয় না।

রামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেন: কেন?

শিবনাথ: আপনার ভক্তরা আপনাকে ইতোমধ্যেই 'ভগবান' বলে প্রচার করতে আরম্ভ করেছে তা জানেন?

রামকৃষ্ণ হেসে উঠলেন। সেই বরাভয় হাস্য। রামকৃষ্ণ যা বললেন, শিবনাথ তাঁর ইংরাজি পুস্তকে তা এইভাবে বর্ণনা করেছেন: Ramkrishna said; God dying of Cancer;···রামকৃষ্ণকে তাই বুঝি নি আমরা; ভগবান তাঁর কাছে কি ছিলেন, তা বোঝার সাধ্য কী আমাদের।

শ্রীরামপুরে বসেছে মুদ্রাযন্ত্র ; মুদ্রা-অর্জনের অভিপ্রায় নিয়ে নয় ; শিক্ষা-বিস্তারের আদর্শ নিয়ে। এক লক্ষের ওপর বই ছাপা, চল্লিশটির বেশি ভাষায়। আজ যাদবপুরে স্কুল অফ প্রিন্টিং টেকনলজির সামনে দিয়ে আসতে আসতে মনে পড়ছে সেই মানুষটির কথা, যাঁর নাম বর্তমান সরকারের দপ্তর-নায়করা শোনেনেই নি বোধ হয় কেউ। শুনলে স্কুল অফ প্রিন্টিং টেকনলজির নামের সঙ্গে যোগ হত পঞ্চানন কর্মকারের। বাংলার প্রথম হরফকার। শিবের জটা থেকে গঙ্গার মুক্তি নয় ; সাহেবদের একচেটিয়া সম্পত্তির প্রথম চাবিকাঠি দখল ; Press ছাড়া কিছুই express করা সম্ভব নয় একথা যাঁরা সেদিন বুঝে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নমস্কার।

মধ্যাহ্ন গগনের যে রৌদ্রদীপ্ত রুদ্র সূর্যের কিরণালোকে ঝলমল করে উঠেছিল পরাধীন বঙ্গভূমি, সেই স্বর্ণসূর্যের শেষ স্পর্শ লেগেছিল রবীন্দ্রনাথের বাণীতে ; শ্রীঅরবিন্দের স্তব্ধতায়, সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নে। কারাগারে বন্দী শ্রীঅরবিন্দ, সঙ্গে বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাসকর। ফাঁসীর দড়ি নিশ্চিত ঝুলছে ; জেলে সকলের হাত দেখছে একজন গণৎকার। শ্রীঅরবিন্দকে সে বলছে, অসম্ভব। পৃথিবীর কোন কারাগার তোমাকে ধরে রাখতে পারে এত বড় নয়। পৃথিবীর সম্রাট তুমি, সম্রাটের চেয়ে অনেক বড়, একটি মাথার মুকুটে নও সম্রাট, সকলের মাথার মুকুট তুমি, একটি সিংহাসন নয় তোমার জন্যে, দেশজোড়া তোমার আসন! স্মিত হাসি হেসেছেন শ্রীঅরবিন্দ। কুইন ভিক্টোরিয়ার ক্রোড়ে যাঁর জীবনারম্ভ, জীবনের মধ্যাহ্নে স্বদেশভূমিকে ক্রোড়চ্যুত করবার চেষ্টায় তিনিই আরেক দিন দাঁড়ালেন ভিক্টোরিয়ারই বংশোদ্ভব কুলাঙ্গারদের কাঠগড়ায়। সেই অরবিন্দকেই তো প্রণাম জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'

সেই সূর্য মিলিয়ে গেছে যখন, তখনও রেখে গেছে তার আশীর্বাদ। আকাশ তখনও রাঙা হয়ে আছে। এসেছে আরেক দল। তারা কারা? তারা? তারা তরুণ যাত্রীদল। তাদেরই কথা বলতে গিয়ে

রবীন্দ্রনাথ বলছেন : 'যে তরুণ যাত্রীদল বাহিরিল রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে।' স্বাধীনতার সেই রুদ্ধদ্বারে প্রথম যিনি করাঘাত করলেন তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। মুক্তিযুদ্ধের অগ্রদূত বাঙালী, কিন্তু তাঁর সেনাপতি অবাঙালী, গুজরাট-তনয়।

নূতন ভারতবর্ষের ভূমিকা রচনার ভার নিতে যাঁর ডাক পড়ল প্রথম, তিনি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তখনও তিনি দেশবন্ধু নন। দেশের লীডার নন; লীডার অফ দি বার। ব্যারিষ্টর সি. আর. দাশ।

সি. আর. দাশকে ডাকলেন গান্ধীজি। সি. আর. দাশের রোজগার তখন কুবেরের ঈর্ষাযোগ্য। তিনি বললেন : নিন যত টাকা প্রয়োজন, আমার কাছ থেকে নিন। সি. আর. দাশ ব্যারিষ্টর হলে কী হবে, সামান্য বাঙালী। মোহনদাস ব্যারিষ্টর হিসেবে তাঁর কাছে কিছুই না হলে কী হবে, ব্যবসা বুদ্ধিতে ঝানু বানিয়া। তিনি বললেন : চিত্তরঞ্জন, তোমার টাকা চাই না; তোমাকে চাই।

সি. আর. দাশ বিসর্জন দিলেন আইন ব্যাবসা। ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে দেশের কাজে। প্রতিজ্ঞা করলেন মামলা লড়বেন না আর, দেশের মুক্তিযুদ্ধে লড়বেন। এদিকে ভারত সরকারের পক্ষ নিয়ে একটি মামলা চালাবার জন্যে আগে থেকেই প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। চিঠি লিখলেন কর্তৃপক্ষকে—আমাকে অব্যাহতি দিন মামলা চালানোর হাত থেকে। আমি প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ : কাজেই মামলা আমি, আপনি ছুটি না দিলে, চালাতে বাধ্য। যদিও আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, দেশের কাজের জন্যে ত্যাগ করেছি আইন-ব্যবসা, তবুও সত্য-বদ্ধ আমি; তাই ওই মামলা আমাকে করতেই হবে : কারণ 'সত্য' দেশের চেয়েও বড়। তবে ঐ মামলায় আমার মন থাকবে না। কাজেই সত্য না রক্ষার অপরাধে আমি হব অপরাধী। তাই ছুটি চাইছি আপনার কাছে! যাঁর কাছে করেছিলেন আবেদন তিনি লিখে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে চিত্তরঞ্জনের মত এত বড়

'সত্যপ্রিয়' মানুষ বিরল। সে-যুগের সাহেবরা ছিল খাঁটি। এদেশীয়দের প্রতি শাসনকর্তার আসন থেকে নেমে এসে হাত বাড়াতেন; মানুষ যেমন বাড়ায় মানুষের উদ্দেশে।

সেই চিত্তরঞ্জন চিঠি লিখছেন সুরেন মল্লিককে; সঙ্গে হাজার টাকার চেক। চিত্তরঞ্জনের পিতার ঋণ ছিল মল্লিকদের কাছে। এত দিন জানতেন না তিনি। পুরানো ডায়েরীতে পাওয়া গেছে। এখন ঋণমুক্ত করবার জন্যে লিখেছেন চিঠিতে।

ঋষি শুধু সত্যযুগেই জন্মায় নি। দাশ হলেই হয় না ব্রাহ্মণেতর। এমন 'দাশে'র পায়ের তলায় সত্যিকারের ব্রাহ্মণ লুটোতে রাজি আছে দাসানুদাস হয়ে।

চিত্তরঞ্জন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারকক্ষে ব্যবহারজীবীরা আসবে, যাবে। বিচারপতি বদল হবে। ধারা বদলাবে বিচারের। বেঁচে রইবে শুধু চিত্তরঞ্জনের একটি উক্তি: "If love of Country is a Crime, then I am a Criminal."

এখন যে কলকাতায় প্রবেশ করব সে হল উনিশ শ' বিশের কলকাতা। বাংলা দেশের giant-রা তখনও যাই-যাই করেও যান নি। সূর্য অস্ত গেলেও আকাশে তখনও যে রঙের সমারোহ, তারই সঙ্গে তুলনা চলে সেদিনকার বাংলার।

সেই বাংলার প্রধান শহর কলকাতা তখনও ভারতবর্ষের শাসন-কর্তা। নতুন দিল্লী নয়; সেদিন Clive street ruled India. সেই কলকাতায় উনিশ শ' বিশ সালে দুর্গা নিয়ে এল নীলমণিকে এক দিন, তার দাদামশায়ের বাড়ীতে।

সেই ছেলেটি যে দুর্গার কলম ধার নিয়ে তবে দিয়েছিল নিজের পরীক্ষা; আর পরীক্ষার পর রাস্তায় নেমে দুর্গাকে নিজের পরিচয় দিয়েছিল শুধু এই বলে: আমার নাম নীলমণি; আপনার?—সেই নীলমণি দুর্গার সঙ্গে তার দাদামশায়ের লোয়ার সার্কুলার রোডের পর্ণকুটীরের সামনে এসে বিস্ময়ে থেমে গেল; বিস্ময়,—প্রাসাদতুল্য

অট্টালিকার নাম পর্ণকুটীর বলে নয়; বিস্ময়,—ওই দৈত্যকুলে দুর্গার আবির্ভাব হল কেমন করে, সেই কথা ভেবে।

সে কথা সত্যিই ভাববার এবং ভেবেও কোন জবাব না পাওয়ারই মত। অর্থের প্রাচুর্যে, ক্ষমতার স্পর্ধায়, আত্মবিশ্বাসের অহমিকায় 'পর্ণকুটীর' সেদিন ফেটে পড়তে চাইছে; বিদ্যা এ বংশকে দান করে নি বিনয়; দিয়েছে দম্ভ; অর্থ আনে নি বদান্য; এনেছে আরও অর্থের লালসায় মেশান অকারণ অপচয়ের আর অপব্যয়ের দুরন্ত নেশা; ক্ষমতাকে এঁরা ব্যবহার করেন নি দুর্বলকে রক্ষা করায়; ক্ষমতাকে এঁরা অস্ত্র করেছেন এঁদের অন্তহীন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষীণতম প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করবার কাজে। যাঁর অকৃপণ আশীর্বাদে মানুষ দেবতা হয়, সেই ভাগ্যের অবারণ অভিশাপে এঁরা হয়েছেন দানব। ভাগ্য-নিহত এঁরা সৌভাগ্য উদয়ের দিন থেকেই; কিন্তু তখনও দেওয়ালের লেখা পড়ে নি দৃষ্টিতে, তাই বাংলা দেশের স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এঁদের পায়ের তলায় টলমল করলেও এঁরা তখনও নিশ্চিন্ত। পুরুষকারের দম্ভ চিরকাল পুরুষকে করেছে মাতাল। তাদের রমণীকে করেছে ধ্বংসের অঙ্কুর। চিরকালই ভাগ্যের ছলনা পুরুষকে করেছে পাগল, রূপোর, আর রমণীকে রূপের জন্যে।

অবশ্য তার জন্যে পুরো দোষ দেওয়া যায় না দুর্গার দাদামশাই অম্বিকাচরণ সরকারকে। তাঁর কৈশোর থেকে যৌবনের দিন কেটেছে দুঃসহ দারিদ্র্যে। বিদ্যাসাগরের বিদ্যারম্ভ রাস্তার আলোয়; আজ ইতিহাস হয়ে গেছে; কারণ বিদ্যাসাগর রয়েছেন আজও পর্যন্ত সর্ব-প্রধান বাঙালী। অম্বিকাচরণের তা হয় নি। না হ'ক, তবু যে কথা সত্য তা' হল, বিদ্যার সাগরে তাঁরও ভাঙ্গা ভেলায় পাড়ি দেওয়া। এবং পারে উত্তীর্ণ হওয়াও প্রথম। কত বড়, আর কী ভীষণ দুর্যোগ, কত ঝাপটা আর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অপসারিত করে এগুতে হয়েছে অম্বিকা-চরণকে তার বর্ণনা সম্ভব; উপলব্ধি অসম্ভব।

এ দেশের শেষ শিক্ষা-পর্ব সমাপ্ত করে অম্বিকাচরণ হলেন

শ্রীরামপুর কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক। অঙ্কে শুধু পারদর্শী ছিলেন না তিনি ; তিনি ছিলেন 'প্রতিভা'। সেই কলেজেই এক দিন নিজের বসবার ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন তিনি। এমন সময়ে এসেছেন সেদিনকার শিক্ষা-বিভাগের ইংরেজ অধিকর্তা। প্রিন্সিপ্যালের খোঁজ করতে অম্বিকাচরণ জানিয়েছেন তিনি নেই।

সাহেব জিজ্ঞেস করেছেন : তুমি কে ? আমি এখানকার অঙ্কের অধ্যাপক, সরকার—অম্বিকাচরণের উত্তর। সাহেবের "My Lord, I have come here to meet you professor. Are you that wizard mathematician ?"—বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহেব।

ঝাঁটা ফেলে অম্বিকাচরণ দ্বিধার সঙ্গে ধরেছেন সেই হাত, বলেছেন "I am sorry to receive you like this, Sir." সাহেব আরও আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বলেছেন : "But I am not, professor, rather I have the proudest pair of hands to shake with."

সেই অধ্যাপক শ্রীরামপুর কলেজ ছেড়ে ওই সাহেব এবং এদেশের কয়েক জন বন্ধুর সাহায্যে বিলেতে পাড়ি জমালেন আরও ডিগ্রী-অর্জনের অভিপ্রায়ে। বিলেত যাবার দিন সকালে, দিদিকে জানাতে এলেন অম্বিকাচরণ, সেই সু-খবর। দিদি বললেন : কী ? ম্লেচ্ছর দেশে যাচ্ছিস, সেই খবর এলি বলতে ? এই বলে, হাতে ছিল পেতলের ঘটি, ছুঁড়ে মারলেন তাই। কেটে গেল কপাল। দাগী হয়ে গেল চিরকালের মত। কপালের সেই জায়গায় হাত বুলোলে এখনও যেন জ্বালা করে অম্বিকাচরণের।

কিন্তু তবুও বিলেত গেলেন অম্বিকাচরণ। গেলেন এগ্রিকালচারের একটা ডিগ্রী নিতে, সেটা পাওয়ায় ব্যারিষ্টরী পরীক্ষা দেবার জন্যেও হলেন ব্যগ্র। তাঁর অর্থ ছিল না, সামর্থ্য ছিল। শুধু স্কলারশিপের টাকার জন্যে পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে চললেন। যে পরীক্ষায় প্রথম

হলে পাওয়া যাবে অর্থকরী পুরস্কার সেই পরীক্ষাই দিলেন প্রয়োজন না থাকলেও। ইংল্যাণ্ডের শীত সহ্য হল না অম্বিকাচরণের। দুরন্ত বাতে কুঁকড়ে এল দীর্ঘ ঋজু দেহ, বিকল হল অঙ্গ। বাতের যন্ত্রণা ভুলতে মদ ধরলেন। রোপণ করলেন নিজের হাতে বিষবৃক্ষের চারা।

টলতে টলতে এসেছেন একদিন পরীক্ষাগৃহে। শুয়ে পড়েছেন দরজার মুখে! গার্ড তুলে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছে ভেতরে। পরীক্ষা দিয়ে বেরুবার সময়ে অম্বিকাচরণের খাতা দেখে পিঠ চাপড়েছে শিক্ষিত গার্ড, বলেছে, "You don't know what you have written, young man." কিন্তু ভুল বলেছিলেন সেই গার্ড, অম্বিকাচরণ জানতেন, তিনি কি লিখেছেন, তিনি জানতেন পরীক্ষা দিলেই প্রথম হতে হয়।

ব্যারিষ্টর হয়ে দেশে ফিরে, দূরে ফেলে দিলেন, এগ্রিকালচরের ডিগ্রী। আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলেন; কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন না। ছ'মাস বাদে আবেদন করলেন প্রভাবশালী এক ব্যক্তির দরবারে, মুনসেফীর জন্যে! আবেদন প্রত্যাখ্যান করে সেই বিরাট মানুষটি আশীর্বাদ করলেন। বললেনঃ আরও ছ'মাস দেখ। দেখতে হল না সেই ছ'মাস। সেই ছ'মাসের মধ্যে অম্বিকাচরণের ভাগ্যের চাকা গেল ঘুরে। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর বিবাদ না হয়ে মিলন হল তাঁর জীবনে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারকক্ষে ধ্বনিত হল সম্পূর্ণ নূতন এক কণ্ঠ। ধ্বনিত হয়েই প্রতিধ্বনিত হল দেশ জুড়ে আর একটি নাম, যুক্ত হল ব্যবহার-জীবীদের নামের সর্বশেষে নয় সর্বপ্রথমে, তলায় নয় ওপরে, অনেকের মধ্যে এক নয়, একের মধ্যে সেই অনেক ক্ষমতা নিয়ে এলেন অম্বিকাচরণ। এসেই আরম্ভ হল জয়, শুধু জয় নয়, বিজয়! বিজয় নয়, দিগ্বিজয়!

কলকাতা তখন স্বদেশী মামলার উত্তেজনায় অস্থির। কিন্তু যিনি এই মামলা লড়বার মোটামুটি প্রস্তুতি করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর

নাম আর আজ কেউ মনে রাখে নি। মনে রাখবার মত কাজও যে করেন নি অম্বিকাচরণ। দেশের ডাকের চেয়ে সেদিন তাঁর কাছে বড় হয়েছিল অর্থের লালসা। তাই মামলা যাঁরা তদারক করছিলেন বাইরে থেকে, তাঁরা যখন অর্থাভাবের কথা জানালেন, অম্বিকাচরণ অপারগ হলেন সেই মুহূর্ত থেকে। অম্বিকাচরণ রয়ে গেলেন তাই ধুরন্ধর ব্যবহারজীবী মাত্র। হতে পারলেন না দেশের নায়ক। সেদিন অর্থের জন্যে যে-সুযোগ তিনি হারালেন, সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে অম্বিকাচরণের নামের আরও একটি অর্থ হত হয়ত। বাংলা দেশ আর বাঙালী জাত তাঁকে মাথায় করে রাখত, অসাধারণ আইনজীবী বলে নয়, দশের একজন নয়, স্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জন বলে। কিন্তু দেশপ্রেম ছিল না সেদিনকার অম্বিকাচরণের ; থাকলেও, তার চেয়ে বেশি ছিল অর্থের প্রতি অনুরাগ !

• আলিপুর বমব্ কেসেরই একটি শাখা-মামলায় ফাঁসীর আসামী হয়েছেন কলকাতার শ্রেষ্ঠীকুলের একজনের একমাত্র ছেলে। বাঁচবার আশায় আসামীর পিতা শরণ নিয়েছেন অম্বিকাচরণের। আদালতে মামলা ওঠবার মুহূর্তে দেখা নেই অম্বিকাচরণের। অস্থির পদচারণায় আকুল পিতার প্রতিটি দণ্ড-পলকে মনে হয় অনন্তকাল। অবশেষে দৌড়ে আসেন অম্বিকাচরণের কাছে। অম্বিকাচরণ বলেন ঃ আমার টাকা ? ধনীশ্রেষ্ঠ বিস্মিত হয়ে বলেন ঃ সে কী ? দু'দিনের হাজার টাকা তো অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছি। অম্বিকাচরণ বলেন ঃ আপনি জানেন না। পাঁচশো নেই আর ; আমার'ফি'করে দিয়েছি, দাঁড়ালেই, হাজার টাকা।"

আবার হাজার এক টাকার চেক হাতে নিয়েই লাফিয়ে ওঠেন অম্বিকাচরণ। কী করব বলুন ? টাকা না পেলে আমি তাগদ পাই না যে ঃ চলুন এবার থুড়ে আসি পুলিশকে।

সত্যিই শুধু থুড়ে নয়, দুমড়ে-মুচড়ে-ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিলেন পুলিশের শিরদাঁড়া। পুলিশের প্রমাণ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ; পদদলিত করে হুঙ্কার দিলেন, ডেপুটি কমিশনারকে ঃ লায়ার ! একটি টুঁ শব্দ

করল না কোর্ট শুদ্ধু লোক। ইংরেজ বিচার-কর্তাও নয়। কারণ তিনি জানেন আইন অনেক ; কিন্তু আইনের ফাঁক একটিই ; আইন-জানা লোক আছে অনেক, আইনের ফাঁক—সে শুধু জানেন অম্বিকা-চরণ সরকার।

দিল্লী গেছেন অম্বিকাচরণ একটি মামলায় ; নতুন দিল্লী তৈরী হয়নি তখনও। পুরনো দিল্লীর প্রান্তে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করছেন অম্বিকাচরণের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা রুদ্রচরণ। প্রণাম করতে গেলেন অম্বিকাচরণ। পা সরিয়ে নিলেন তাঁর বাবা, অভিশাপ দিলেন। বিলাত-প্রত্যাগত পুত্রকে ধিক্কার দিয়ে বললেন : যত উঁচুতে উঠেছিস ততখানি নীচুতে নামতে হবে তোকে !

অম্বিকাচরণের ঠাকুর্দা তারাচরণ জন্ম-সাধক। তিনি তাঁর গ্রামের বহু কিম্বদন্তীর নায়ক। এমন কি ৺মা কালীর সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, এমন কথাও রটেছিল লোকের মুখে। রটেছিল আরো অনেক কথা। অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অলীক রোমাঞ্চকর ঘটনা। মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন নাকি তারাচরণ। নিজের স্ত্রীকে নাকি শেষ বার বাঁচান। তার পর ৺মা কালীর আদেশ হয় নাকি এ কাজ না করার জন্যে। দ্বিতীয় বার স্ত্রীর মৃত্যুর পরও তারাচরণকে আর প্রবৃত্ত করান যায় নি ও-কাজে। পুত্র রুদ্রচরণও সাধনার পথেই গেলেন জীবনের প্রারম্ভেই। কিম্বদন্তীর নায়ক না হলেও তিনিও য়ে উঠে-ছিলেন গাঁয়ের শেষ ভরসা।

অম্বিকাচরণ আরাধনার পথে গেলেন না, গেলেন অধ্যয়নের পথে। শাস্ত্রের অতীতকে না ধরে, আঁকড়ে ধরলেন শাস্ত্রকে। পণ্ডিত হলেন, ভগবৎ-প্রেমিক হতে পারলেন না। রস পেলেন না, শুষ্ক বিদ্যার অধিকারী হলেন। সংস্কৃত-চর্চার চূড়ান্ত করলেন। এমন কি বিবাহ-বাসরে পুরোহিতকে উঠিয়ে দিলেন ভুল সংস্কৃতোচ্চারণের কারণে। সেই অম্বিকাচরণ যখন অর্থ ও সামর্থ্যের যোগাযোগে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন তখনই বাপের অভিশাপ তাঁকে বিঁধল।

তিনি আত্মগোপন করে কাশীতে গিয়ে কুল-পুরোহিতকে ধরে যজ্ঞ করালেন। আরও অর্থ, কুবেরের ঐশ্বর্য কামনায় সে-যজ্ঞে আহুতি দিলেন তিনি। যজ্ঞে কোথাও ত্রুটি হয়ে থাকবে। কিংবা পিতার অভিশাপ অব্যর্থ হবে বলে সমস্ত জীবনটা দক্ষযজ্ঞের মত ভণ্ডুল হয়ে গেল অম্বিকাচরণের।

সেই করুণ ইতিবৃত্ত বিবৃত হচ্ছে পরে। তার আগের কথা বলি। ফুলে ফেঁপে উঠেছেন তখন অম্বিকাচরণ। পাদদেশ থেকে প্রফেশনের মধ্যমণি ব্যারিষ্টর অম্বিকাচরণ মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করেন না। নিয়তিকে নিয়তই উপহাস করেন। জীবনকে মনে করেন যন্ত্র। এবং নিজেকে মনে করেন যন্ত্রী।

এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম জমিদার বংশে। আরেক মেয়ের জন্যে পাত্র এনেছেন সাধারণ পরিবার থেকে। সাধারণ পরিবার,—কিন্তু অসাধারণ ছেলে। কৃষ্ণনগর ডিষ্ট্রীক্টের পয়লা নম্বর ছাত্র। হীরের টুকরো। অনন্তকুমার মিত্র। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ যুবক। মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিলেত পাঠালেন ব্যারিষ্টার হবার জন্যে। বিয়ে দেবার তিন মাসের মধ্যে মেয়ে মারা গেলেন। অনন্তকুমার তখন বিলেতে। মেয়ে মারা যাবার পরেও প্রবাসের ব্যয়ভার বহন করতে দ্বিধা করলেন না অম্বিকাচরণ। চালিয়ে গেলেন অনন্তকুমারের বিলেতে থাকা-খাওয়ার খরচা। বিবেকের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন তিনি ; সুখে-দুখে, বিপদে-সম্পদে অম্বিকাচরণকে ভুলবেন না কখনও।

ভুলতে দিলেনও না অম্বিকাচরণ। দেশে ফেরা মাত্র অনন্তকুমার শুনলেন তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন স্বামী যেন তাঁর স্ত্রীর পরের বোনকে পত্নী বলে গ্রহণ করেন। অনন্তকুমার দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করলেন ; মৃতা স্ত্রীর কথামতই স্ত্রীর পরের বোনকে করলেন বিবাহ।

ভেতরটা চিনতে ভুল করেন অম্বিকাচরণ, বাইরেটা নয়। কিন্তু

জামাই-র ক্ষেত্রে ভিতর-বাহির কোনটা চিনতেই ভুল করেন নি তিনি।
অনন্তকুমার তাঁর কাছে জামাতা হয়ে এলেন। কিন্তু হয়ে উঠলেন
ছেলের চেয়েও বেশি। নিজের ছেলের অভাব ছিল না তাঁর। অভাব
ছিল উপযুক্ত ছেলের। অনন্তকুমারকে নির্বাচন করেছিলেন তিনি
মেয়ের উপযুক্ত পাত্র বলে নয়, নিজের জীবনের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত
করতেই। আইন ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থের অধিকারী অম্বিকাচরণ
সমাজের জাতে ওঠবার জন্যে জমিদারী কিনেছেন। অভিজাত হয়েছেন
তিনি। কিন্তু তাঁর জীবনের ঐকান্তিক কামনা ছিল শুধু অভিজাত
হওয়া নয়, সমস্ত জাতের অভিভাবক হওয়ার। লীডার অফ দি বার
নয়, লীডার অফ দি নেশান: তাই শুধু আইন নয়; অন্য ব্যাবসা
বাণিজ্য, শিল্প মারফৎ ক্রমশঃ বিস্তার করতে চাইছিলেন নিজেকে
আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের প্রধান ব্যক্তিদের মানচিত্রে চাইছিলেন
আর একটি নাম যোগ করতে: অম্বিকাচরণ সরকার।

তাঁর অর্থ ছিল; সামর্থ্য ছিল না আর। অনন্তকুমারের সামর্থ্য
ছিল; ছিল না অর্থ। অম্বিকাচরণের সঙ্গে অনন্তকুমারের যোগ হল
সোনায় সোহাগা কিংবা মণি-কাঞ্চন যোগের মত অবস্থা নয়। এক
দিন ঘোড়ায় টানছিল গাড়ী। ঘোড়ার বদলে এল হর্স পাওয়ার
টর্চ রেডিই ছিল; প্রয়োজন পড়েছিল Ever[illegible]y battery-র
বারুদ ছিল স্তূপীকৃত; দরকার হয়েছিল দেশলাইয়ের।

দু'বার দারপরিগ্রহ করলেও জন্ম-মুহূর্তেই অনন্তকুমারের বিবাহ
হয়েছিল 'কর্মের' সঙ্গে। কাজ, কাজ, কাজ। মানুষ নয় মেসিন
একটু মুহূর্ত সময় নয় নষ্ট; অনন্ত অলস অবসরের মানস-সরোবরে নয়
কল্পনার ময়ূর-পঙ্খী ভাসানো। জীবন-রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা
—প্রণয় আর পরিণয় নয় নারীর সঙ্গে; পরিশ্রম আর অধ্যবসায় কর্মের
সঙ্গে সঙ্গে। রমণীয় নয়; অনমনীয়। রমণী নয়; রণ। স্তব করে
তুষ্ট করা নয়; বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হওয়া।

মাতৃগর্ভে সন্তানের স্বাভাবিক ভাবেই যত কাল থাকতে হয় তা

সময়ও অপেক্ষা করতে পারেন নি অনন্তকুমার। ভূমিষ্ঠ হয়েছেন আগেই। তাই অস্বাভাবিক যত্নে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। অমানুষিক পরিশ্রমের মর্যাদাও রাখলেন! দীর্ঘ; মজবুত, ইস্পাতের মত দুর্ভেদ্য বর্মে তৈরী হল দেহ। মন হল বিশ্বকর্মার কারখানা।

শুধু লেখা-পড়া নয়, খেলা-ধূলাও। ন্যাশনাল ক্লাবের সভ্য, জন্ম হয় নি তখন ১৯১১-র মোহনবাগানের, 'তাজহাট' টিমের হয় নি আবির্ভাব। ন্যাশনাল-এর ফুল ব্যাক তখন অনন্তকুমার। টেনিস খেলেন; ক্রিকেটও। বিত্তবান অম্বিকাচরণের কাছে যখন বুদ্ধিমান অনন্তকুমার এলেন, তখন অম্বিকাচরণ প্রবীণ; অনন্তকুমার যুবক; এক জন বিজ্ঞ, আরেক জন অনভিজ্ঞ; এক জন শ্রান্ত, আরেক জন অক্লান্ত। তাই যুগলযাত্রায় এল নতুন জোয়ার। সারা বাংলা দেশ ভেসে যাবার মত হল সেই জোয়ারে!

অনন্তকুমার ব্যারিষ্টরী করতে আরম্ভ করলেন। অর্থ পেলেন কিন্তু মান পেলেন না। শীর্ষস্থানে গেলেও লোকে বলবে, শ্বশুরের কৃপায় পার হয়েছেন ব্যারিষ্টরীর বৈতরণী। ছেড়ে দিলেন নিশ্চিন্ততার নির্ভরতার নিঃশঙ্কতার পথ। অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

উদ্বোধন করলেন বাঙালী পরিচালিত কাপড়ের মি[illegible]রে, প্রথম বাঙালী ব্যাঙ্কের দিলেন জন্ম।

বাঙালী শুধু ভাঙ্গতে জানে না; বাঙালী গড়তেও জানে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে আস্ফালনের আওয়াজ তোলে না শুধু, বৃহত্তর বঙ্গের দেখে স্বপ্ন। রামরাজ্যের, অবাঙালীদের রামরাজত্বের বিরুদ্ধে মনে মনে গজরায় না। কর্মে মূর্ত হয়ে ওঠে। আরামের রাজ্যে রমণীমোহন নয়, পরিশ্রমের স্বরাজ্যে রামমোহন হতে চায় সে।

অনন্তকুমার মিত্রের মত বাঙালী অন্ত করতে চায় বাঙালীর সেই অসহায় অবস্থার। অনন্ত সুযোগের স্বর্গ খুলে দিতে চায়। কর্ম-জীবনের আদিপর্বেই অনন্তকুমার অনাদি সম্ভাবনার স্বপ্নে আকুল হয়ে

ওঠেন। সেই অনন্তকুমারের প্রথম সন্তান হল দুর্গা। অনন্তকুমার পরিশ্রম করে গেছেন, দুর্গা তাঁর জীবনে নিয়ে এল পুরস্কার। ভাগ্যোদয় হল।

কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায়, কলকাতা থেকে গৌড়বঙ্গে বিস্তৃত হল অনন্তকুমারের পরিচয়। জীবিকারম্ভ হয়েছিল অম্বিকাচরণের জামাতা হিসেবে। সে-হিসেব নিজের হাতে চুকিয়ে দিয়ে নতুন খাতা খুলে বসেছিলেন অনন্তকুমার। জামাতা নয়, সব কিছুরই হর্তা-কর্তা। শ্বশুরের সমস্ত ব্যাপারেও, হ্যাঁ কি না, বলবার শেষ ক্ষমতা, অশেষ ক্ষমতা তাঁরই। অনেকগুলি ছেলে হয়ে পরিবার বড় হল। ভাইদের নিয়ে এসে লাগিয়ে দিলেন কাউকে কাজে, কাউকে লাগলেন পড়াতে। গাড়ী করলেন, শ্বশুরের বাড়ীতে থাকতে থাকতেই বাড়ীও করলেন নিজে। দক্ষিণ কলকাতায় সেই বাড়ীর মার্বেল-চুড়োর জনশ্রুতি অনেকেরই টাটাল চোখ ; জ্বালা ধরিয়ে দিল অনেকেরই বুকে। অনেকের সুখ-নিদ্রায় আনল ঈর্ষার ব্যাঘাত।

নীলমণিকে দুর্গা যখন নিয়ে এল তখনও দুর্গারা দাদামশায়ের বাড়ীতেই থাকে, তার বাবার নিজের বাড়ীর নির্মাণ-কার্য অসমাপ্ত তখনও। নীলমণি দুর্গার দাদামশায়ের বাড়ীতে ঢুকেই যা আবিষ্কার করল তা হচ্ছে সে-বাড়ী মানুষের নয়, বড়মানুষীর।

বিস্তীর্ণ লনের সবুজ-প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সামনে পাথরের বুদ্ধ-মূর্তি। ভক্তির মহিমায় নয়, ঐশ্বর্যের গরিমায়। ভৃত্য নেই, বেয়ারা আছে। পাত-পেড়ে খাওয়ার পাট এঁদের বাড়ীতে প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। তার পরিবর্তে ডিনার টেবলে মোগলাই খানা, ঠাকুরের বদলে আছে বাবুর্চি। মাতৃভাষায় নয়, ইংরেজীতে হয় বাক্যালাপ। গালাগালের বেলায় ডাক পড়ে হিন্দীর। স্লিপিং-স্যুট পরে শোওয়া, ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে ঘোরা। বাইরে বেরুনর জন্যে র‍্যাংকেনের বাড়ীর দর্জির দস্তখত চাই কাপড়ের ওপর। বাজাবার জন্যে পিয়ানো, বাজনা শোনবার জন্যে বিলাতি গানের

রেকর্ড। বাজার করবার জন্তে সরকার আছে, কর্ত্রীরা যান মার্কেটিংএ। কাঁসার গেলাসে কুঁজোর জল তৃষ্ণা করে না দূর; মদের পাত্রে পেগের মাত্রা তৃষ্ণা বাড়ায় মাত্র। বাড়ীর ছেলেরা পূজোর ছুটিতে বেড়াতে বেরয় না। ছুটির পর শিকারে যায়। বন্ত পশুকে বাগাতে না পেরে নিরীহ স্ত্রীলোকের পেছনে ধাওয়া করে। মৃগের বদলে মৃগনয়নারা ধরা পড়ে, সার্থক হয় মৃগয়া। গেটের দরজায় সারাক্ষণ মোতায়েন আছে দরোয়ান। গাড়ীতে করে গেলে কুর্ণিশ করে। পায়ে হেঁটে এলে কেউ, স্লিপ চায়।

সেই স্বর্ণলঙ্কায় দুর্গা যেন বন্দিনী মানবকন্যা। এই বড়লোকী আর বিলাস, অন্যায় আর অপচয়, মানুষকে অপমান করার ধিক্কারে কাঁদছিল নিরুপায় হয়ে একা। নীলমণি যেই এল তার জীবনে, দুর্গা তাকে শেষ আশ্রয়ের মত যেন সমস্ত জোর দিয়ে জড়িয়ে ধরল। দুর্গার সব ছিল, শূন্য ছিল সব। পূর্ণ হওয়ার প্রহরে এল নীলমণি। দুর্গা ভালবাসল তাকে।

বারো

নীলমণি ভালবাসল তুর্গাকে।

ভালবাসল কিন্তু 'লভে' পড়ল না। অনেক ইংরেজী কথা আছে যার বাংলা হয় না; বাংলা হলেও যেমন-তেমনই হয়: যুৎসই হয় না। 'মানের মত' একটা কিছু খাড়া করা যায় মাত্র; মনের মত হয় না কিছুতেই। ভালবাসা কথাটা তার ব্যতিক্রম। ভালবাসার কোন ইংরেজী হয় না। ভালবাসা আর 'লভ্'—এ তুই নয় কখনই এক। 'লভে' পড়া যায়; ভালবাসায় পড়া যায় না। 'ভালবাসা' হয়। লভ্ পোয়েমস বা লভ্ সংগ্সে 'I love you' কথাটা শুনিয়ে শুনিয়ে বিরক্তি না এনে দেওয়া পর্যন্ত তা ঐ বিশেষ শ্রেণীর রচনার জাতে উঠল না। আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা হল তাই যাতে 'প্রেম' কথাটাই রইল অনুক্ত। ওদের 'লভ' সুরু হয় যত্রতত্র; জমে ওঠে সরাইখানায়, সিনেমায়, থিয়েটারে, টুরে, পথেঘাটে কিন্তু ঘরে নয়। 'লভ'-এ পড়ে ওরা তা প্রদর্শন করতে না পারলে ধিক্কার দেয় নিজেদের। 'লভ'-এ পড়ে ওরা বারবার। লভ এ্যাট্ ফার্ষ্ট সাইট ওদের ফার্ষ্ট লভে-ও; লাষ্ট লভে-ও। কিংবা তা নয়; কারণ Lost Love কথাটা রয়েছে ওদের অভিধানে, কিন্তু লাষ্ট লভ বলে কিছু আছে কী? থাকবে কেমন করে? সত্যিকারের 'লভ' নেই-ই যে ওদের জীবনে; যা আছে তা শুধু Lust। কারণ ওদের জীবনের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাই হল; "Life is like a game of tennis, where 'LOVE' means nothing."

প্রেমে পড়ে রাজ্য-ত্যাগ করাকে ওরা মনে করে মহত্ত্ব। আমরা তাকে মনে করি দায়িত্ব অস্বীকার। তাই রামচন্দ্র স্ত্রীকে ভালবেসেও প্রজার দাবীকে করেন নি উপেক্ষা। সকল কালের সমস্ত সন্দেহের

উর্ধ্বে যে নারী তাঁর জীবনযাত্রাকে বনবাসে করেছে রমণীয়, দস্যু-অপহৃত হয়েও অশোককাননে কলুষস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করেছে অস্ত্রে নয় চরিত্রের বিচিত্র বর্মে ; বেদনার বিপুল গৌরবে ; দারিদ্র্যের অদম্য ঐশ্বর্যে ; সেই স্ত্রীকেও তিনি অগ্নি-পরীক্ষায় করেছেন আহ্বান। সমস্ত অন্তর দিয়ে যাকে জেনেছেন অপাপবিদ্ধা, সেই নিজের স্ত্রীকে লোকচক্ষুর সামনে অসম্মানজনক অনুষ্ঠানে চরম অপমানের সম্মুখে উপস্থিত করাতে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছেন নিজেই বারংবার। তবু ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের স্থান হয় নি রাজকর্তব্যের ওপরে। তাই সূর্য-চন্দ্রও যেদিন থাকবে না বাইরের আকাশে, সেদিনও মনের আকাশ জুড়ে রইবেন শ্রীরামচন্দ্র।

ইংরেজ-চরিত্রের অত্যন্ত মন্দ দিকটার তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়েছি আমরা যারা, তারা সহসা স্বীকার করে নিতে পারব না হয়ত ঐ কথা। তাই একজন ইংরেজের কথাতেই বলি যে, প্রেম পৃথিবীর গভীরতম অনুভূতির মধুরতম নাম। প্রেম। প্রেম, সরাইখানার সস্তা উন্মত্ততা নয় ; প্রেম নয় সিনেমা-হলের অন্ধকারে চটুল সুযোগের সদ্ব্যবহার মাত্র ; প্রেম নয় ক্যাবের নির্জনতায় গায়ে গা ঘেঁসে বসা ; প্রেম নয় ক্যাবারের বেলেল্লাপনায় বেসামাল হবার বাহাদুরী ; প্রেম ? প্রেম মানে নয় রুজ-লিপষ্টিক, চুলের কার্ল ; প্রেম মানে গোল্ড ফ্লেকের ধোঁয়াটে রিং নয়, গাবার্ডিনের গ্লামার নয় প্রেম। ডিনার টেবল কি ইভনিং স্যুট, এয়ার কণ্ডিশান্ড হোটেলের লাউঞ্জে, প্যান এ্যামেরিকানের ডানলপিলো আসনে, নেই প্রেমের পরিচয়। জীবনের চিরন্তন আবেগ হল প্রেম। প্রেমের চেয়ে গভীর, নির্জন নিরুপম নয় আর কিছু। সারাদিনের শ্রান্তির পর পুরুষের পাশে বসে নারীর ক্লান্তিহরণের মধুর শ্রম, সেই তো প্রেম। অত্যাসন্ন সন্তানসম্ভবার তীব্র মধুর যন্ত্রণায় অধীর সীমন্তিনীর শিয়রে পুরুষের বিনিদ্র রাত্রি জাগরণ, সেই তো প্রেম। মাঠ থেকে চাষ করে, মধ্যদিনের সূর্যের আগুনে ঝলসে যাওয়া শরীর নিয়ে অশিক্ষিত গাঁইয়া স্বামীর

জন্য গামছা আর তেল হাতে নিয়ে, ভাত বেড়ে রেখে, 'কোন এক গাঁয়ের বধূর মধুর প্রতীক্ষা,—সেই ত' প্রেম।

নীলমণি দুর্গার কাছে এসে দেখল দুর্গা ভাল ইংরেজী বলা ছাড়া আর প্রায় শেখেই নি কিছু। জেনেছে শুধু জানার মধ্যে যে বাংলা বই পড়ার কোন অর্থ হয় না। নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে মেশার হয় না মানে। জেনেছে পৃথিবীতে দু'দল মাত্র লোক। একদল বড় লোক; মুষ্টিমেয় কিন্তু ভাগ্যবান। তারা জন্মায় শুধু হুকুম করবার জন্যে। আরেক দল জন্ম-দরিদ্র। তারাই পৃথিবী জুড়ে। কিন্তু তারা অসহায়। হুকুম শুনে তামিল করা; 'জো হুকুম' বলে কুর্ণিশ করা—এই হল তাদের কাজ। তাই নীলমণি অবাক হয়ে দেখল যে, দুর্গার তিন তলার ঘরে হাত থেকে পেন্সিল মাটিতে পড়ে গেলে লেখা বন্ধ হয়; চাকর আসে এক তলা থেকে; পেন্সিল তুলে দিয়ে যায়; তবে সুরু হয় আবার লেখা। এ-বাড়ীর বেয়ারা তাই পঞ্চাশ-ষাট টাকা মাইনে পায়; পরতে পায় ভাল পোষাক; খেতে পায় আরো ভাল; টিপস্ পায় মাইনের চেয়ে বেশী; কিন্তু পায় না শুধু মানুষের মর্যাদা। কথায় কথায় জুতো সুদ্ধ পায়ের লাথি খেয়ে উঠে দাঁড়ায় হাসি মুখে, যেন কিছুই হয়নি; যেন এইটেই স্বাভাবিক কিম্বা লাথি খেয়ে যে লাথি মেরেছে তার লেগেছে কি না সেইটেই হয় তার মর্মান্তিক প্রশ্ন। এ বাড়ীর সর্বত্র সেই অলিখিত [illegible]ী: "অ[illegible] থাকলে করা যায় যে-কোন অনর্থ।"

নীলমণি অবাক হল কিন্তু দুঃখিত হল না; আহত হল কি[illegible] রাগ করল না; প্রশ্ন করল, কিন্তু প্রশ্নের জবাব না পেয়ে দোষী কর[illegible] না দুর্গাকে। কারণ দুর্গার দোষ নয়। জন্মে বড় হয়ে সে তো শু[illegible] এই-ই দেখে আসছে। নীলমণিও দেখল। শুধু বেয়ারা নয়, নিজে[illegible] ছেলেরও সামান্য ভুল হলে, চাবি লাগিয়ে তালা খুলতে একটু দে[illegible] হলে অম্বিকাচরণের স্বগতোক্তি শুনতে পায় সবাই: শালা। কো[illegible] জুনিয়র উকীল জবাব দিতে না পারলে কোন কথার, তক্ষু[illegible]

অম্বিকাচরণ যে ভাষায় তিরস্কার করেন তার উৎস অভিধান দূরে থাক অত্যন্ত ইতর শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও বিরল। অম্বিকাচরণের ধারণায় তাঁর মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আশ্চর্য মেধা না নিয়ে জন্মানোটাই যে-কারুর অপরাধ। এ-চিন্তা তাঁর মাথায় আসে না কিছুতেই যে, যে-সুযোগের মধ্যে না জন্মেও যে-সুযোগ তিনি সৃষ্টি করে নিতে পেরেছিলেন, আজকের নিপুণ (?) সমাজ-ব্যবস্থার ফলে অনেকের পক্ষে সে সুযোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করাও অসম্ভব।

নীলমণি তাই এই প্রভাব থেকে দুর্গাকে দূরে সরিয়ে নিতে চাইল। দুর্গাকে সে গড়তে চাইল নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নয় শুধু; তার সঙ্গে মিলিয়ে চরিত্রের ঐশ্বর্য। কুমোরে যেমন করে কাদা থেকে বানায় মূর্তি তেমন করে নয়; কুমোরের গড়া মাটির মূর্তিতে পুরোহিত যেমন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে; দান করে নবরূপ-লাবণ্য, তেমনি করে। দুর্গার মধ্যে নীলমণি পেয়েছিল সেই মন যে-মনে তখনও পাকা কোন ছোপ ধরে নি। দৈত্যকুলে তাই দুর্গাকে মনে হয়েছিল তার, দেবী।

দুর্গাকে নীলমণি বোঝাল যে অঙ্ক কষতে পারার অসামান্য শক্তি, কি ভালো আইন জানা, কিম্বা অসাধারণ স্মরণশক্তি সবই দুর্লভ বস্তু, কিন্তু মাত্র এই দিয়েই নয় মানুষের পরিচয়। যে কারণে মানুষ হিসেবে সাধারণের থেকেও অনেক ছোট অনেক অসাধারণ খ্যাতিমান লোক। সম্পূর্ণ মানুষ যে হবে তার দু'টো অঙ্ক, কম কষলে এসে যাবে না কিছু, কিন্তু ব্যবহারে, হৃদ্যতায়, রুচিতে, বিনয়ে, মানুষের জন্য বেদনায় তাকে হতে হবে অধীর; লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে কয়েক জনের জয়কে মনে করতে হবে সভ্যতার সমাজের এবং প্রগতির পরাজয়। কয়েক জনের জন্যে নয় মানুষের বাসভূমি এই বসুমতী। শুধু বীরভোগ্যা নয় সে। বীর যে সে তাকে একা ভোগ করে না; ভাগ করে দেয় সকলকে। বুঝতে হবে, বসুমতী নয় সর্বংসহা; তাই রাজা যায়, সাম্রাজ্য পাল্টায়, উদ্ধত মাথা মিশে যায়

মাটিতে, অখ্যাত অবজ্ঞাত সব চেয়ে পেছনের লোক আসে সব চেয়ে আগে। তার পর তারও পতন হয় একদিন ইতিহাসের অমোঘ বিধানে। শুধু থাকে যারা, তারা চিরকাল হাল ধরে, বীজ বোনে; শত শত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়া পরে, তারা কাজ করে। তারা সাধারণ লোক। তারা সবাই মিলে সম্পূর্ণ। যত অসাধারণই, হোক অসাধারণ লোক একা এ পৃথিবীতে কেবলই ব্যর্থ; কেবলই ধিক্‌কৃত; পৃথিবী দিগ্বিজয়ের পরেও সে পরাজিত।

নীলমণি এসেই দুর্গাকে তার বিমাতৃভাষা ইংরেজীর বৈকুণ্ঠ থেকে বিদায় দিল। নিয়ে এল মাতৃভাষার মর্তলোকে ফিরিয়ে। নিজের হাতে শেখাল সংস্কৃত। ব্যাকরণ নয়, কাব্য। পাণ্ডিত্য নয়; রস; বৈষ্ণব কবিতার কুঞ্জে গুনগুন করল ভ্রমরের মত দুর্গার কানে। রবীন্দ্রনাথে দিল দুর্গাকে প্রবেশপত্র।

দুর্গা ভেসে গেল নতুন জোয়ারে। অজানা খনির নূতন মণির হার পেয়ে গলে গেল সে। তার পর আরেক আঁধার-হয়ে-আসা বাদল দিনে এই পৃথিবীর নির্জনতম কোণে বসে নীলমণিকে সে গান শোনাল। তার বীণার মত কণ্ঠস্বরে দুর্গা গাইল। শুনল শুধু নীলমণি:

আজকে আষাঢ়, ভালোবাসার
কথা বলব কত? কথা যায় না বলা!
শোনায় কথা হৃদয়-নদী
কাণায় কাণায় শেষ অবধি
ভরা উজান বয় অতলা।
আজকে আষাঢ়, ভালোবাসার
আলো-আঁধার দিক না দোলা॥

নীলমণির আবির্ভাব দুর্গার জীবনে, দুর্গাদের বাড়ীতে তাকিয়ে দেখবার মত সময় ছিল না কারুর। সকলেরই লক্ষ্য নিজের দিকে। লক্ষ্য উপলক্ষ্য সবই নিজেরা। অন্নের জন্যে নেই চিন্তা। অন্যের

জন্যেও। অনন্তকুমার তাঁর নিজের বাড়ী সম্পূর্ণ করেছেন দক্ষিণ-কলকাতায়। আকাশআকাঙ্ক্ষী সেই চূড়া মার্বেলের। কিন্তু অনন্তকুমারের কল্পনার চূড়া,—সে আরও ঊর্ধ্বগামী। আলিপুরে আরেকখানা বাড়ী। রাঁচিতে আরও একখানা। সেখানার নাম মেয়ের নামে : দুর্গা কুটীর। সে-বাড়ীর ফুলের বাগান রাঁচীতে যারা ছুটিতে বেড়াতে যেত, তাদের প্রথম দ্রষ্টব্য।

অর্থের প্রতি আকর্ষণ ছিল অনন্তকুমারের, কিন্তু লোভ ছিল না। দান করে যারা ফকির হয়েছে তারা যেমন টাকাকে টাকা মনে করেনি কোন দিন, অনন্তকুমারও তেমনি অর্থকে আঁকড়ে ধরেননি যক্ষের মত। একখানা গাড়ীতে চলে যায় বলে তিনখানা গাড়ী। সাধারণ বাড়ীতেই চলে যায় বলে প্রাসাদ নির্মাণ। প্রথম শ্রেণীর রেল-কামরায় বেড়াতে যাওয়াকে যদি শ্বশুর অম্বিকাচরণের মনে হত অপব্যয় ; তাহলে রিজার্ভ করা সেলুন-কামরা না হলে জামাই অনন্তকুমারের মনে হত রেল-যাত্রা অচল।

প্রাসাদ তৈরী করতে গিয়ে তাই অনন্তকুমার ঋণগ্রস্ত হলেন কিন্তু বিপদগ্রস্ত হওয়া কাকে বলে জানতেন না অনন্তকুমার। অসাধারণ বিশ্বাস ছিল কর্মশক্তির ওপর। পরবর্তী জীবনে বার বার বলেছেন তিনি একথা যে, শ্বশুরের প্রতিভা কিম্বা সমসাময়িক শক্তিমানদের মত কোন গুণই ছিল না তাঁর ; তিনি ছিলেন মিডিওকার। মিডিওকার বলেই তিনি এগিয়েছেন আস্তে আস্তে। খেটে খেটে ; পথ কেটে কেটে ; জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন পরিশ্রমের বাজীতে জিতে ; প্রতিভার ভোজবাজীতে নয়। তাই তো হয়। খরগোস এবং কচ্ছপের দৌড়-পরীক্ষায় কচ্ছপই প্রথম হয় বার বার। কারণ ? অনলস এবং দৃঢ় যারা, তারাই লক্ষ্যে পৌঁছয় ; কোন কিছুর উপলক্ষ্যে হয় না আত্মবিস্মৃত।

যত দিন বড় হননি অনন্তকুমার তত দিন স্থির ছিলেন তিনি ; ছিলেন শক্ত ; কিন্তু সাফল্য তাঁকে থাকতে দিল না ধৈর্য ধরে ;

উচ্চাশা থাকতে দিল না দৃঢ় ; ধাপে ধাপে নয় লাফে লাফে এগুতে থাকলেন তিনি। কৃষ্ণনগরের অখ্যাত অবজ্ঞাত যুবক একদিন বৈরীশূন্য ছিল। জীবনের জয়যাত্রাপথে বিজয়লক্ষ্মীর মালা গলায় পরবার মুহূর্তে বন্ধুশূন্য হলেন অনন্তকুমার।

বন্ধুর ছদ্মবেশ নিয়ে যে-দুজন দেখা দিলেন, তাঁদের একজন রূপেন বাঁড়ুয্যে ; অপর জন সর্বরঞ্জন পোদ্দার। বাঙালী কোন দিন কোন বাঙালীকে একদানে দেয়নি বড় হতে। তিন বার অন্তত পেছন থেকে টেনে ধরবার করেছে চেষ্টা। অনন্তকুমারের বেলাতেও হল না তার ব্যতিক্রম। তাঁর ছিল তীব্র বাঙালী অনুরাগ। কাজেই বাঙালীরা মনে করল বাঙালী হয়ে যদি একজন বাঙালীর সর্বনাশ করতে না পারা গেল, তাহলে এত জাত থাকতে বাঙালী হয়ে জন্মানোই বৃথা !

সর্বনাশের সুড়ঙ্গ হতে লাগল খোঁড়া। কলকাঠি হাতে দেখা দিলেন সর্বরঞ্জন পোদ্দার। নিমিত্তকারণ হলেন রূপেন বাঁড়ুয্যে। কলকাঠি নাড়তে লাগলেন কিন্তু পেছন থেকে শক্তিমান ঘোষেরা।

অনন্তকুমারের ছিল কর্মশক্তি ; কুটিল বুদ্ধি ছিল না তাঁর। তিনি সম্মুখ-সমরের কৌশল জানতেন ; পেছন থেকে ছুরি বসানোর জানতেন না অপকৌশল। সুদর্শন চক্রের চেয়ে আজকে অদৃষ্টের চক্রান্ত যে বড়, তা আরেকবার প্রমাণিত হল অম্বিকাচরণ-অনন্তকুমারের ভাগ্য-বিপর্যয়ে।

প্রথম বাঙালী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেই মনে করেছিলেন কার্য সম্পূর্ণ হল বুঝি। প্রথম বাঙালী মিলের পত্তন করেই হাত দিয়েছিলেন অন্য কাজে। বিশ্বাস করেছিলেন রূপেন বাঁড়ুজ্যেকে ; বিশ্বাসের দামও দিতে হল তাঁকে। সর্বরঞ্জন এলেন মাথা নীচু করে। ছুঁচ হয়ে ঢুকলেন অম্বিকাচরণ-অনন্তকুমারদের কর্মজীবনে, ফাল হয়ে এক দিন বেরুবেন এই অভিপ্রায় সম্বল করে।

সর্বরঞ্জন পোদ্দার। বিপুল এক বিস্ময়। সম্পূর্ণ অপরিচিত, সহায়সম্বলহীন ; সেনেটের বারান্দায় রাত্রিতে আশ্রয় ; অনাহার-

অর্ধাহার প্রায় দিনেরই নিয়মিত প্রাপ্য। সেইখান থেকে সমাজের শীর্ষে আরেক দিন সর্বরঞ্জনকে শত্রুপক্ষ বলেছে বিশ্বাসঘাতক; বন্ধুরা বানিয়েছে কর্মপ্রাণ। সর্বরঞ্জন কিন্তু দু'য়ের কোনটিই নন। উপন্যাসের চেয়েও বিচিত্র তাঁর জীবন। রাস্তা থেকে বড় লোক হয়েছে এ-পৃথিবীতে অনেকেই। লোটা-ক' । সম্বল করে এসে শ্রেষ্ঠীকুলে উত্তীর্ণ হয়েছে এমন দৃষ্টান্তের নেই অভাব। সর্বরঞ্জন শ্রেষ্ঠী হন নি শুধু, সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছেন নিজের ক্ষেত্রে! যে সংবাদপত্র এক দিন নির্লজ্জ কটূক্তি করেছে সর্বরঞ্জনকে, সেই সংবাদপত্রকেই আরো এক দিন লিখতে হয়েছে, 'মাননীয় সর্বরঞ্জন পোদ্দার।' সেই সমাজকেই প্রত্যুত্তর দিয়েছেন সর্বরঞ্জন, তার যোগ্য প্রত্যুত্তর, যে সমাজ তাঁকে রাখতে চেয়েছিল অখ্যাতির, অবজ্ঞাতির অপরিচয়ের অতল অন্ধকারে। সর্বরঞ্জন পোদ্দারের জীবনের মূলমন্ত্র তাইঃ রাজনীতির খেলায় আর যাই থাক, নীতি বলে নেই কিছু। আর রাজা না হয়েও অধিকার করা যায় রাজ্য।

এই মূলমন্ত্র মূলধন করে সর্বরঞ্জন এলেন একদিন ভিখারীর মত অম্বিকাচরণের কাছে। গল্পকথা নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অম্বিকাচরণের পদসেবায় হলেননা কুণ্ঠিত। কেনই বা হবেন কুণ্ঠিত? আজ যাঁর পদসেবা করছেন, কাল সুযোগ পেলে তাঁর পা ধরে ফেলে দিতে কতক্ষণই বা লাগবে। দিলেনও তাই এক দিন। অম্বিকাচরণের বাড়ী যেখানে ছিল সেখানেই পরবর্তী জীবনে একদিন বাড়ী তুললেন তিনি। অম্বিকাচরণের বাড়ী ভেঙ্গে ফেলে তুললেন নিজের প্রাসাদ। নাম দিলেন তার: সর্বরঞ্জনী।

সহায়-সম্বলহীন সেদিন সর্বরঞ্জন যেদিন এলেন অম্বিকাচরণের দরজায়, অম্বিকাচরণ-অনন্তকুমার তখনও বাংলা দেশের অবিসম্বাদী 'ক্ষমতা'। সেদিনকার বাংলার রাজনৈতিক দৃশ্যের ছবি একটু

এখানে না তুলে ধরলে ঠিক বোঝা যাবে না অনন্তকুমার-অম্বিকা-চরণের সাফল্যের তলায় তলায় কেমন করে তৈরী হল সর্বনাশের সুড়ঙ্গ।

সে-ঘটনা শুধু নাটকীয় নয় অতিনাটকীয়; উপন্যাস নয়; বাস্তব। বাস্তব বলেই তাকে উপন্যাসের চেয়েও অবাস্তব মনে হয়। অম্বিকাচরণ-অনন্তকুমারদের সময়ে প্রফেশন্যল পলিটিশিয়ান ছিল না একজনও। ওঁরাও আসলে ছিলেন পেশা এবং ব্যবসা নিয়েই মজে। উদবৃত্ত সময়ে রাজনীতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে মজা পেতেন। বাংলা দেশ তখনও ওঁদেরই কথায় ওঠে-বসে। সেই সঙ্গে ভারত-রাজনীতিতেও তখনও পর্যন্ত অভ্যুদয় হয় নি জহরলাল-বল্লভভায়ের। মতিলাল নেহেরু লাজপত রায় এঁরাই সেদিনকার বৃহত্তর রাজনীতিতে বাংলা দেশের বাইরে উল্লেখযোগ্য নাম। মহাত্মাজীর আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু অবিসম্বাদী নেতৃত্বে হন নি তখনও অভিষিক্ত।

বাংলা দেশে বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হয়েও রণে ভঙ্গ দেয় নি। প্রলয়-কাণ্ড করবার মুহূর্তে ধরা পড়ে কয়েক জন গেছে ফাঁসীর দড়িতে; কয়েকজন দ্বীপান্তরে; কয়েকজন রয়ে গেছে কারাগারে। কয়েক-জন মাত্র যারা আছে বাইরে তারা খণ্ডপ্রলয় ঘটাবার জন্যে তখনও উদ্গ্রীব। বাংলা দেশের বাইরে সৈন্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত করবার কাজে সন্ত্রাসবাদ তখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে! সুরেন্দ্রনাথ লিবারল। নিন্দার জয়মাল্য তখনও গলায় উঠেনি তাঁর। তার কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য জুতার মালা জুটল মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের জন্য। তাঁর সম্বন্ধে লেখা হল :

না লুকাতে রক্তচিহ্ন, না শুকাতে নয়নের পাণি।
প্রবীণ স্বদেশভক্ত যেচে গিয়ে হলে অগ্রদানী।

সুরেন্দ্রনাথকে সেদিন যারা জুতো ছুঁড়েছিল, তাদের কথা ভাবি। নরমপন্থী হবার জন্যেই তাঁর উঁচু মাথা অবনত হল। কিন্তু আজ

যারা নরম নয় শুধু, পরম দাসত্বের মনোভাব নিয়ে দীর্ঘ ষাট বছরের সংগ্রামকে বাতিল করে দেশভাগের বিনিময়ে পেল দেশ শাসনের অগৌরব, তাদের উদ্দেশ্যেই সুরেন্দ্রনাথকে নিক্ষিপ্ত জুতা দ্বিগুণ ভারী হয়ে ফিরে আসছে কি না, কে বলবে!

মনে পড়ে যায়, কাজীর বিচারের গল্প। অতি সাধারণ দুই মেয়েছেলের মধ্যে ঝগড়া ঃ ছেলে কার নিয়ে। একটি মাত্র সন্তানকে জন্ম দেওয়ার দাবীদার কিন্তু দু'জন। কাজী কেটে ভাগ করে নিতে বললেন ছেলেকে। কৌশল কাজ দিল; গর্ভধারিণী যে মা, সে বলল, না, কেটে কাজ নেই, দিয়ে দাও অপর জনকে; ছেলে বেঁচে থাক। কাজী নয় শুধু সবাই বুঝল ছেলে কার।

সেই সামান্য স্ত্রীলোকের যে হৃদয়বৃত্তি, ভাবি, দেশের ভাগ্য নিয়ে যাঁরা আজ পাশা খেলছেন, তাঁদের মনের কোণে কোথাও কি ততটুকুও নেই সেন্টিমেণ্ট? যদি থাকত, তাহলে হত কি দেশ ভাগ? সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে নারী-পুরুষ কি হত উদ্বাস্তু? মহাত্মাজীর জন্মভূমিতে দুরাত্মারা কি সৃষ্টি করতে পারত রিফিউজী?

আগে বলেছি অম্বিকাচরণ-অনন্তকুমারদের কালে পেশাদার রাজনীতির ছিল না অস্তিত্ব। ঠিক। কিন্তু অনন্তকুমারের কর্ম-জীবনের পেছনে ছিল স্বপ্ন। সে স্বপ্ন: বাংলা দেশ এবং বাঙালী জাতি। নিজে না দাঁড়ালে অন্যকে দাঁড় করানো যায় না, তাই ব্যাবসার বিস্তৃতক্ষেত্রে নেতৃত্বের আত্মবিশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন এগিয়ে। যে-সব কাজে নেই বাঙালী, যে-সব জায়গায় নেই তার পাত্তা, সেই সব কাজ, সেই সব জায়গায় তিনি দেখতে চেয়েছিলেন বাঙলা দেশকে আর বাঙালী জাতিকে। এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধে বাঙালীকে পাঠিয়েছিলেন তিনি সৈনিক করে। তাতে ইংরেজদের দালাল এই আখ্যায় ভূষিত করেছে তাঁর স্বদেশ এবং স্বজাতের লোকেরা; যারা বোঝে নি যুদ্ধ-বিদ্যা নয়, ডিসিপ্লিন

ছিল বাঙালী চরিত্রে অনুপস্থিত। মিলিটারী ট্রেনিং মানুষকে অমানুষ করে হয়ত কখনও কিন্তু এলোমেলো হতে শিক্ষা দেয় না কখনই।

তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রথম বাঙালী ব্যাঙ্ককে ডোবাবার আনন্দে সেদিন যারা বেসামাল হয়েছিল তাই তাদের কারুর মাথায় ঢোকেনি যে, কাকে তারা আসলে ডোবাচ্ছে; অনন্তকুমারকে নয়। নিক্ষেপ করছে বাঙলা দেশকেই অনন্তকালের জন্যে চরম অপদার্থতার অমোচনীয় কলঙ্কের কূপে।

অনন্তকুমারের রাজনীতি ছিল তাঁর এই স্বপ্নকে রূপ দেবার বাস্তব হাতিয়ার মাত্র। কিন্তু রাজনীতির গোলক-ধাঁধায় ঢোকবার সময়ে তিনি ঢুকেছিলেন প্রতিষ্ঠার জোরে প্রবেশ-পত্র আদায় করে; সেই গোলক-ধাঁধায় ঢোকবার রাস্তা পেয়েছিলেন, বেরুবার পথ পাননি খুঁজে। পলিটিক্সের প্রথম কথা যে প্যাঁচ তাতেই অসম্ভব অবিশ্বাস ছিল তাঁর। কর্মশক্তি-সম্বল অনন্তকুমার তাই হেরে গেলেন। অপকর্মের কুশলীরা যেদিন তাঁকে আর দরকার মনে করল না, সেদিন সরিয়ে দিল, রঙ্গমঞ্চ থেকে। শুধু সরিয়ে দিয়ে হল না শান্ত। আর কোন দিন যেন উঠে দাঁড়াতে না পারেন সে-জন্য ঘা দিল তাঁর সুনামে। 'কী দোষ',—জানবার আগেই অনন্তকুমারের অপরাধের চূড়ান্ত বিচার করে রায় দিল দেশের লোক : প্রতারক।

প্রতারণা করলে অনন্তকুমারের যা কখনও হত না, প্রতারণা করতে না পারার জন্যে অনন্তকুমারের তাই হল : পতন। ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হল কর্মজীবন। আজ ব্যাঙ্ক ফেল করলেও ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, পুরস্কৃত হন। নতুন নামে পুরানো ব্যাবসা চালিয়ে যেতে বাধা পান না কোথাও। গাড়ী এবং বাড়ী বেনামী করে স্বচ্ছন্দে চলে জীবনযাত্রা। অনন্ত-কুমারের সময়ে তা ছিল না। তাই ব্যাঙ্কের মামলায় বিচারকের

এ-উক্তি আজ আর কেউ মনে রাখেনি: "Not a pie has entered his pocket." শুধু মনে রেখেছে, অম্বিকাচরণ আর অনন্তকুমারের বড্ড বাড় হয়েছিল, এখন বেশ হয়েছে। এমন কি যাদের অল্পবিস্তর টাকাও গিয়েছিল ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তারাও টাকার শোক ভুলতে পেরেছিল শুধু মাত্র অম্বিকাচরণ-অনন্তকুমারের পতনের আনন্দে। আশ্চর্য এই বাঙালীর চরিত্র। দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ।

কিন্তু অপরাধ না হলেও অম্বিকাচরণের চরিত্রে খামতি হয়েছিল কোথাও নিশ্চয়ই। হয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত ছিল তাঁর; নয় রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়ালে বিসর্জন দেওয়া উচিত ছিল নীতি। কারণ যে বিষয়ের যে মন্ত্র সে-বিষয়ের সে-মন্ত্র না জানলে দেওয়া যায় না বিবাহ; হওয়া যায় না পুরোহিত। আর, রাজনীতিতে মন্ত্র নেই; আছে মন্ত্রণা। তাই পরের পুরো অহিত,—এরই ওপর নির্ভর করে রাজনীতির পাণ্ডাদের অন্ন-বস্ত্র; ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা।

বাঙলা দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রইবে যাঁদের নাম; প্রাতঃস্মরণীয় রইবেন যাঁরা চন্দ্র-সূর্যের উদয় যত কাল; তাঁরাও রাজনীতির পঙ্কিলতায় নেমে বিরোধী পক্ষকে নিষ্কণ্টক করবার কাজে এমন কোন নীচতা নেই যার নেননি আশ্রয়; এমন কোন অন্যায় নেই যাকে করেছেন পরিহার; এমন কোন নীতি নেই যা চলেছেন মেনে। অর্থ, সামর্থ্য, মদ্য এবং স্ত্রীলোক-নিয়োগ, কাজ হাঁসিলের জন্যে; সেই সঙ্গে বিরোধী পক্ষের সদস্যকে তারই ঘরে নজরবন্দী করে রাখার ইতিহাস নয় বিরল। ভারতীয় রাজনীতিতে যাঁরা মহত্তম ব্যক্তিত্ব, তাঁরাও পেছপাও হননি কূটচক্রের আড়ালে নিজের দলের বাইরের লোককে শেষ পর্যন্ত দেশের বাইরে ঠেলে দিতে। বারংবার বাঙালীর উত্থানকে দাবাবার সেই তো কংগ্রেসের ইতিহাসে লজ্জাকর অধ্যায়। শুধু তাই কেন? সন্ত্রাসবাদীদের সন্ধান নেই স্বাধীন ভারতে। কিন্তু আজ যাদের ভারত এবং বাংলার মসনদে

মাননীয় অধিষ্ঠান, তারা কি একবারও মনে করে যে এই প্রাপ্যে ভাগ আছে সেই সব 'ফেরারী ফৌজদের'? মনে করবে কেন? গদি অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই যে গদা-ব্যবহার তাহলে অসম্ভব হয়। এ-রাজনীতি আজকের ভারতেরই নয়। মহাভারতের রাজনীতিও তো এই কথা বলে। ধর্মযুদ্ধ! ধর্মযুদ্ধ! বলে যারা চীৎকার করে গেল আগাগোড়া সেই পাণ্ডবেরা কি বাকী রাখল কোনও অধর্ম করতে।

নীতি বিসর্জন দিতে না পারার সঙ্গে আরও যে অন্যায় অনন্তকুমার করেছিলেন তা অমার্জনীয় অপরাধ। পাবলিকের টাকা নিয়ে করেছিলেন ব্যাঙ্ক। সে-টাকা লোকে দিয়েছিল অম্বিকাচরণের নাম শুনে আর অনন্তকুমারকে দেখে। কিন্তু অনন্তকুমার রাজনীতির খেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে অন্যায় রকম বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে। তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হল তাঁকে নিজের কেরিয়ারের বিনিময়ে। অর্থ আত্মসাৎ করা অপরাধ; জনসাধারণের অর্থ নিয়ে অপরকে বিশ্বাস করে তা নষ্ট হতে দেওয়াও অপরাধ। এই দ্বিতীয় অপরাধ অনন্তকুমারের নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু তার জন্যে প্রথম অপরাধ না করেও তাকে অস্বীকার করবার থাকে নি ক্ষমতা। অনন্তকুমার অবশ্য সেদিনকার না হয়ে আজকের Public Man হলে, এতে তাঁর পসার-প্রতিপত্তি বাড়তই; কমত না। কারণ Public Fund মারাই আজকের Public Leader হবার সহজ রাস্তা; কারণ অনেকে মিলে fund মারলে refundএর প্রশ্ন ওঠে না। অনেকে মিলে একজনকে মারলে মার্ডার হয় না; হয় জেহাদ। আর একজনে অনেককে মারলে তবেই আজকের দিনে মহাপুরুষ হতে পারা সম্ভব।

অম্বিকাচরণ এবং অনন্তকুমার যখন প্রথম প্রবেশ করলেন রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তখন বাধা পেলেন অল্পই; সংঘর্ষ হল স্বল্প। প্রবেশ করেই পাণ্ডা হয়ে বসতে সময় লাগল না একটুও। কিন্তু

গোলমাল বাধল কলকাতায় স্পেশাল কংগ্রেসে। মধ্যপন্থীদের বিদায় নিতে হল কংগ্রেস থেকে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সব দায়িত্বভারের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী নেতৃত্ব করতলগত হল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর।

মধ্যপন্থীরা বিদায় নিলেন কংগ্রেস থেকে, কিন্তু রাজনীতি থেকে নয়। তাঁরা উগ্র কংগ্রেসবিরোধী হয়ে উঠলেন। বাঙলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা গেলেন অনন্তকুমারের কাছে। তাঁরা জানতেন অম্বিকাচরণ কিছু নন। অনন্তকুমারই সব। হিসেবে ভুল হয় নি এখানে। কিন্তু অনন্তকুমার বললেন: না। অম্বিকা-চরণকে ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অনন্তকুমারের সব কিছুর মূলে যিনি, তাঁকে নির্মূল করে চান না তিনি বড় হতে। ফিরে এলেন প্রতিনিধি-ব্যক্তিরা। হিসেবে কোথায় ভুল হয়েছিল চিনতে অনন্তকুমারকে। ফিরে এলেন। কিন্তু বসে রইলেন না চুপ করে। আগে চিন্তা ছিল শুধু অম্বিকাচরণের। বাধা ছিল অনন্তকুমার। এখন দু'জনকেই কি ভাবে পাঁকে ফেলা যায় চলতে লাগল তারই পঙ্কিল আলোচনা। অনন্তকুমার বীর্যবান পুরুষ ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিমান ছিলেন কী? নিজের বিপদ জেনেও তাহলে কেন তিনি অম্বিকাচরণকে করলেন না ত্যাগ? এক দিন কবে অম্বিকাচরণ বিদেশে জুটিয়ে-ছিলেন তাঁর আহার আর আশ্রয়, তার জন্যে এত দিন বাদেও তিনি ভুলতে পারলেন না সে-কথা। কৃতজ্ঞতা তাঁর অ্যাম্বিশনের টুঁটি রইল টিপে; তিনি অম্বিকাচরণের কাছে যতটুকু পাবার তা গিয়েছিলেন পুরো-ই পেয়ে; এখন অনায়াসে দু'হাত ভরে পেতে পারতেন, যাদের প্রত্যাখ্যান করলেন তাদের কাছ থেকেই! অনন্তকুমার সেন্টিমেন্টাল; অনন্তকুমার নির্বোধ; অনন্তকুমারের কাছে কার্যোদ্ধারের চেয়ে কৃতজ্ঞতা বড়! হায়রে অনন্তকুমার!

চতুর হলে যাকে চতুর্মুখে প্রশংসা করতে পারতাম সেই এ-যুগের মানুষ আমরা,—আমাদের কাছে যে-কোন কৌশলে যে জেতে তারই জয়-জয়কার। ডুয়েলের দিন গেছে; এখন ডিপ্লমেসীর

দিন। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ না করেই তাকে হারিয়ে দেওয়া ; তাকেই বলে রণ-কৌশল। তারই স্মৃতিকথা ; তারই জীবনীগ্রন্থ ; তারই ইতিহাস।

কংগ্রেস টিঁকেছে ; তাই কংগ্রেসই যে এনেছে দেশের স্বাধীনতা সে-ইতিহাস সত্য না হলেও সে ইতিহাস সৃষ্টি করবে কংগ্রেসই। Ends এর মত means-ও মহৎ হওয়া চাই, এ-কথা বলেছিল কংগ্রেস। তার পর সে এ-কথা রাখে নি। তার means কোন দিনই মহৎ ছিল না ; তার End বৃহৎ হয়েছে, কিন্তু মহৎ হয়েছে কী ? ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরের অধ্যায় যেমন ঘটেছিল তেমন লেখা হলে তা মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসের চেয়ে কম হবে না কলঙ্কের কালিমায়। তবুও কংগ্রেসই বেঁচে আছে ; কারণ তার কাজ আর কথা এক হয় নি। কাজ আর কথা এক করতে গিয়ে এক দলকে প্রাণ দিতে হয়েছে ফাঁসীর দড়িতে ; তারা পায় নি তাদের প্রাপ্য। আরেক জনকে পালাতে হয়েছে দেশ ছেড়ে। তিনিও এ-ইতিহাসে কতটুকু জায়গা পাবেন তাও জানে ওই কংগ্রেসের কর্মকর্তারাই !—আর কেউ নয়।

অনন্তকুমার বাংলা কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করে ক্ষান্ত হলেন না। নির্বাচনে দাঁড়ালেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। জিতলেনও। অম্বিকাচরণ যোগদান করলেন সরকার পক্ষে। বিরোধ বিপুল হয়ে দেখা দিল অ্যাসেম্বলীতে।

ঘোষেরা তীব্র, তীক্ষ্ণ শ্লেষে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন অনন্তকুমারদের। অনন্তকুমারকে অপমান করবার জন্য তাঁর মার্বেল-চূড়ার বাড়ীকে কটাক্ষ করে বলল অশ্বিনী ঘোষ :

"Thère comes no. 9 Elfin Road !—beware of your Pockets gentlemen !"

অ্যাসেম্বলী-চেয়ার থেকে গরজে উঠলেন অনন্তকুমার : "I will hound the Ghosh's out of Bengal" থম-থম করতে লাগল অ্যাসেম্বলী হল।

কর্মব্যস্ত অনন্তকুমার। দুর্গার জীবনে নীলমণির নিঃশব্দ পদসঞ্চার লক্ষ্য করল না কেউ। অনন্তকুমারের লক্ষ্য করবার সময়ই ছিল না। দেখলেন দুর্গার মা। ভয় পেলেন কিন্তু অখুশী হলেন না। এ-বাড়ীতে সবাই মেসিন ; মানুষ নয় কেউ। সংসার বলতে বোঝে, টাকা রোজগার করে এনে দেওয়া। সারা দিন আসল মানুষ বাইরে। তাই ঘরে শুধু হৈ-চৈ ; অকারণ অবারণ বিশৃঙ্খলতা। সেই আবহাওয়া থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি দুর্গাকে। তাঁর চাওয়া অসার্থক হয় নি। নীলমণিকে কাছে পেয়ে দুর্গা বেঁচে গিয়েছিল দুর্গতির হাত থেকে।

কিন্তু খুশী হলেও ভরসা পেলেন না দুর্গার মা। ভয় পেলেন। দুর্গার সঙ্গে নীলমণির দু'হাত এক করে দেওয়া তাঁর একার পক্ষে অসম্ভব। দুর্গার সঙ্গে নীলমণির মনের মিল হতে পারে ; হতে পারে ঠিকুজি-কুষ্ঠির মিল ; কিন্তু দম্পতীর মিলন অসম্ভব। কারণ, নীলমণির ঘর সাধারণ ; সম্বল সামান্য ; বংশের পরিচয় শ্রেষ্ঠীকুলের তালিকায় নয়। দুর্গার সঙ্গে যারই বিয়ে হ'ক ; আসলে তার বিবাহ হবে অর্থের সঙ্গে ; প্রতিপত্তির সঙ্গে ; বংশ-পরিচয়ের সঙ্গে। তবুও বাধা দিলেন না তিনি নীলমণির আসা-যাওয়ায়। কারণ, নিজের মেয়েকে তিনি জানতেন ; এমন কিছু করা দুর্গার পক্ষে অসম্ভব যাতে তার মা'র মাথা হতে পারে নীচু। কাউকে ভালবেসেও তার জন্যে দুর্গা নিজের কুলকে করবে না কালো।

দুর্গা নয়, নীলমণিই আশ্চর্য করল।

তের

নীলমণি আশ্চর্য করল, আশ্চর্য না করেই ! প্রথম ভালবাসার ফেনিল উচ্ছ্বাসের দিনেও নীলমণি বলল না ; বলতে পারল না কিছুতেই সেই অসহ্য, অথচ অপরিহার্য ন্যাকামীর নামান্তর ক'টা কথা : 'তুমি কী সুন্দর !' বর্ষার নির্জন অন্ধকারে নীলমণির মুখে এল না :

সমাজ-সংসার মিছে সব
মিছে এ-জীবনের কলরব···

তার কাছে প্রেম জীবনের প্রয়োজনেই মূল্যবান। সে-প্রেম ঘর-ছাড়া করে না। পথের লোককে ঘর বাঁধতে বলে; সমাজ-সংসারকে সে অস্বীকার করে না ; প্রেমে পড়ে নীলমণি পাগল হয় না। প্রেমে পড়ে স্বাভাবিক হয় ; সুন্দর হয় ; শোভন হয়। বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে না ; ঘুম এবং ঘুম-ভাঙা দুই-ই হয় রমণীয়।

প্রেম শুধু প্রেমিক বা প্রেমিকাকে ভালবাসতে শেখায় না ; প্রেম পৃথিবীর সব কিছুকে ভাল লাগায়। প্রেম জীবনকে ঐশ্বর্য দেয় না শুধু ; বাঁচার অর্থ করে আবিষ্কার। প্রেম মৃত্যুকে মহিমা দেয় না শুধু ; মৃত্যুকে অস্বীকার করে। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রবঞ্চিতের ওঠে না প্রশ্ন ; কারণ প্রেম কাউকেই করে না প্রবঞ্চনা।

সমস্ত বঞ্চনার ঊর্ধ্বে যে বাঁচা, তারই নাম প্রেম।

তারপর হিমাদ্রিশৃঙ্গে যেদিন আসন্ন হয়ে এল প্রথম আষাঢ় ; অথবা নীলাঞ্জন ছায়ার সঞ্চার হল বেনু বনে-বনে ; কিংবা দেখা হল ওদের দু'জনের, হঠাৎ খুশীর শ্রাবণ-রজনীতে, সেদিনও ওরা আকুল হল কিন্তু অস্থির হল না ; ব্যাকুল হল কিন্তু লঙ্ঘন করল না সীমা। প্রতীক্ষা করল ; মধুর প্রণয় থেকে পরিণয়ের মধুরতর প্রতীক্ষা ! তারপর একদিন সেই অনিবার্য, অপরিহার্য কথা ; সবচেয়ে অবশ্যম্ভাবী

সেই একমাত্র পরিণতির প্রত্যাশার পূর্ণ পরিণতির মুহূর্তে, ছ'টি হৃদয় যখন একান্ত সন্নিকট, তখনই এল বিচ্ছিন্ন হওয়ার অপ্রত্যাশিত আশঙ্কা। এল বিচ্ছেদের বেলা। নীলমণি জানত তাদের বিবাহ অসম্ভব, দুর্গা প্রশ্ন করেছিল, কেন? তারই জবাব দেবার জন্যে নীলমণি নিয়ে গেল দুর্গাকে দুর্গাদেরই বাড়ীতে।

ঘরের ভেতর যেতে হল না; ঘরের বাইরে থেকেই ওরা শুনতে পেল সব। দুর্গার বাবা বলছেন দুর্গার মা-কেঃ তুমি কী পাগল হয়েছ? ওর সঙ্গে কখনও আমার মেয়ের বিয়ে হতে পারে? ওর পরিচয় কী? লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে 'কার সঙ্গে দুর্গার বিয়ে দিচ্ছ?' তখন বলতে হবে কিছু; না মাথা নীচু করতে হবে বলবার মত কিছু না পেয়ে? এই বয়সে লোক-হাসাতে চাও আমাকে দিয়ে?

বলতে পারতেন দুর্গার মা অনেক কিছুই; বলতে পারতেন, অম্বিকাচরণের মেয়েকে যখন বিয়ে করেন, তখন অনন্তকুমারেরই বা কি পরিচয় ছিল এমন? সম্বল ছিল কতটুকু? সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত! কিন্তু তবুও বললেন না কিছু; বললেন না, কারণ বলে লাভ নেই! অনন্তকুমার-অম্বিকাচরণরা পেছনের দিকে তাকাতে জানেন না; এগুতে জানেন সামনে। দুর্দিনের দিনকে ভুলাবার চেষ্টাতেই তাদের দুর্দমনীয় হয়ে ওঠা। শুধু এই একটাই কারণ নয়; আরও যে-কারণ তা হলঃ অম্বিকাচরণ-অনন্তকুমাররা এখন আর বাড়ীর মেয়েদের বিয়ে দিতে গিয়ে পাত্রের পরিচয় নেন না; প্রয়োজন মনে করেন পাত্রের পিতার পরিচয়, সেইটেই পাশপোর্ট। বংশকৌলিন্য নয়; ব্যাঙ্কব্যালান্স! স্বাস্থ্য নয় অর্থ; বড় মানুষ নয় বড়লোক! স্বয়ংম্বর সভা ডেকে পাত্রীর মনোমত বরের গলায় মালা দেবার দিন গেছে; এখন টাকার কুমীরকে সামনে শিখণ্ডী রেখে, বড়লোকের ছেলের বৌ হতে যাওয়ার পালা! স্বয়ংবর নয়; স্বয়ং বর্বররাই আজ সমাজের শ্রেষ্ঠ পাত্র।

নরবলি বন্ধ হয়েছে! অসুস্থ, অপ্রকৃতিস্থ, অপদার্থ, উচ্ছৃঙ্খল ছেলের সঙ্গে মতের বিরুদ্ধে মেয়ের জোর করে বিয়ে দেবার নামে 'নারী-বলি' আজও অব্যাহত! স্বামীর চিতায় সতীকে জোর করে মরতে পাঠানো বন্ধ করেই সমাজ তার দায় সেরেছে; কিন্তু স্বামী বেঁচে থেকে তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে স্ত্রীকে মেরেছে,—সমাজ ভ্রূক্ষেপ করেনি।

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল নীলমণি দুর্গার জীবনে, তেমনি নীরবেই বিদায় নিল সে। সূর্যমুখীর সঙ্গে দেখা হল না শুকতারার: যাযাবর হাঁসের সঙ্গে হল না বনহংসীর নীড়বাঁধা। বাজনা জমে ওঠবার মুখেই গেল সেতারের তার ছিঁড়ে! শুধু দুর্গার জীবন থেকেই নয়, হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হল নীলমণি। ঠিকানা রেখে গেল না তার।

খুব খুশী হতে পারতাম, লিখতে পারলে; তারপর তারা সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।' পারলাম না; আর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাভের কাহিনী শেষ হয় যেখানে দু' হাত হয় এক; রূপকথার গল্পে তাই হয়েছে চিরকাল। কিন্তু জীবনের গল্পে তা হয় না। নটে গাছ হয়ত মুড়োয়; কিন্তু জীবনের গল্পটি ফুরোয় না। কারণ আদিকাল থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত মানুষের জীবন কল্পনার রূপকথা নয়; বাস্তবের অপরূপ-কথা।

নাটক আর নভেলে ইনিয়ে-বিনিয়ে আমরা যতই লিখি না কেন, অমুককে না পেলে অমুক মরে যাবে বয়স যতই বাড়বে ততই দেখি তা নয়। মরে যায় না কেউ-ই। নাটকের রোম্যান্স প্রেমের সংলাপে; জীবনের রোমাঞ্চ, ছেলের অসুখে, সংসারের অসাচ্ছল্যে, বৌ-এর সঙ্গে মন কষাকষিতে। জীবনের 'নাটক' নয় নাটকের 'জীবন' কিছুতেই। ছোট ছেলেকে ভোলাবার জন্যে ছড়া; আর বুড়ো-খোকাকে বাঁধবার জন্যে গাঁটছড়া-বাঁধার গল্প। বয়স হলেই বুদ্ধি হয় না, কিন্তু বুদ্ধি হলে তবেই বোঝা যায় যে, বয়স হয়েছে। তাই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে রচিত হয় অসংখ্য নাটক-নভেল-ক্রাইমথ্রিলার

যা অপ্রাপ্তবয়স্কদেরও বুদ্ধিতে অবহেলার যোগ্য। একুশ বছর বয়স হলেই যে হওয়া যায় প্রাপ্তবয়স্ক; কিন্তু বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায় কি?

দুর্গার সঙ্গে নীলমণির বিয়ে হলে সুখের হত, কিন্তু দুর্গার পরবর্তী জীবনে যে বিচিত্র নাটকের যবনিকা উন্মোচিত হল তা হত অসম্ভব। তারই জন্যে প্রয়োজন ছিল আদিত্য-দে-র। পার্বতীর সঙ্গে যার বিয়ে হলে দক্ষরাজ খুশী হতেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত সবাই, তার সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ হল না; মাল্যদান করলেন তিনি শিবকে! এবং মাল্যদান করলেন বলেই জমল দক্ষযজ্ঞের পালা।

পিছনে কোন পরিচয় না রেখেই নিরুদ্দেশ হল নীলমণি। কোথায় যাচ্ছে, জানল না কেউ। কবে আসবে, তাও না। রেখে গেলে হয়ত, দুর্গার সঙ্গে সেদিন তার বিবাহ অসম্ভব হলেও, এমন দিন তার পরেই এল যেদিন এ-বিবাহের প্রস্তাব হত দুর্গাদের দিক থেকেই! কারণ যে-অর্থ আর প্রতিপত্তি দেখতে দিচ্ছিল না অনন্ত-কুমারকে চোখ খুলে; দেখতে দিচ্ছিল না চতুর্দিকের অবস্থা, সেই অর্থ আর প্রতিপত্তির স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হল তাঁকে।

তাসের ঘর যেমন করে ভেঙ্গে পড়ে; বালির বাঁধ যেমন করে ধ্বসে; পায়ের তলায় যেমন করে সরে যায় মাটি, ঠিক তেমনি করে ক্ষমতার অমরাবতী থেকে অক্ষমতার অতল গর্ভে নিমজ্জিত হলেন অনন্তকুমার। নিরাশ্রয় হলেন; নির্বান্ধব হলেন। ঠিক যেন কোন যাত্রার পালায় রাজা সেজেছিলেন তিনি; এক রাতের রাজা। রাত ফুরাবার আগেই আবার যে-ফকির সে-ফকির।

স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগল; তারই আলোয় রাঙা হয়ে আছে রামায়ণের পাতা; লাষ্ট ডেস অফ পম্পাই!—ভিসুভিয়সের মুখে পম্পাই আহুতি হয়ে গেছে; কিন্তু সেই সঙ্গে চিরকালের মত মানুষের মনে রয়ে গেছে শেষ ক'টা দিনের ইতিহাস। অনন্তকুমার-অম্বিকা-চরণের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্তে, উত্থানের শুধু ধরা যায় চিত্র, কিন্তু তাদের পতনের মুহূর্তরা বিচিত্র!

উত্থানের শুধু ইতিবৃত্ত হয়; কিন্তু পতনের হয় এপিক।

অনন্তকুমারদের পতনের নিমিত্ত কারণ হলেন সর্বরঞ্জন পোদ্দার। সর্বরঞ্জনকে যখন এনেছিলেন প্রথম রাজনীতির পঙ্ককুণ্ডে, বাংলার সব চেয়ে মাননীয় পুরুষ, সেদিন ঘোষেরা এবং ঘোষেদের সঙ্গে অন্যেরা আপত্তি জানিয়েছিল। তারা বলেছিল: লোকটার অতীত অজ্ঞাত এবং বর্তমান পঙ্কিল; এমন লোককে দলে ভেড়ান কী যুক্তিযুক্ত? যিনি এনেছিলেন সর্বরঞ্জনকে তিনি বলেছিলেন জবাবে: রাজনীতি কি 'ধর্মপুত্র' যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যা ভাষণে করে নি বাধ্য? যাকে এনে দিলাম, এমন লোক দিয়েই হয় কার্যোদ্ধার; একে একদিন তোমরা চেপে রাখতে পারবে না; ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বরঞ্জনের উত্থান স্বতঃসিদ্ধ—একথা এখন না মানতে পারলেও জেনে রেখ।

অম্বিকাচরণ-অনন্তকুমারদের ফাঁদে ফেলবার কাজে তাই ঘোষেরা সর্বপ্রথম যাকে স্মরণ করল, সে হল সর্বরঞ্জন। ফাঁদে পা দেবার জন্যে অনন্ত-অম্বিকা তৈরীই ছিলেন। যেমনই ফাঁদ-পাতা তেমনই ধরা পড়া! সরকার-পক্ষে ছিলেন ওঁরা দু'জন। একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভোটের দিনে সাহাদের বাড়ীর একজনকে নজরবন্দী করে রাখলেন ঘোষেরা; সাহাদের সেই একটি ভোটেই হেরে গেলেন সরকার পক্ষ।

ওদিকে সর্বরঞ্জন কাকে দিয়ে একটি চিঠি ছাপিয়ে দিল সাহেবদের দৈনিকে। চিঠির বক্তব্য: অনন্ত-অম্বিকাদের ব্যাঙ্কে গুরুতর গলদ আছে, সেই সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া দরকার; কাজেই যাদের টাকা আছে তারা যেন অবহিত হয়!

বলতে হল না; সকাল বেলায় অম্বিকাচরণ খবর-কাগজ পড়েই বুঝলেন, হয়ে গেছে! টাকা তাঁর তখন ছিল না, কিন্তু সম্পত্তি ছিল বিপুল। আগেও একবার বাঁচিয়েছিলেন ব্যাঙ্ককে; এবারেও পারতেন যদি সময় পেতেন। অম্বিকাচরণ যাদের ব্যাঙ্কে এনেছিলেন তারাই সর্বনাশের সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে তলায়-তলায়, আস্তে-আস্তে। অনন্তকুমার এদের নিতে চাননি ব্যাঙ্কে; কিন্তু শ্বশুরের কোন কথায় 'না'—বলা

ছিল তাঁর কাছে অমার্জনীয় অন্যায়; এ ছাড়াও অম্বিকাচরণের প্রচুর সুহৃদ, বন্ধুত্বের সুযোগের অপব্যবহার করেছে ব্যাঙ্কের অর্থে; অনন্তকুমারকে জেনে শুনেও হজম করতে হয়েছে তা। এসব সত্ত্বেও কিছুই হত না, যদি একটু আগে চোখ খুলে দেখতেন এঁরা; তখনও কুড়িখানা বাড়ী ছিল কলকাতায় অম্বিকাচরণের। কিন্তু যে সময়টা শত্রুপক্ষ এগিয়েছে কচ্ছপগতিতে; সে সময়টা শশক-সুখে ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন এঁরা, শেষ সময়ে বাজী মেরে দেবার অলীক স্বপ্নে।

কিন্তু চরম উত্থান থেকে চিরকালের মত পতনের মুহূর্তেও মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন অনন্তকুমার। এতটুকু হেলেন নি; বেঁকেন নি নিজের পথ থেকে। যে সব অযোগ্য-হাতে টাকা তুলে দিয়েছিলেন অম্বিকাচরণ, তাদের ডুবে যাওয়া ব্যাবসাগুলিকে পর্যন্ত বাঁচাবার চেষ্টা করলেন তিনি; নিজে বাঁচা যায় যদি, এ-আশা নিয়ে নয়, যদি বাঁচান যায় ব্যাঙ্ককে, সেই সঙ্গে এতগুলো লোকের একমাত্র সঞ্চয়কে।

শেষ সময়েও যদি নিজের কার ঘাড়ে সম্পূর্ণ অপরাধের বোঝা না নিয়ে অনন্তকুমার চাপাতে পারতেন অম্বিকাচরণের ওপর, যা আর যে কোন লোক করত নিঃসন্দেহে এবং যে বোঝার অর্ধেকেরও বেশী সত্যিই জমিয়ে তুলেছিলেন অম্বিকাচরণই, তাহলে?—তাহলে অনন্তকুমার নির্দোষ না হলেও প্রতারক যে নন, এ-প্রমাণ তিনি দিতে পারতেন অনায়াসে। এমন কী শত্রুপক্ষ শেষ আরেকবার এসেছিলেন অনন্তকুমারের কাছে সেই প্রস্তাব নিয়ে। সাহেবদের আমলে রাজনৈতিক উত্থানের মূল নির্মূল করবার জন্যে আসামীর কাছে যেমন পুলিশ আসত এপ্রুভার হবার প্রলোভন নিয়ে। কিন্তু অনন্তকুমার দাঁড়িয়েছিলেন যেমন মানুষের মত; পড়বার দিনে পড়লেনও তেমনি মানুষের মত। আত্মহত্যা ক'রে এড়াতে চাইলেন না কলঙ্ক; পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইলেন না তিনি; খ্যাতির মুকুট মাথায় পরেছিলেন যে-যোগ্যতার দাবী নিয়ে; ঠিক সেই মনোভাব

নিজেই এগিয়ে এলেন শাস্তি নিতে; প্রাপ্য বলে স্বীকার করে নিলেন। এমন মানুষদের পতন হয় বারংবার; কিন্তু 'পরাজয়' হয় না কখনও।

এখনও দুর্গাকে জিজ্ঞেস করলে সেই সময়কার একটি দিনের কথা বিশেষ করে মনে পড়বে তার। সেই সময়ে একদিন কয়েক হাজার টাকার একটা 'নেকলেশ' অর্ডার দিয়ে গড়িয়েছে দুর্গা। যেদিন সকালে সেই 'নেকলেশ' গলায় উঠেছে তার, সেইদিনই দুপুরে ব্যাঙ্ক থেকে ফোন করেছেন অনন্তকুমার : কয়েক হাজার টাকা পেলে সেদিনকার মত 'দরজা খোলা যায় অন্তত ব্যাঙ্কের।' খুলে দিয়েছে গলা থেকে নেকলেশ দুর্গা; ফিরিয়ে দিয়েছে জুয়েলারকে; টাকা এনে দিয়েছে বাবাকে। অনেকদিন সর্বস্ব যাওয়ার পর সিল্কের শাড়ীর বদলে পরলে সুতির শাড়ী। ঘরে খিল দিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভেবেছে দুর্গা। ভেবেছে, কেমন করে বেরুবে সে। তার পর সুতির শাড়ীতে তাকে মনে হয়েছে সত্যিকারের রমণীয়; রমণী মাত্র নয়। সেই বিখ্যাত গল্পের নায়িকার মত, নায়কের চোখকে ফাঁকি দিতে রোজ কাজল পরত যে, আর একদিন কাজল পরতে ভুলে গিয়ে জানতে পারল নায়কের কাছ থেকে যে এতদিনে সত্যিকারের সুন্দর দেখাচ্ছে তার চোখ দুটো।

এই দারুণ দুঃসময়ের দিনেই দুর্গার জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় ব্যাপার ঘটল। বিয়ে হল তার আদিত্য দে-র সঙ্গে। ব্যাপারটি যিনি সুসম্পন্ন করতে সব চেয়ে এগিয়ে এলেন, তিনি হলেন দুর্গার মাষ্টার মশাই হেমন্ত বাবু। ছাত্রীকে তিনি ছাত্রী মনে করতেন না, মনে করতেন নিজের মেয়ে। ভাবতেন এমন মেয়ে এদের বাড়ীতে এল কী করে। তিনি এ বিয়ে সম্ভব করলেন; কারণ এর পর দুর্গার বিয়ে দেবার কথা ভাববার মত অবস্থাও থাকবে না, এ-কথা বিচক্ষণ হেমন্ত বাবু বুঝেছিলেন।

নিজের তুলনায় স্বল্পবিত্ত আদিত্য-দে'র সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে

একটু বিচলিত হয়েছিলেন অনন্তকুমার। অনেক আশা ছিল তাঁর। অনেক আকাঙ্ক্ষা। রাজ-রাজড়ার মেয়ের মত বিয়ে হবে দুর্গার, এই ছিলো তাঁর স্বপ্ন। কিন্তু অনন্তকুমার বিচলিত হলেও দুর্গার মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিজেদের দুর্ভাগ্য থেকে দূরে রাখতে চাইলেন তিনি দুর্গাকে। অনন্তকুমার 'না' বলতে পারলেন না। এবং এই প্রথম কোনও ব্যাপারে 'না' না-বলে ঠিকই করলেন তিনি। জামাই হয়ে আদিত্য দে ছেলের চেয়েও বেশী করল তাঁর। তিনি তাঁর শ্বশুরের জন্যে যা করেছিলেন, আদিত্য তাঁর জন্যে তার চেয়ে কম করল না কিছু। জামীন হল শ্বশুরের জন্যে বিনা দ্বিধায়। ছোট্ট জমিদারী ছিল উত্তর বঙ্গে। জমিদারীই জামীন রাখল আদিত্য। এবং উকীল ব্যারিষ্টারের পরামর্শ না নিয়েই; একাই গেল হাইকোর্টের সাহেব বিচারপতির কাছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তার কে? জবাব শুনে অবাক হলেন সাহেব। নিজের ছেলে যে-কাজ করতে দু'বার ভাবত সে কাজ করল জামাই এমন অনায়াস অসঙ্কোচে যেন শ্বশুরের না হয়ে তার শাস্তি হলেই সে খুশী হত বেশী। অনন্তকুমারের পক্ষ-সমর্থনকারী ব্যারিষ্টার পর্যন্ত আদিত্য-র এই এগিয়ে আসা দেখে অবাক হলেন না শুধু; হতবাক হলেন। মানুষ চরিয়ে চলে ব্যারিষ্টারদের। সমস্ত লোককে সন্দেহ করাই তাদের রীতি। সন্দেহের অতীত কোন স্বার্থের আশা না রেখেই কেউ করতে পারে কারুর জন্যে কিছু, আইনের অভিধানের বহির্ভূত এই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে প্রথম এবং সম্ভবত শেষও।

এইখানেই চুপ করে রইল না আদিত্য। শ্বশুরের অবর্তমানে যখন আশ্রয়চ্যুত হলেন অনন্তকুমারের পরিবার, তখন নিজের বাড়ীতে এনে তুলল তাঁদের। শ্বশুরের ব্যাঙ্কে তার নিজের সঞ্চয় গেছে, গেছে স্ত্রীর অলঙ্কার; কিন্তু তবুও আদিত্য দে বলল: কুছপরোয়া নেই। ভাগ্যকে-কে যারা পরোয়া করে না, সেই বেপরোয়া

ব্যক্তিদেরই শুধু সমীহ করে চলে ভাগ্য; এই বিশ্বাসকে সম্বল করেই আদিত্য দে তার শ্বশুরকুলের পাশে এসে দাঁড়াল।

এই বিশ্বাসের অংশ আর কেউ নিক আর না নিক, এই বিশ্বাস নিশ্চিত করল একটি মানুষকে অন্তত। অপরাধের বোঝা নিয়ে নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব অনন্তকুমার জেনে নিশ্চিন্ত হলেন যে, তাঁর পরিবারকে পথে দাঁড়াতে হয় নি ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে; মাথা গোঁজবার মিলেছে আশ্রয়, দু'বেলার জুটেছে দু'মুঠো অন্ন। তার জন্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয় নি কারুর কাছে। এগিয়ে এসেছে দুর্গা আর আদিত্য-ই!

দৈত্যকুলে আবির্ভাব হয়েছিল দুর্গার। সেখানে আর কিছু না থাক লক্ষ্মী বাঁধা ছিল অনেক দিন, বিয়ে হয়ে যে বাড়ীতে দুর্গা এল সে আবার লক্ষ্মী-ছাড়া সংসার।

আদিত্য দে দুর্গাদের তুলনায় কিছু না হলেও অনেকের তুলনায় তখনও প্রভূত সঙ্গতিসম্পন্ন। কিন্তু সঙ্গতি-ই ছিল, সুব্যবস্থা ছিল না। তার কারণও ছিল।

আদিত্যর মা-বাবা দু'জনেই আদিত্যর বিয়ের আগেই মারা যান! আদিত্য তখনও নাবালক। সংসারে গার্জেন হয়েছিলেন আদিত্যর দিদি-ভগ্নিপতি। তাঁরাই সংসারকে করেছিলেন লক্ষ্মী-ছাড়া। অব্যবস্থায় এবং অপব্যয়ে সংসারের কোথাও ছিল না শ্রী। আদিত্যর ভাই ব্রহ্মাদিত্য আদিত্যের বিয়ের সময়ও নাবালক। লেখাপড়া করেনি। এবং ছিল শুধু নগদ টাকাগুলো হাতে পেয়ে উড়োবার অপেক্ষায়।

এই পরিস্থিতিতে দুর্গার পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হল আদিত্যর দিদি-ভগ্নিপতিরা। আস্তে আস্তে আবর্জনার পঙ্ককুণ্ড থেকে নতুন চেহারা নিল সমস্ত সংসারটা। আদিত্য দে জন্ম-সুখী মানুষ, বৌ-এর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে ফটোগ্রাফী-লেখা-ছাপাখানা আর নানান টুকিটাকি কাজে হেসে-খেলে দিন কাটানোর খুশীতে পরম নিশ্চিন্ত। ছোট ভাই

ব্রহ্মাদিত্য টাকা হাতে পাওয়ার আগেই টাকা ধার করে ওড়াতে আরম্ভ করল। বন্ধু জুটল, টাকা ধার করে দেওয়ার দালাল জুটল। জুটল টাকা ওড়াবার উপকরণ। একটা ট্যাক্সীতে বেরয় ব্রহ্মাদিত্য; আরেকটা ফাঁকা ট্যাক্সী ভাড়া করে পেছন পেছন ঘোরায় সে; যদি পথের মধ্যে গাড়ী বিগড়োয়, তবুও দাঁড়িয়ে থাকতে না হয় যাতে, দ্বিতীয় গাড়ীর অপেক্ষায়, সেই জন্যই সারা দিন মিটার উঠতে দেয় ব্রহ্মাদিত্য দু'খানা ট্যাক্সীরই; এবং তা নিয়ে করে না ক্ষোভ।

এমনই দিনে পতন হল অনন্তকুমারের। সমস্ত সংসারের ভার মাথায় তুলে নিল দুর্গা। মা-ভাইদের নিয়ে এল নিজের বাড়ীতে; আদিত্য দে তখনও নিজে কিছু করে না; সংসার চলে জমিদারীর টাকা থেকে। জমিদারী তখনও 'নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না'—অবস্থায় আসে নি। তখনও সেখান থেকেই মাসে মাসে আসত মোটা টাকা।

দুর্গার বিয়ের সময় উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতির মধ্যে আমারটাই প্রধান; প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রথম দেখেছিলাম দুর্গাকে কিশোরী; তারপর দেখা হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, সংসারের গিন্নী। এর মধ্যে দু'যুগ পার হয়ে গেছে ক্যালেণ্ডারের হিসেবে! কিন্তু অভিজ্ঞতার খতিয়ানে দুস্তর পথ অতিক্রম করেছে দুর্গা। তার সন-তারিখ কষা যায় কিন্তু গভীরত্ব যায় না মাপা। ধাপে-ধাপে নামতে নামতে দুর্গা নিম্ন-মধ্যবিত্তদের নিম্নতম অবস্থায় নেমেছে। জমিদার-তনয় আদিত্য দে পরের চাকরী করতে বাধ্য হয়েছে সামান্য মাইনের বিনিময়ে। আতর, জড়োয়া আর গাড়ীর পাদানী থেকে দুর্গা পা দিয়েছে শক্ত মাটিতে, হাতা-বেড়ি, সেলাই-ফোঁড়াই আর চাল-ডালের ফুটন্ত হাঁড়িতে নিজের সত্যিকারের মুখ দেখতে পেয়েছে দুর্গা; জানতে পেরেছে তার পরিচয়; বিশ্বের সকলের সব কিছু যোগাবার গুরুদায়িত্ব তার, তারই সঙ্গে নিজের ভাঁড়ার রিক্ত-

হওয়ার ভাগ্য। অন্নপূর্ণার ঝুলিতে আছে সকলের অন্ন; শুধু শিবের জন্য আছে আত্মদহনের দুশ্চর তপস্যা।

মধ্যবিত্তের সংসারে না এলে দুর্গার জীবন নিয়ে লিখতে বসলে তা চিত্র হত; কিন্তু বিচিত্র হত না কিছুতেই। শিবের সঙ্গে পার্বতীর পরিণয় না হলে দক্ষের কি হত বলা শক্ত, কিন্তু দক্ষযজ্ঞের পালা জমত কি এমন করে?

আদিত্য দে-কে আমি দেখিনি আগে। এই সেদিন আশ্চর্য ভাবে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। এবং সেখান থেকে তার বাড়ী গিয়ে দেখতে পাওয়া দুর্গার নতুন পরিচয়!

এই পরিচয় হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতার পটভূমিকায়। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকাকে আরও পরিষ্কার করে তুলে না ধরলে দুর্গার সত্য পরিচয় হবে না প্রদীপ্ত। যে-দুর্গার আভাস দিয়েছিলাম তার সেই অসুরের সঙ্গে অস্ত্র চালনার, অর্থাৎ সংসারের" সঙ্গে সংগ্রামের অথচ এখনও সম্পূর্ণ করে বলিনি যে-কথা, এবং চিত্র-বিচিত্রের সেই সমাপ্তি পূর্বের আগে আরেকবার ফিরে আসতে হবে সে-কলকাতা থেকে এ-কলকাতায়। এ-কলকাতায় মানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের কলকাতায়; যে-কলকাতা দেখেছে দুর্ভিক্ষ। দেখেছে দাঙ্গা। দেখেছে দেশ-ভাগ। এই তিন দ'য়ে মজেছে যে কলকাতা, সেই কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের মর্মের কথাই দুর্গার কথা!

যিনি বিখ্যাত এক কবিতায় বলেছেন এ-কথা যে, এগারশ' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে চোখের জলের মত যারা মুছে গেছে, তারাই আবার চোখের জলের মত এসেছে তেরশ' পঞ্চাশে; তিনি কবির সত্যকে রূপ দিয়েছেন কিন্তু বাস্তবের সত্য-কে করেননি উদ্‌ঘাটিত!

কারণ তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে যা হয়েছে, তার আগে কখনও তা হয় নি! আর কখনও যেন তা না হয়! এগারশ' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সুলভ হয়েছিল 'দুর্মূল্য'; তেরশ পঞ্চাশে, দুর্মূল্য হয়েছে দুর্ভিক্ষ!

এবং অন্নের অভাবে হয় নি; হয়েছে কালোবাজারের প্রভাবে! মুখের অন্ন লোকের সম্মুখে ধরে রাখতে পারে নি যারা, তাদের বেচে দেওয়া 'চাল' গোপন সুড়ঙ্গ-পথে চালান করে দিয়ে কলকাতায় কালোবাজার বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে লালবাজারের ভয়কে তুচ্ছ করেই!

এগারশ' ছিয়াত্তরে অনুযোগ করেছিল মানুষ; অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি বন্যা আর প্লাবনে বরাবর ভেসে গেছে বাংলা দেশ; বিপর্যস্ত হয়েছি আমরা বাঙালীরা; কিন্তু তবুও কবির কথাই ঠিক: মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি।

কিন্তু তেরশ' পঞ্চাশের সঙ্গে পরিচয় হয় নি বাঙালীর কোনদিন। এই অভূতপূর্ব দুর্ভাগ্যের সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এ-দুর্ভিক্ষ প্রকৃতির বিপর্যয় নয়; মানুষেরই তৈরী।

দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ এবং দেশভাগ—এই তিন দুরবস্থার পেছনেই দেখা গেছে যার চেহারা, তার [illegible]র রাজনীতি। এবং সেই চেহারারও পেছনে দেখা গেছে যে মুখ সে হলো: Divide & Misrule'-এই পলিশি। কিংবা ভুল বললাম, মুখ নয় এরা ছিল আসলে মুখোস। এই মুখোসের আড়ালে ছিল একটি মুখ ঢাকা; মুখোসের পেছনে থেকে বেরিয়ে পড়েছে বারংবার; সে-মুখ লাল; সে-মুখ ব্রিটিশ সিংহের।

চোদ্দ

'১৩৫০'-এর দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মানুষ মরবার পর, মাননীয় মন্ত্রী পরলোকগত আজিজুল হক সাহেব বললেন সাফাই গাইতে উঠে: যা যা ঘটেছে তা সরকারের ত্রুটিতেই ঘটেছে কিন্তু সে-ত্রুটি কারুর ইচ্ছাকৃত নয়। এই সাফাই-এর ওপরই ভারতের বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রী শঙ্করের হিন্দুস্থান টাইমস'-এ সেই অবিস্মরণীয় কার্টুনটির পরিকল্পনা। এক নাপিত একজনের দাড়ি কামাতে-কামাতে হাত ফসকে গলা কেটে ফেলেছে ক্ষুর দিয়ে; নাপিত হয়েছেন এখানে মন্ত্রী এবং লোকটি হয়েছে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলার প্রতিনিধি; অর্থাৎ নাপিত যদি দাড়ি কামাতে-কামাতে গলা কেটে ফেলে কারুর, এবং তার পর বলে: এ-তার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মাত্র; তাতে যার গর্দান যায় তার অবস্থার হয় না কোন উন্নতি। আজিজুল হকের সাফাই, কাজে-কাজেই সেদিন-কার ক্ষুধার অন্ন নিয়ে কালোবাজারীদের 'হাত-সাফাই'-এর অন্যায়কে, সরকারী সমর্থনের অমোচনীয় কলঙ্ক মুছতে সামান্যই কাজে লেগেছে।

দুর্ভিক্ষে-দাঙ্গায়-দেশভাগে যারা মরেছে বেঁচে গেছে তারা। যারা বেঁচে আছে মরেছে তারাই; মরে বেঁচে যাওয়া ভাগ্যের কথা, বেঁচে মরার চেয়ে! ঠিক হ'ক, আর বেঠিক হ'ক, নিহতদের একটা হিসেব খাড়া করা হয় শেষ অব্দি; ক্ষতিপূরণ মেলে কখনও; কখনও মেলে না! দুর্ভিক্ষ-পীড়িতরা পায় সরকারী সহানুভূতি; বে-সরকারী সাহায্য। দেশভাগ হবার পরও আশ্রয় মেলে উদ্বাস্তু বলে; দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-দেশভাগ যতই দুর্দশা আনুক তবু সবই

সাময়িক। কিন্তু যারা দুর্ভিক্ষে মরে নি; দাঙ্গায় ঘায়েল হয় নি; উদ্বাস্তু হতে পারে নি যারা, সেই মধ্যবিত্তদের জীবন-ভোর কান্না দরজা বন্ধ করে; কখনও কখনও কানে এলেও প্রাণে বাজে না কারুর! ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালেই পাওয়া যায় কিছু; প্রয়োজন নেই যার সেও পায়। কিন্তু সাহায্যের দরকার যাদের সবচেয়ে তারা ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসে পারে না হাত পাততে; তাই তাদের ভিক্ষে নয়, বাঁচবার উপায় বাতলাবার নেই কেউ, না সরকারী ব্যবস্থা; না রাজনৈতিক আন্দোলন। মধ্যবিত্তরা প্রতি মুহূর্তে মরবার জন্যেই জন্মায়,—এই যেন শেষ রায় সমাজের। দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগে কালোবাজারী কলকাতার কী হয়েছে বলতে পারি না; কিন্তু দ'য়ে মজেছে যে মধ্যবিত্ত-কলকাতা, বলতে পারি তা নিঃসন্দেহে।

কলকাতার সিনেমা-হাউসের সামনে লম্বা কিউ দেখে হঠাৎ এ-কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না; যেমন চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে চেনা হয় না সত্যিকারের কলকাতার সঙ্গে; কার্জন পার্ক, পার্ক স্ট্রীট, অক্টোরলনী মনুমেণ্ট, লাট সাহেবের বাড়ী, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা কি ব্যোটানিক্যাল গার্ডেন হল শহরের প্রচ্ছদ মাত্র; প্রচ্ছদ থেকে ভেতরের পরিচয়ে পার্থক্য বিপুল; কলকাতাকে জানতে হলে যেতে হবে অসংখ্য অখ্যাত নাম-ধামহীন গলি-রাস্তায়; খবর নিতে হবে যারা গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার দেয়, তাদের কাছে; পাত্তা পাওয়া দরকার কত কাবুলী কলকাতার কত লোকের নিরুপায় পাওনাদার। যাওয়া দরকার মধ্যবিত্ত কলকাতার খবর জানতে হোটেলে-বারে-ক্লাবে; দায়িত্বহীন বেপরোয়া বোহেমিয়ানরা সেখানে যে-সব ভদ্রলোকের মেয়েদের নিয়ে গিয়ে নাচে, গান গায়, খায়, আড্ডা দেয়, তারা কারা? কলকাতার সংখ্যাতীত ফিল্‌ম্‌ স্টুডিওতে যে-সব মেয়েরা হিরোইন হবার স্বপ্ন দেখে কিন্তু পায় না সুপার মেয়ের কাজও, তাদের সবাই পতিতা নয়; তাহলে তাদের এখানে

পাঠায় কারা; পাঠায় কেন? শিল্পী হবে বলে? না। পেট চালাতে হবে বলে তাদের মা-বাবারাই তাদের পাঠায় এখানে; যেমন করে একদিন মোষ বেচে দিতে চাষা নিয়ে যায় তাকে বাজারে; মোষ কথা বলতে পারে না; চাষাও কোন কথা বলে না; কিন্তু বোঝে দু'জনেই; তাই দু'জনেই থাকে বোবা।

সেই বোবা কান্নার না-বলা কথাই মধ্যবিত্ত কলকাতার করুণ ইতিহাস।

খবর-কাগজে 'খবর না হলে আজ আর আমাদের নজরে আসে না কিছুই; যতক্ষণ কিছু করবার থাকে ততক্ষণ খবর-কাগজ পাত্তা দেয় না তাকে। যেই হাতের বাইরে চলে যায় পরিস্থিতি তখন আসে খবর-কাগজের রিপোর্টার; আইন-আদালতের পাতায় পরিবেশিত হয় অমৃত; পান করে সারা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা; খবর পড়ে ঘরের বৌ-রা; বার লাইব্রেরীতে উকীল-ব্যারিষ্টাররা! রকে বসে খবর-কাগজ খুলে ধরে পড়ে 'ফোক্‌রে'-রা; সাঙ্গুভেলীতে চায়ের সঙ্গে গেলে আফিস-বাবুরা; গীতা-উপনিষদ সরিয়ে রেখে 'কী সব কেলেঙ্কারী হচ্ছে', বলে বাইরে তাচ্ছিল্য, ভেতরে উদগ্র উৎসাহ নিয়ে পড়েন প্রাচীন-পন্থীরা; লেকের ধারে; ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বৃদ্ধদের আড্ডা সেদিন রাত দশটার আগে ফুরোয় না। পরের কেচ্ছায় যত রস, এত উত্তেজনা সোমরসেও নেই যে। ঘরের কেলেঙ্কারী যখন বাইরের 'কথা' হয়, তখন তা হয় রম্য রচনার মতই রমণীয়; Rome was not built in a day! ঠিক কথাই; রোম-রচনা সম্ভব হয় নি একদিনে; কিন্তু এমন ঘটনা নিয়ে রম্য রচনার জন্ম হয় ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। সবাই তা পড়ে মন্তব্য করে: আশ্চর্য!

আশ্চর্যই বটে! যখন দিনের পর দিন চলে এই বীভৎস অনুষ্ঠান চোখের উপর, তখন কেউ আতঙ্কিত হওয়া দূরে থাক,

বিস্মিতও হয় না; তার পর এক দিন অবাঞ্ছিত শিশুর অপসারণের প্রচেষ্টা ভ্রূণহত্যায় হয় পর্যবসিত; মৃত্যু হয় কুমারী কন্যার। পি-টি-আই আসে; ইউ-পি; এ-পি; সবাই আসে দৌড়ে। নিজস্ব সংবাদদাতার প্রত্যক্ষ বিবরণ হয় উত্তেজক। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফেরিওলারা ছড়া কাটে: কুমারী হল ছেলের মা···। কেস সুরু হয়; সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় উচ্ছ্বাসে ফেনিল হয়ে ওঠে; পুলিশ সতর্ক নজর দেয়; রাঘব-বোয়ালরা পালালেও যাতে চুনো-পুঁটিরা অন্তত ধরা পড়ে! আদালত কক্ষে সরকার পক্ষের ব্যবহারজীবী গর্জে ওঠেন: 'এই, এই সে রমণী—!'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতায় তাই 'মধুবংশীর গলিতে' দেখেছি:

"কোন বাঁকাটুপী-পরা এমেরিকান কাপ্তানের লোলুপ শিষ
তরুণী রাত্রির গালে চাবুক মারে।"

এই 'মধুবংশীর গলি'র ইতিহাস যেদিন সম্পূর্ণ লেখা হবে সেদিনই শুধু জানা যাবে এমন কোনও অন্যায়ই নেই, নেই এমন কোন ব্যভিচার, যা কালো করে নি কলকাতার মুখ; ভগবানের কথা তুলছি না; বিবেকের কথাও নয়; প্রকৃতিকে স্বীকার না করে উপায় কী? দীর্ঘদিন প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলবার চেষ্টায় শাস্তি দেয় প্রকৃতি নিজের হাতেই; ইতিহাসে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে; যুগের অন্তে এসেছে যুগান্তর; সমুদ্র মুছে গেছে; জেগেছে পাহাড়; শুধু মহাকালের চাকা,—তার শেষ হয় নি ঘোরা; তাই কলকাতায় যে ঘটনা দিনের পর দিন ঘটছে; রাতের পর রাত যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে হোটেলের গোপন কক্ষে; ট্যাক্সীর বসবার আসনে; ময়দানের অন্ধকারে; অথবা বাস্তুভিটেতেই; এবং যার বিরুদ্ধে নেই প্রতিবাদের ক্ষীণতম কণ্ঠও, যা দেখে মনে হচ্ছে এমন করেই বুঝি অব্যাহত রইবে অন্যায়ের জয়যাত্রা; জেনে রাখা দরকার তার আসন্ন হয়েছে ভয়ঙ্কর অন্তিম; অপরাধের পর অপরাধেও, ক্ষমার পর ক্ষমা করেছে যে, শাস্তি দেবার সময়ে

অপরাধ আর না করলেও তার মার্জনা নেই; এমনই নির্দয় প্রকৃতি; এমন নিষ্ঠুর সে; তাই যে-মুহূর্তে আমরা নিশ্চিন্ত, কলকাতায় চিরকাল এমনই চলবে অন্যায়ের অপ্রতিহত ধারা, সেই মুহূর্ত থেকেই রুদ্র হবে প্রকৃতির মুখ; উদ্যত হবে দণ্ড; পায়ের তলায় মাটির বুক হবে বিদীর্ণ; আকাশের কপাল ফেঁড়ে দধীচির বজ্র নামবে শহরের মাথায়; ভিসুভিয়াসের মুখ থেকে নির্গত হবে লাভাস্রোত; লাষ্ট ডেজ অফ পম্পাই লেখা হবে নতুন করে; পম্পাইএর জায়গায় হবে কলকাতা; ভিসুভিয়াসের জায়গায় হয়ত হাইড্রোজেন বম্ব।

দুর্গা, আদিত্য দে'র সংসারে প্রথমেই যা আবিষ্কার করল, তা হল এদের পরিবারের সবাই পাগল; কিন্তু কেউই পুরো পাগল নয়; ফলে এরা পাগল হয় না কেউ, কিন্তু যারা এসে পড়ে এদের আওতায় তাদের পাগল না হয়ে উপায় কী? তারা পাগল না হতে চাইলেও এরা পাগল করে ছাড়বেই!

এদের বাড়ীতে আসবার সময়ই দুর্গার মা সাবধান করে দিয়েছিলেন কারুর কথার প্রতিবাদ না করতে আর ইংরেজী না বলতে ভুলেও একবার; দুর্গা মেনে চলবে বলে কথাও দিয়েছিল; মেনে চলেও ছিল প্রায়; 'প্রায়',—সম্পূর্ণ পারে নি; বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যেই একটি ঘটনায় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হল সে; সমস্যা সামান্য নয় গুরুতর; বিয়ের প্রসেশন যাচ্ছিল একটা রাস্তা দিয়ে দুর্গা এবং আদিত্য দু'জনেই দেখল; আদিত্য দে দেখে এসেই বাড়ীতে ঘোষণা করল: পঁচাত্তরটা হাতী ছিল প্রসেশনের সঙ্গে; তখনও আদিত্যের দিদি-ভগ্নিপতিরা বিদায় হন নি বাড়ী থেকে; আদিত্যকে জানতেন তিনি জন্মমুহূর্ত থেকেই; তাই জিজ্ঞেস করছিলেন দুর্গাকে: বৌমা তুমি বলত, ক'টা হাতী গেছে প্রসেশনের সঙ্গে?—প্রশ্ন শুনেই তো বৌমা'র হয়ে গেছে। দুর্গা মহা-ফাঁপরে পড়ে গেল; সত্যি কথা বললে স্বামী মিথ্যাবাদী প্রমাণ হবে; অথচ মিথ্যা কথা বলা দুর্গার

পক্ষে প্রায় অসম্ভব : অনেক ভেবে সে দু'-কূলই রাখল ; বলল : আমি তো মোটে তিনটে দেখেছি। আদিত্যর দিদি বললেন : বুঝেছি ; আদিত্য দে হাসতে লাগল।

ঘুম থেকে উঠেই আদিত্য এবং ব্রহ্মাদিত্য দু'ভায়ের একই প্রশ্ন : আজ কী মাছ ?—এবং ঠাকুর তার জবাবে যাই বলুক, এক ভাই তাতে উল্লসিত হয়ে বলবে ; ভালো করে দই-টই দিয়ে রেঁধো ; এবং আরেক ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার : ধ্যাত ! ধ্যাত! ধ্যাত !—ও-মাছ মানুষে খায় ? বড় ভাই আদিত্য শীত-কাতুরে ; সাজগোজ-প্রিয় ; ফ্যাশনেবল ! ছোট ভাই ব্রহ্মাদিত্য প্রায় সব সময়ই পরনের গোটান কাপড়টুকু ছাড়া নাগা সন্ন্যাসীদের মত। যত শীত পড়ে তত খোলস ছাড়ে ব্রহ্মাদিত্য, ডিসেম্বরের দুর্দান্ত শীতে খালি গা' একেবারে, সকাল দশটায় ওঠে বড় ভাই, ভোর পাঁচটায় ছোট। শুধু দু'ভাই নয় বাড়ীর প্রত্যেকটি লোক মায় চাকর-বাকর পর্যন্ত একেকটি টাইপ !

বাড়ীর ঠাকুরের কলেরার মত হয়েছে, ডাক্তার এসেছে, ইঞ্জেকশন দেবে। আদিত্য ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করছে : কী দিচ্ছেন ? ডাক্তার নাম বলল ; আদিত্য দে'র সঙ্গে সঙ্গে জবাব : আচ্ছা আরেকটা কি ইঞ্জেকশনের নাম দেখছিলাম মেডিক্যাল জর্নালে, সেটা দিলে হয় না ? ছোট ভাই ব্রহ্মাদিত্য আণ্ডার-ওয়্যার সম্বল করে নিজের ঘরে শুয়েছিল, কিছুর মধ্যে কিছু নয়, একটু পরেই উঠে এসে বলল : না, না, ও ইঞ্জেকশন নয় ; ও-পাশের বাড়ীর ডাক্তার বাবু এই ত্থান (একটা যা-তা বলে দিল নাম।) ; এক মুহূর্ত দেরী না করে আদিত্যর গগনভেদী প্রতিবাদ : মুখ্যু কোথাকার ! লেটেষ্ট মেডিক্যাল ডাইজেষ্ট কী বলছে, শোন ; বলে ডাক্তারকে খাটে বসিয়ে আদিত্য খুঁজতে লাগল বই।

নীচে ঠাকুরের তখন শ্বাস উঠে গেছে প্রায় !

এদের পরিবারের পুরো ইতিহাস রামায়ণ-মহাভারতের চেয়েও চিত্তাকর্ষক বেশী। এদের প্রত্যেক দিনের রোজনামচা উপন্যাসের

চেয়ে আকর্ষণীয়; বাড়ীর সব চেয়ে পুরাতন ভৃত্যের নাম নন্দ; সত্যিকথা বলতে সেই বাড়ীর কর্তাব্যক্তি; আদিত্যকেও ধমকায়; ব্রহ্মাদিত্যকেও। সেই নন্দকে এক দিন আদিত্য বলল একটা বাতিল করবার মত কোট দেখিয়ে, যে বোতামগুলো কেটে রেখে কোটটা নিয়ে নিতে; পরের দিন কাজে বেরুবার সময়ে আদিত্য দের চীৎকারে পাড়া মাত; দুর্গা দৌড়ে এল: কী হয়েছে! আদিত্য উদয়শঙ্করের হরপার্বতী নাচ নাচছে একাই; আর চেঁচাচ্ছে: কি সর্বনাশ করেছে দেখ; দেখা গেল সত্যি-সত্যিই; একটু বাদে দেখা গেল; সমস্ত সার্ট-কোট-প্যান্ট-পাঞ্জাবীর সবগুলো বোতাম কেটে রেখে দিয়েছে নন্দ!

আদিত্য দে'র শ্যালকরাও কেউ কারুর চেয়ে কম নয়; বড় শ্যালকের নাম ডাম্বল; তার প্রতিভা অত্যন্ত অল্প বয়সেই প্রতিভাত হয়; ইস্কুলে মাষ্টারমশাই জিজ্ঞেস করেন: 'যার স্বামী বেঁচে নেই এমন স্ত্রীলোককে বলা হয় বিধবা; যার স্ত্রী বেঁচে নেই এমন পুরুষকে কী বলা হবে?' ডাম্বল জবাব দেয়: সধবা! ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় তার অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট ছিল: ভূগোল; বাবাকে, পরীক্ষা দিয়ে এসে সে বলে যে সে letter পাবে; পরে মার্কশীটে দেখা যায় ভূগোল পরীক্ষার ফলের জায়গায় লেখা আছে A অর্থাৎ absent; এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে সে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেন, A কি letter নয় কোনও?'

আদিত্য ব্রহ্মাদিত্যর বাড়ীতে থাকতেন আরেকজন; তিনি এদের মায়ের আমলের লোক; তাঁকে সবাই ডাকে দাদাভাই বলে; তিনি আদিত্যকে পড়িয়েছেন; ব্রহ্মাদিত্যকে পড়াবার চেষ্টা করে না পেরে হাল ছেড়েছেন; এখন আদিত্যর ছেলে-মেয়েদের পড়াচ্ছেন। দাদাভাইও বিচিত্র লোক; চান করেন না এবং দাঁত মাজেন না; কেউ মাজলে আপত্তি করেন; প্রমাণ দেখিয়ে বলেন জন্তু-জানোয়ারদের দাঁতে মানুষের চেয়ে অনেক বেশী জোর। হাতীর অত

বড় দাঁত !—টুথপেষ্টের প্রয়োজন পড়ে না কারুরই ; কাজেই দাঁত মাজার ফলেই মানুষের দাঁতের যত সাজা ! দাঁত মাজতে বলায় শুধু ডেন্‌টিষ্টদেরই স্বার্থ ; আর কারুর নয় !

দাদাভায়ের সব চেয়ে আপত্তি বাইরের কোন খাবার খাওয়ায় ; অথচ বড় হওয়া মাত্রই সবাই জানে যে মুখরোচক যা কিছু মুখে দেবার মত তা' সবই দোকানের খাবার ; আলু-কাবলী বাড়ীতে তৈরী করুন ; নিরাপদ, কিন্তু সেই 'টেষ্ট' হয় না কিছুতেই ! আলু-কাবলীওলারা একটা নর্দমার জল না কি দেয় 'টক' বলে তাতেই অমন অপরূপ সুস্বাদু হয় ওই সামান্য জিনিসই ! এবং সব খাবারওলাই যে ঠকায় তা নয় ; কোনও কোনও খাবারওলা তো জিজ্ঞেস করলে বলেই দেয়, বাসি কিনা ? ওদের পরিভাষায় সাত দিনের বেশি আগেকার হলে তবে বাসি'। তিন-চারদিন আগেকার হলে, একদম 'ফ্রেস', untouched by hands. কোনও কোনও এই রকম মুখরোচক খাবার বিক্রেতা, যেমন ঘুঘনিওলা কি জলকচুরীওলা তো সময় পর্যন্ত দিয়ে দেয়, কতক্ষণ বাদে অসুখ করবে ; শুধু কলেরা না এশিয়াটিক কলেরা হবে, পীড়াপীড়ি করলে তার পর্যন্ত আভাস দিতে দ্বিধা করে সামান্যই !

কেন, আমাদের ননীগোপাল এবং প্রহ্লাদ একদিন ভারতের বৃহত্তম মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে, কার সর্বনাশ করবার পর, খেতে গিয়েছিল দু'জনে ; একই দামে এক জনকে দিয়েছে চারটে, অন্য জনকে পাঁচটা আলুর দম ! সঙ্গে সঙ্গে প্রহ্লাদের প্রতিবাদ (সে-আবার কোন্ ইউনিয়নের মেম্বর !) : ওকে পাঁচটা, আমাকে—আমাকে 'চারটে' কেন দেওয়া হয়েছে আলু ? একটি বাচ্চা ছেলে দিচ্ছিল খাবারের প্লেট ; সে বলল : চারটে-চারটে করেই দেওয়া হয়েছিল দু'জনকে ; একটা পচা মত ছোট আলু ছিল বেশি, সেইটেই ··· ! সেই অতিরিক্ত আলুটা ননীগোপাল পুরো গেলেনি তখনও !

এই বাইরের একটি খাবার জিনিসের উপর দুর্দান্ত লোভ ছিল

দুর্গার এবং দুর্গার মার দু'জনেরই; চীনাবাদাম! এতে দাদাভায়ের আপত্তি ছিল প্রচণ্ড; কাজেই দাদাভাই বাড়ীর বাইরে গেলে, মনের সুখে চীনাবাদাম-ডালমুট কিনে খাব্‌লা-খাব্‌লা মুখে পুরতেন দুর্গার মা এবং দুর্গাও; একদিন দাদাভায়ের অনুপস্থিতিতে চলেছে সেই চানাচুর উৎসব; এমন সময়ে অসময়ে দাদাভায়ের প্রত্যাবর্তন এবং দুর্গা ও দুর্গার মা'র একেবারে সামনে পড়ে যাওয়া এবং হাতে-নাতে ধরা পড়া! দাদাভাই ঝাড়া আধ ঘণ্টা এই খাওয়ার কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন; বক্তৃতা দিতে দিতে দুর্গা এবং দুর্গার মা দেখলেন, দাদাভাই বলছেন ও..র সামনের প্লেটে-ঢালা ডালমুট একটা দুটো করে মুখে ফেলছেন!

ছেলে-মেয়ে হবার পর বেশী গোলমাল বাধত দুর্গার সঙ্গে আদিত্যর; রাতে কোন দিন লম্বালম্বি শুত দুর্গা; কোনও কোনও দিন আড়াআড়ি। যেদিন আড়াআড়ি শুত, সেদিন দুর্গার পা বেরিয়ে যেত খাট থেকে। ফলে পায়ের তলায় ছোট একটা টুল না দিলে বেরিয়ে-থাকা পা যেত ঝুলে; আর টুল দেওয়ার জন্যে মশারি থাকত ফাঁক এবং আদিত্যর পায়ে মশা কামড়াত যথেচ্ছ! ব..ার উপায় ছিল না। কারণ এ-কথা প্রত্যেক অবিবাহিত লোক.. ..ানেন যে, মশার কামড়ের চেয়েও বৌ-এর বাক্যের কামড়ে জ্বা.. ..ঢের বেশী! আদিত্য দে চুপ করে শুয়ে থাকতেন; একটু বাদে উঠ.. ..ছেলে ধনঞ্জয় এবং তার একটু বাদে মেয়েটাও! বাটিতে রাখা দুধ খেতে চাইত না ধনঞ্জয়; চার টাকা সেরের জল খাবে কেন সেই নবাবপুত্তুর! কাজেই আদিত্যকেই স্বয়ং সেই দুগ্ধপান করতে হত। সেই শীতের রাত্তিরে বরফ হয়ে যাওয়া দুধ যেই মুখে ঢালতে যাবে আদিত্য, সঙ্গে সঙ্গে শিশুপুত্রের জলবিয়োগ হত অকস্মাৎ। এবং ফোয়ারার মত সেই পবিত্র গঙ্গোদক এসে পড়ত দুধের বাটিতে। আদিত্য অন্ধকারে কি খেত আদিত্যই শুধু জানত!

ছেলে-মেয়ে ছাড়াও দুর্গা দু'টো বেড়াল পুষেছিল; তাদের মধ্যে

যেটা হুলো, সেটা শীতকালে রোজ রাতে মশারীর চালে চেষ্টা করত গড়ানোর। এবং মাঝ-বরাবর এলেই মশারির দড়ি যেত পটাং করে ছিঁড়ে এবং মশারি শুদ্ধ হুলো এসে পড়ত আদিত্যর বুকে। সেই মাঘ মাসের শীতের রাতে আদিত্যকে উঠে বাঁধতে হত মশারির দড়ি। রোজ এই একই কাণ্ড। কিন্তু আদিত্যর কোনও উপায় ছিল না কিছু বলবার। দুর্গার পোষা বেড়াল, তার গলায় আর যেই ঘণ্টা বাঁধুক আদিত্যের নিশ্চয়ই ছিল না অত সাহস। কিন্তু সেই নিরীহ গোবেচারা, দুর্গার অবলা অসহায় স্বামী আদিত্যের ধৈর্যের তো বটেই সাহসের সীমাও ছাড়াল। ওই যে দু'টো পোষা বেড়ালের কথা বলেছি, এই অঘটন ঘটাল তাদের বাচ্চাই।

আদিত্যর পিঠে ছিল মস্ত আঁচিল; রাত-জাগা অভ্যেস বলে আদিত্যর জোর-ঘুম শুরু হত ভোর হলে তবেই। সেই অঘোর নিদ্রায় নিঃশ্বাসের ওঠা-পড়ার তালে তালে পিঠের আঁচলটাও উঠত নামত। উত্থান-পতনের মাঝখানে এক দিন বেড়াল-বাচ্চাটা সেটাকে খেলার জিনিস মনে করে থাবাতে লাগল ক্রমাগতই! দু'তিন থাবার পরেই আদিত্যও তাকে ধরল এক থাবায়; ধরেই ছুড়ে ফেলল মাটিতে। ফেলবার মুখে আদিত্য চেঁচাচ্ছে: মারতে মারতে আজ তোকে—মেরে ফেলব, বলতে গিয়ে খেয়াল হল দুর্গা পাশে বসাই; সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন: মারতে মারতে আজ তোকে অজ্ঞান করে ফেলব ব্যাটা। এবং তার একটু বাদেই, বেড়াল-বাচ্চাটা আবার থাবার আনন্দে সেই আঁচিলটা নিয়ে ক্রীড়ারত এবং আদিত্য আবার—না, আবার নয়, এবারে বোধ হয় আদিত্যই অজ্ঞান।

আদিত্যর কথা যখন তুললাম, তখন ভালো করেই তোলা যাক! আদিত্যর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি না বেড়ে, বাড়তে লাগল বাতিক; আদিত্যর অন্যতম বাতিক হল, কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করা: কে বললে? সেই বাতিক ক্রমশঃ দেখা দিল মর্মান্তিক হয়ে; ব্রহ্মা-দিত্যকে আদিত্য জিজ্ঞেস করল: ব্রহ্মা খেয়েছ; ব্রহ্মা বলল: হ্যাঁ;

আদিত্যের প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে : কে বললে? ব্রহ্মাদিত্যর মেজাজ তখন সাঙ্ঘাতিক ঠাণ্ডা; তাই বোঝাবার চেষ্টাই করল সে: আমি বলছি, আমি খেয়েছি; আবার কে বললে, কী? কিন্তু ব্রহ্মাদিত্যও এক দিন আর পারল না; আদিত্য বাইরে থেকে বেড়িয়ে ঘরে ফিরেছে; ভেতরে ঢুকে সদর দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিল; খিল দিতেই খুট করে একটা আওয়াজ হল। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যর চীৎকার: কে? কে? ব্রহ্মাদিত্য ছিল পাশের ঘরে। বেরিয়ে এসে বলল: নিজের হাতে নিজে খিল দিলে। তারই তো আওয়াজ হল খুট করে; আবার সেই শব্দে নিজেই চেঁচাচ্ছ, কে-কে, বলে? আশ্চর্য! কিন্তু আদিত্য আশ্চর্য হয় না মোটেই! এরপরেও সে অবলীলাক্রমে বলে বসে আছে: কে বললে? এরপর সেদিন আদিত্য-ব্রহ্মাদিত্যে যা হয়, তা বোঝাবার জন্যে ত্রিভুবনে নেই অতীতে তার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতার আভাস মাত্রও!

মানুষের জীবন চিরকাল দুঃখে কাটালেও কখনও কখনও, সুখে কাটে না চিরকাল কখনই! আদিত্য-দুর্গার জীবনও হেসে-খেলে যেমন কাটছিল, ফাটল ধরল তাতে। কাটল না তেমন করে বেশী দিন! আরও যারা দুঃখ-কষ্টের দিনেও হাসে তাদের ওপর ভাগ্যের আক্রোশ হয় যেন ভয়ঙ্কর। যেমন নাকি আদিত্য। লোকটা সাঙ্ঘাতিক দুঃসময়েও নিশ্চিন্ত। একটা কিছু কি আর ভগবান করবেন না? ভগবান যদি নাও পারেন, দুর্গার ওপর ভরসা আরও অনেক; সে নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবে! তাইরে-নাইরে-না করে আদিত্যর দিন কাটে; রাত বাড়ে।

তবু দীর্ঘ দিন মা-ভাইদের সমস্ত দায়িত্ব বহন করা দুঃসহ হয়ে পড়ে দুর্গার! জমিদারী প্রায় গেছে; আগের আয়ের কিছুই নেই; খরচা অসম্ভব, দুর্গার বাবা এই সময়ে মুক্তি পেয়ে বাড়ী এলেন; দুর্গার মা মারা গেলেন ক'দিন পর! ছেলেদের নিয়ে উঠে গেলেন দুর্গার বাবা আলাদা বাসা করে; দুর্গারা ছেলে-মেয়ে নিয়ে উঠে এল বন্ধ

গলির অন্ধ কুঠুরীতে। প্রাসাদের মত 'পর্ণকুটীরে' একদিন জন্ম হয়েছিল দুর্গার। আজ সত্যিকারের সেইখানে এসে ঢুকল দুর্গা, যেখানে তার সত্যিকারের পর্ণকুটীরের চেয়েও অধম বাড়ীকে যারা প্রাসাদের চেয়েও বেশী মনে করে তেমনই মানুষেরা ছড়িয়ে আছে যার আশেপাশে। ব্রহ্মাদিত্য গেল জমিদারীতে; বাকী যেটুকু আছে ফুঁকে দেবার মহৎ কর্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে! বুড়ো বয়সে আদিত্য বেরুল চাকরী করতে; তার জীবনের প্রথম চাকরী। একশ' টাকা মাইনে আর একখানা অল-সেকশন মান্থলী ট্রাম টিকিট সম্বল করে; ছেলে আর মেয়েকে মানুষ করে তোলবার জন্যে কোমর বাঁধল দুর্গা। রান্নাঘরে ঢুকল হাতা-বেড়ী ধরতে! যাকে রান্না বলে তার কিছুই জানত না দুর্গা; একটি জিনিসই জীবন দিয়ে যা সে জেনেছিল তা হল: অপ্রয়োজনে কিছু না করা এক তারই সাজে, দরকারের দিনে যে করতে পারে সব!

যেখানে এসে বাসা বাঁধল আদিত্য আর দুর্গা, সেখান থেকেও উঠে যেতে হল; ভাড়া বড্ড বেশী; আগে লিখেছি ধাপে ধাপে দুর্গা নামল দারিদ্র্যের পাতালে; তা নয়; উন্নতি হয় ধাপে ধাপে; পতন হয় পিছলে পড়ে। তার ধাপ বলে নেই কিছু; স্বর্গ থেকে পাতালে এসে পড়তে সময় নেয় সামান্য; এমনি করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক মুখে যে রাস্তায় এসে আর বেরুতে পারল না আদিত্য, সেই রাস্তার একটা নাম ষ্ট্রীট-ডিরেক্টরীতে খুঁজলে পাওয়া যায়, কিন্তু যারা সেখানে থাকে তারা ছাড়া আর কারুর পক্ষেই বলা শক্ত সে-রাস্তা কোথা থেকে বেরিয়ে, কোথায় গিয়ে পড়েছে; সেই রাস্তা, যেখানে পথের কুকুরের সঙ্গে জায়গা নিয়ে মারামারি করে ঘরের মানুষ, সেই রাস্তার নামই হল: কানা ঘোষাল বাই লেন।

কানা ঘোষাল বাই লেনে প্রথম প্রবেশের ধিক্কার ভুলতে পারে নি আদিত্য। প্রথম রাত্রিবাসের রিক্ততা! সারাদিন তাকাতে পারে নি ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে; মনে হয়েছে সমস্ত অপরাধ বুঝি তারই!

দুর্গা শুধু তেমনই সংসার পেতেছে নতুন করে। এতটুকু বিকার নেই ! নেই কোন অনুযোগ। তেমনি করে সন্ধ্যেবেলায় স্নান করে উঠে কপালে পরেছে লাল সিঁদুরের টিপ। তেমনি করেই এনে ধরেছে চায়ের পেয়ালা মুখের সামনে ; হেসেছে ; গুন্‌গুন্ করে গান গেয়েছে ; রামের পাশে সিংহাসনে বসে যেমন দেখিয়েছিল সীতাকে, বনবাসে বুঝি তাকে মানিয়েছিল আরও বেশী !

সেই প্রথম রাত্রি ঘুমতে পারে নি আদিত্য ; কেঁদেছে পুরুষ মানুষ হয়ে ; দিনের পর দিনের অনুভূতি লিপিবদ্ধ করেছিল ডায়েরীতে, সেই ডায়েরী এক দিন আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর দেখতে দিয়েছিল সে ; কানা ঘোষাল বাই লেনের সেই প্রতিকৃতি সম্ভব নয় আর কারুর পক্ষে তেমন করে আঁকা, যে অমন করে না জীবনের রাজপথ থেকে ধাক্কা খেয়ে গিয়ে মাথা থুবড়ে পড়েছে হতাশার অন্তর্হীনতায়। সেই বর্ণনা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়, তাই তার ডায়েরী থেকেই তুলে দিলাম, সেই অনুচ্ছেদ। এর একটি লাইন আমার নিজের নয়। এর প্রতিটি শব্দ আদিত্যের। কারণ কানা ঘোষাল বাই লেনের কাহিনী একান্তভাবেই শুধু তারই কথা !

আদিত্য দে'-র ডায়েরী থেকে

…"মুখ গোল করে চাঁদ উঠেছে মধ্যরাত্রির মেঘবিরল আকাশে। ঘুমিয়ে পড়েছে কানা ঘোষাল বাই লেনের ভাঙ্গা বাড়ীগুলো ; সারা-দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর সবাই। এই অন্ধগলিতে কুকুর ঢোকে না, কিন্তু মানুষ শুয়ে থাকে নিশ্চিন্তে। গ্যাস বাতিতে আলো দিতে ভুলে গেছে ক্যালকাটা কর্পোরেশন। মেথর ডেকে আনতে হয় এ-গলিতে। জঞ্জালের আর বেড়ালের বমির আর গলা-পচা ইঁদুরের নির্যাস তখন বাতাসে ছড়িয়ে আমোদ করে। কানা ঘোষাল বাই লেনের ভাঙা বাড়ীর বাসিন্দাদেরও অসহ্য হয় যখন, তখন চাঁদা করে পয়সা জড়ো হয়, ডাক হয় মেথরকে, জঞ্জাল দূর হয় নতুন করে জড়ো

হবার জন্যে। মেথরদেরও অস্পৃশ্য মহা হরিজন এই কানা ঘোষাল বাই লেন।

রাতে তবু এক রকম। অন্ধকারে দেখা যায় না, মনে হয় না তেমন কিছু। বীভৎসতা কত সুন্দর হতে পারে তারই সাক্ষী কানা ঘোষাল বাই লেনের ভাঙ্গা বাড়ীগুলো। পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে, সূর্য তার আলো দিতে কার্পণ্য করে না নাকি কাউকেই ; তার কাছে ধনী-দরিদ্রে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু সে-সব বইতে শুধু এটুকুই লেখা আছে, লেখা নেই কানা ঘোষাল অন্ধ গলির কথা, থাকলে একথাও লিখতে হত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহর খাস কলকাতার শান-বাঁধানো বুকের কাছেই গলির মধ্যে সূর্যের আলো থমকে গেছে, বুঝি কোনও সাইন বোর্ড পড়েঃ trespassers will be prosecuted. তবু যেটুকু আলো বড় রাস্তার বুক থেকে চুইয়ে এই অন্ধ গলিতে পৌঁছয়, তাতে যদি দেখেন এই কানা ঘোষাল বাই লেনকে, তাহলে শিউরে উঠবেন আপনি। রাতের রঙে যে বারবনিতাকে দেখে দর করার কথা ভুলে গেছেন আপনি, প্রসাধন-পূর্ব দিনের আলোয় তাকে দেখে যেমন চমকে উঠতে হয় তেমনি। কানা ঘোষাল বাই লেনের গলিতে মলমূত্র পড়ে আছে যেন কিছুই নয়। নর্দমার জলে আর এঁটোর স্তূপে আর লেখার অযোগ্য জিনিসের জঞ্জালে পা-ফেলা খুব সহজ নয়। বাড়ীর গা-গুলো ফেটে গেছে, অনেক বৃষ্টির দাগে তার ইঁট পাঁজরা বার-করা গতর পান বসন্তের পর মানুষের মুখের মত ভয়াবহ। কোন এক কালে সেগুলি বাড়ী ছিলো ; বর্ষার দিনে এখন তার ভেতর জল জমে খোলা জায়গার চেয়ে বেশী। বড় রাস্তায় ট্রাক যায় ; আর কাঁপতে থাকে কানা ঘোষাল বাই লেন।

কিন্তু এই অন্ধ-গলির এ কোন পরিচয় নয়, সূচীপত্র মাত্র। যেমন তাজমহলের পরিচয় তার স্থাপত্যে নেই ; আছে অন্তরালের নাটকে। কানা ঘোষাল বাই লেনের কাহিনীও তেমনি পড়তে হবে তার বাসিন্দাদের মুখে। মানুষ কত নীচে নেমে পশুর চেয়েও কত অধম

হয়ে মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলে এখানে জীবন যাপন করছে, কার কাছে মানুষেরই কোন ক্ষমার অযোগ্য পাপের প্রায়শ্চিত করতে ; এ-গলির প্রত্যেক বাড়ীর গায়ে তার নম্বর আছে কিন্তু ঠিকানা নেই।

কানা ঘোষাল বাই লেনের কাহিনী বিশ্বাসের অযোগ্য। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার দেনা শোধবার লজ্জাকর অপেক্ষার ইতিহাস এত পঙ্কিল, এত কলঙ্কিত, এতই নির্মম যে সে কাহিনী কানে শোনাও বুঝি আরেক পাপ। সে কাহিনী লেখা কল্পনার অতীত এক ভয়াবহ শাস্তি। ভদ্রলোক কত ছোট হয়ে যেতে পারে জীবন-সংগ্রামের পেষণে ; মা মেয়ের সঙ্গে কী নীচ কলহে নামতে পারে এক বালতি জলের জন্যে ; ছেলে কত অনায়াসে যেন তার জন্মের অভ্যেস, থুতু দিতে পারে বাপের মুখে ; ভাই আর বোনের সম্পর্কে পরস্পরের ভাষার ব্যবহার কত দূষিত হতে পারে, কানা ঘোষাল বাই লেনের বাইরে যারা থাকে তারা কোন দিন খবর পাবে না তার ; খবর পাবে না বলেই ভাগ্যবান। মানুষের অধঃপতনের ইতিহাসের পাতা চোখের ওপর ওল্টাতে দেখে হয়ত আজ আর কারুর কষ্ট হয় না ; হয়ত মজাই পায় মানুষ ; তবুও কানা ঘোষাল বাই লেনে এক বার ঢুকলে, মজা দেখতে ঢুকলেও আর বেরুবার পথ খুঁজে পেত না তারা। কারণ এক দিন যারা এখানে এসেছিল, তারাও এসেছিল বড় রাস্তা থেকে। এসেছিল সাময়িক বিপর্যয়ের ঘূর্ণী ঝড়ে ; এসেছিল আর কোথাও বাড়ী মেলেনি বলে ; এসেই দু'দিন বাদে আবার চলে যাবে বলে। তার পর যাওয়া দূরে থাক, আরও বসে গেছে তারা ; বসে গেছে পাঁকে-কাদায় পঙ্কিলতার অতলে। কানা ঘোষাল বাই লেনে ঢোকবার রাস্তা আছে ; নেই বেরুবার পথ।

তবু আসে বই কি কেউ কেউ ! পোষ্টম্যান আসে নাকে কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে। চিঠি নিয়ে আসে ; মনিঅর্ডার আনে না যে কখনো-কখনো তাও নয় ; কোর্ট থেকে আসে পেয়াদা ; উঠিয়ে দেবার জন্যে বাড়ী থেকে ; ভাড়া দেয় নি কে বুঝি। কানা ঘোষাল বাই লেন

থেকেও উঠে যেতে হয় যাকে তার জায়গা যে কোথাও নেই, সে দার্শনিক তত্ত্বে আর যারই মাথা ঘামুক, কোর্টের পেয়াদা মালপত্তর রাস্তায় বার করবার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবনাও ছুঁড়ে ফেলে দেয়; যেমন করে সিগারেটের ছাই গায়ে পড়ে গেলে ঝেড়ে ফেলে দেয় গ্যাবাডিনের কোট! আরো কেউ কেউ আসে বৈকি! বালতি করে দুধের রংএর জল দিয়ে যায় গোয়ালা। খবর-কাগজগুলো ফেলে দিয়ে যায় কাগজ জানলা গলিয়ে। হকার না হয়ে সে রিপোর্টার হলে এখানকার খবর সে ফেলে দিতে পারত না; নিয়ে যেত সঙ্গে করে, চায়ের সঙ্গে যার পরিবেশন সকালের কাগজে পড়ে আপনি বলতেন: Interesting eh!"

কানা ঘোষাল বাই লেনে জীবন নেই; কারুর কারুর নেই জীবিকাও; কিন্তু জীবন-ধারণের জন্যে চিন্তা অনেক বেশী বোধ হয় সেই কারণেই! আদিত্য ভেবেছিল এবারে অন্ততঃ চালাতে পারবে সে; সংক্ষিপ্ত করে এনেছে সংসার; ব্যয়সংকোচ করেছে সম্ভাব্যের শেষ পর্যন্ত; নিজেরা না খেয়ে ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছে; তবু গোয়ালার তাগাদা; কয়লার বাকী। আদিত্যর দিদির একটা বাঁধা মাসোহারা ছিল জমিদারী থেকে প্রাপ্য; সে টাকা আদিত্যকে দিতে হত বরাবর; এখন জমিদারী নেই, কিন্তু মাসোহারা দিতেই হয়, তিনি উত্ত্যক্ত করেন টাকা না পেলে!

এরই মধ্যে, এই দুর্যোগের দিনে দুঃখের কালো মেঘে একমাত্র চাকরীটাই ছিল রূপালী রেখা। সেখান থেকেও এল অপ্রত্যাশিত আঘাত! এক সন্ধ্যেবেলা দুর্গা ঘরে ঢুকে চমকে গেল; আপিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় ছাড়েনি আদিত্য; মাথায় হাত দিয়ে বসে আসে।

: এ কী অলুক্ষণে কারবার? মাথায় হাত দিয়ে ভরসন্ধ্যেয় বসে নাকি কেউ—দুর্গা রাগ করে। 'চাকরী করলাম এতদিন; সেটাও গেলো আজ'—আদিত্য মুখ তুলে তাকাতে পারে না!

'তাতে মাথায় হাত দিয়ে বসার মত কী হয়েছে; আবার হবে আরেকটা।'

বিশ্বাস করতে পারে না, এ কী শুনল সে? আদিত্য তাকায় দুর্গার মুখের দিকে; এ মুখ কোনও মধ্যবিত্ত ঘরের বউ-এর: না, সিংহবাহিনী দুর্গার?

পনের

সেই দুর্দিনে প্রথম যা করল দুর্গা এবং শেষ যা করল দুই-ই দুঃসাধ্য। কানা ঘোষাল বাই লেনে ছিল যে-ক'দিন সে ক'দিন আদিত্যর চাকরী ছিল; চাকরী যাবার পর কানা ঘোষাল বাই লেনের বাড়ী ছেড়ে বড় রাস্তার কাছে একটা গলিতে চারখানা বড় বড় ঘরের প্রশস্ত বাড়ীতে দুর্গা এসে উঠল পুত্র-কন্যা-সমেত। চারখানা ঘরের দু'খানা ভাড়া দিয়ে দু'খানা ঘরে সংসার পেতে বসল সে। আদিত্যর সন্দেহ হয় দুর্গা পাগল না কি? কিন্তু পাগলের পক্ষেও এ-দুঃসাহস যে অসম্ভব! বাড়ী-ভাড়া দেবে কোথা থেকে? বাড়ী-ভাড়ার কথা পরে; হাঁড়ী চড়বে কোথা থেকে?

কোথাও থেকে আসবে না সাহায্য: ছপ্পড় ফুঁড়ে আসবে না টাকা। যদি বাঁচতে হয়, বাঁচতে হবে লড়াই করে। তাই আদিত্য যেদিন বলল: 'চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখি অন্য কোথাও!'—দুর্গা বলল: 'না'। 'তাহলে কী করব?' আদিত্যর জিজ্ঞাসা। 'মামলা',—দুর্গা সংক্ষেপে করল উত্তর। 'মামলা?' "হ্যাঁ, মামলা করতে হবে তাদের সঙ্গে যারা কোনও কারণ না দেখিয়ে ছাড়াতে চায় চাকরী থেকে; জানানো দরকার, 'যাও' বললেই চলে যাবার দিন গেছে আজ।"

'কিন্তু মামলা লড়বার টাকা?'—আদিত্য স্তম্ভিত।

যে ক'টি অলঙ্কার এখনও অবশিষ্ট ছিল দুর্গার, সব কটি আদিত্যর হাতে তুলে দিয়ে বলল: "বাঁধা নয়। বিক্রী করে দিয়ে এসো; অনেক টাকার দরকার।" গয়না হচ্ছে বড় লোকের মেয়ের অঙ্গের ভূষণ; কিন্তু অলঙ্কার মধ্যবিত্ত ঘরের 'বউ'-র অঙ্গের শোভা নয়; অস্ত্র! এতদিন অলঙ্কারের মূল্যে মূল্যবান হতে চেয়েছে মেয়েরা;

এই প্রথম একটি মেয়ের মূল্যে মূল্যবান হল সে; মূল্যহীনকে দুর্মূল্য করবার মন্ত্র জানে মধ্যবিত্ত ঘরের বউরাই। সেই পরশপাথর নিরাভরণ দুর্গাকে করল সোনার চেয়ে অনেক দামী।

সাহায্যের আবেদন করল না দুর্গা কারুর কাছে; হাত পাতল না; জ্যোতিষীর কাছেও নয়। কোন্-গ্রহ কুপিত, আর কোন্ পাথর পরলে পাথর-চাপা কপাল খুলবে, জানতে চাইল না সে। স্ত্রীলোক হয়ে সে নির্ভর করল পুরুষকারের ওপর। পুরুষকার নয় পুরুষের অর্থহীন দম্ভ; পুরুষকার নারীর শক্তি; যে-শক্তির সামনে 'গ্রহ' সরে দাঁড়ায়; 'দৈব' করে দেয় পথ। সেই পুরুষকার সম্বল করে দুর্গা এগুল দুর্বার বেগে; দুর্গতিনাশিনী নয়; দুর্গতিহাসিনী। *সমস্ত দুর্গতিকে হেসে উড়িয়ে দেবে দুর্গা।* *'সিংহবাহনে' নয় শুধু;* *সিংহবিক্রমে!*

তেত্রিশ কোটি দেবতা আমাদের; তার চেয়ে বেশী শাস্ত্র; তারও চেয়ে বেশী উপদেশ দেবার লোক; এমনই একটি অমূল্য হিতোপদেশ হচ্ছেঃ যদি এমন কোনও দিন আসে যেদিন তোমার পায়ে নেই একজোড়া জুতো, সেদিন দুঃখ কোর না তার জন্যে; বরং এই ভেবে সান্ত্বনা পেও যে এমন অনেক আরও অভাগা আছে যার 'পা' ও নেই। এ-যে কী বিচিত্র স্তোকবাক্য এবং কতদূর মিথ্যা আত্মছলনা, তা বোঝা যায় তখনই, যখনই মনে হয়, তা কেন হবে?— বরং যার পা নেই, তার পা কেমন করে জোড়া লাগে, সেই সঙ্গে জোগাড় হয় তোমার পায়ে একজোড়া জুতো, এই চিন্তাতেই তো সত্যিকারের মুক্তি! মুশকিল-আসান আসলে!

একেক সময় মনে হয় এদেশ আমাদের হয়ত আসলে দেশ নয়; আগাগোড়া শুধু 'উপদেশ'! এখানে আমাদের থাকা 'বাসের' জন্যে নয়, শুধু 'উপবাসের' জন্যেই বুঝি!

একটি মুহূর্ত দেরী করল না দুর্গা; দ্বিধা করল না একবারও। মেয়েকে বললঃ "পড়া নয় আর, এবারে পড়াতে হবে।' ছোট-

দু'টি ছেলেমেয়েকে পড়াবার কাজে পাঠাল মেয়েকে; কাজটা জোগাড় করল দুর্গাই। বড় রাস্তার ওপরই ঘোষালদের বাড়ী; বাড়ী নয় প্রাসাদ। তাদেরই বাড়ীতে দুর্গা গেল একদিন। বলল, স্বামীর চাকরীর কথা। ঘোষাল জানতেন, দুর্গাকে; কার মেয়ে। তিনি প্রস্তাব করলেন আদিত্যর নূতন কোন চাকরীর ব্যবস্থার। দুর্গা বলল: 'না; এখন নয়; এখনও চাকরী ছাড়তে দিইনি ওঁকে; ওরা জবাব দিয়েছে চাকরীতে; কিন্তু আমাদের দাবীর জবাব দেয় নি এখনও। হারব কি জিতব, জানি না। মামলা লড়তে হবে, শুধু এই জানি। তার পর সব চুকে গেলে যদি নূতন চাকরীর দরকার হয়, তখন আসব আপনার কাছে।' ঘোষালকে এই কথা বলল দুর্গা আর তার নাতি-নাতনীদের পড়াবার কাজটা চাইল মেয়ের জন্যে। ঘোষাল জিজ্ঞেস করলেন: আপনার মেয়ে? তার বয়স কত?' দুর্গা বলল: 'বয়স যাই হ'ক, সে পারবে।' ঘোষাল: 'পারবে নিশ্চয়ই; আপনার মেয়ে হলে, সে সব পারবে।' ঘোষাল মিথ্যে করে বানিয়ে বলেন নি' সত্যি স্তম্ভিত হয়েছিলেন তিনি। পর্ণকুটীর থেকে তিনি এসে উঠেছেন প্রাসাদে। আর দুর্গা প্রাসাদ থেকে নেমেছে পর্ণকুটীরে; তবুও দুর্গা দুর্গাই; দুর্গত নয়! শিব ভিক্ষে করছে এক মুঠো অন্ন; কিন্তু শিবানী? সে তখনও অন্নপূর্ণা!

অর্থ নাকি সমস্ত অনর্থের মূল; হবেও বা।

তবু অর্থ শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করে একটা 'মূল'; কিন্তু অর্থের অভাব? সে শুধু জানে 'নির্মূল'। আর অর্থের অধিকারীর মুখেই শুধু মানায় ও-কথা; অর্থ রোজগারে যে অসমর্থ, তার মুখে অমন কথা, শেয়ালের মুখে আঙুর ফল টক মনে হবার মতই। ভোগ যার হয়েছে সেই তো বলবে ত্যাগের রহস্য।

শুকদেবকে তাঁর পিতা শেষ উপদেশ শুনতে বলেছিলেন রাজা জনকের কাছে। শুকদেব অসন্তুষ্ট হলেন; জন্মমাত্র অধিগত হয়েছেন তিনি সকল বিদ্যা; আভাস পেয়েছেন, সমস্ত বিদ্যার অতীত যা,

তারও। তবু শেখবার আছে? তবু জানবার রয়েছে বাকী? তাও ভোগী রাজার কাছে?

রাজা জনকের কাছে উপদেশ নিতে গেলেন শুকদেব। রাজা তাঁকে প্রাসাদেই থাকতে দিলেন; বললেন: সময় হলে দেবেন। কিন্তু সময় আর হয় না। মনে মনে হাসেন শুকদেব; তাচ্ছিল্যের হাসি; দম্ভের অট্টহাসি। রাজা, সে সুখ ছাড়া জানে না আর কিছুরই রহস্য, সে দেবে শুকদেবকে সুখ-দুঃখাতীতের সন্ধান!

তার পরে একদিন আগুন লাগে রাজপ্রাসাদে। অগ্নিশিখা স্পর্শ করে আকাশ; কিন্তু শুধু কি আকাশ? স্পর্শ করে তার উত্তাপ ধ্যানমগ্ন শুকদেবকেও, ধ্যানভঙ্গ হতেই দৌড়ে আসেন রৌদ্রে শুকতে দেওয়া একমাত্র সম্বল একটি কৌপীন বাঁচাতে; দৌড়ে আসতে-আসতেও দাঁড়িয়ে যান; রাজা জনককে দেখতে পান; প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে হাসছেন রাজা জনক। মুহূর্তে সূর্য-প্রদক্ষিণের কক্ষপথে এগিয়ে যায় পৃথিবী আরেকটু। শুকদেবের সামনে খুলে যায় নূতন পৃথিবীর দরজা; দেখতে পান তিনি; সামান্য একটি কৌপীন; তাই বাঁচাতে তাঁর অনন্ত ব্যাকুলতা। আর, রাজপ্রাসাদ পুড়তে দেখে রাজা জনকের অসীম ঔদাস্য। শুকদেব প্রণাম করেন জনককে, যা জানবার তা জানা হয়েছে এবং সে কথা কার কাছে জানবার, জানা হয়েছে তাও। হেল্‌থ ইস্‌ ওয়েল্‌থ নয়; ওয়েল্‌থ ইস হেল্‌থ। হেল্‌থ গেলেও তখনও থাকে ওয়েল্‌থ। ওয়েল্‌থ গেলে থাকে না হেল্‌থও।

শুধু ছেলেকে কোনও কাজ দিল না দুর্গা। দিতে পারত; দেওয়া দরকারও ছিল হয়ত। ছেলে চেয়েও ছিল পড়া ছেড়ে দিয়ে যে-কোনও কিছু করে দুর্দিনে সংসারের কাজে লাগতে; কিন্তু দুর্গা বলল, না, সংসারের অবস্থা একদিন আবার স্বচ্ছল হবে; কিন্তু পড়া একবার ছেড়ে দিলে, আর হবার নয়। আর দুর্গা-আদিত্যের ভবিষ্যৎ না থাকলেও ছেলের ভবিষ্যৎ আছে। যেমন করেই হ'ক দিন চলে যাবে তাদের, কিন্তু ছেলের পড়া অসমাপ্ত থাকলে তার দিন না চলবার দিন

আসবে একদিন ; তাই দুর্গা গান শেখাতে আরম্ভ করল নিজের বাড়ীতে বসে ; পরের বাড়ীতে গিয়ে স্বামীর জন্য নিয়ে এল প্রুফ দেখার কাজ ; ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলের টেক্স্ট বই লিখে দেবার কাজ। এ-ব্যাপারে খুব সাহায্য করলেন ঘোষালরা। তাঁর এক বন্ধুর বই-প্রকাশের বিরাট ব্যবসা। তিনি বলে ঠিক করে দিলেন। বিপদ কখনও একা আসে না ; আসে আরও বিপদ সঙ্গে নিয়ে। বিপদের দিনে যে দাঁড়াতে চায় নিজের পায়ে, তার সাহায্যও আসে একজনের কাছ থেকে নয় ; চতুর্দিক থেকে ; বহুজনের কাছে থেকে বহুভাবে আসে তার পাথেয়। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় বসে হারেন রাজ্য, রাজপ্রাসাদ ; মেনে নেন নির্বাসন ; তার পর বিবস্ত্র হবার মুহূর্তে দ্রৌপদীর লজ্জা হরণ করতে আসেন কৃষ্ণ ; দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপানের প্রতিজ্ঞায় উদ্‌বুদ্ধ হন ভীম ; সূচনা হয় ভবিষ্যৎ ধর্মযুদ্ধের। ক্লীবতার অবসান হয় ; শঙ্খের মুখে শোনা যায় ঘোষণা ; সম্ভবামি যুগে যুগে !

কবি লিখেছিলেন, সে কোন্ কালের কথা—'আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে।' আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালী বাঙালী নেই আর, সে 'কাঙালী' ; সে বঙ্গে বাস করে না, উপবাস করে। প্রাদেশিকতা হলে নাচার ; 'সত্য' কিন্তু প্রাদেশিকতার চেয়ে বড় ; তাই বলতেই হয় খোদ 'বঙ্গে' বাঙালীর যা হাল, বাঙলার বাইরে, বিহার কি আসামের কথা বলছি না, কারণ তা আসলে বঙ্গদেশ থেকে বুদ্ধিবলে বিচ্ছিন্ন মাত্র ; বোম্বায়ে কি মাদ্রাজে কি দিল্লীতে, কি উত্তর প্রদেশে কিম্বা পাঞ্জাবে, বোধ হয় বাঙালীরা এত অসহায় নয়।

রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন :

> সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
> রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি।

আমরা আজ ততই বলব :

> 'মানুষ' করেছ হায় 'বাঙালী' কর নি।

যে-ক'টি বাঙালী এখনও আছে, মানুষ না হলেও চলবে তাদের কিন্তু এখনও 'বাঙালী না হতে পারলে আর রক্ষে নেই।'

অ্যাটর্নীর বাড়ী নিজেই গেল দুর্গা। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার পর অ্যাটর্নী বললেন: 'কিন্তু এ যে অনেক টাকা খরচের ব্যাপার! তা ছাড়া সময়ও লাগছে সাজ্মাতিক।' দুর্গা তাঁকে গয়না বিক্রি করে টাকার আয়োজনের কথা বলল; আরও বলল যে যত সময়ই লাগুক, শেষ পর্যন্ত দেখে সে তবে ছাড়বে।

অ্যাটর্নীর চিঠি পেয়ে আদিত্যের অফিস থেকে উত্তর এল এই মর্মে যে তারা বাকী মাইনে দিয়ে মিটিয়ে ফেলতে রাজী আছে; কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেবে না আর লিখিয়ে নেবে যে এর পর আদিত্য চাকরীর ব্যাপার নিয়ে পারবে না এতটুকু গোলমাল করতে। অ্যাটর্নী দেখাল সেই চিঠি দুর্গাকে। দুর্গা বলল: না। চাকরী থেকে ছাড়ান হল কেন, এইটে প্রথম জিজ্ঞাসা। দ্বিতীয় প্রশ্ন: ক্ষতিপূরণ না দেবার যুক্তিটা কী, যখন এতে একজনের চরম ক্ষতিই করা হচ্ছে।'

অ্যাটর্নী অবাক হলেন। বললেন: 'সাধারণ-অসাধারণ সমস্ত লোক ভয় পায় কোর্টকে; মামলা লড়ে সর্বস্বান্ত হবারই শুধু অজস্র, অফুরন্ত উদাহরণ, অ্যাটর্নী পাড়ায় পাছে ঢুকতে হয় বলে অনেকে ন্যায্য দাবীও করে পরিত্যাগ; কোর্ট-ঘর করতে আসামীর চেয়ে ফরিয়াদীর আশঙ্কা অনেক বেশী; আর মধ্যবিত্ত ঘরের বউ হয়ে কোন্ সাহসে আপনি মামলা লড়বার ভরসা করেন বিত্তবান্‌দের সঙ্গে?'

দুর্গা জবাব দিল না, হাসল।

সেই হাসিই বলে দিল: অন্য লোকের ক্ষতি করার জন্য যে মামলা করে সে যেমন অন্যায় করে, তেমনি নিজের দাবী আদায় করবার কাজে শান্তিভঙ্গের ভয় যে করে মামলা লড়তে, অন্যায় করে সে-ও। অশান্তির ভয়ে যে সর্বদাই গা বাঁচায়, শান্তি পায় না সে কোন দিন! শান্তি, অক্ষম ক্লীবের নয়; শান্তি—নীলকণ্ঠ শিবের।

মানুষের কাজ দিয়ে হয় মানুষের চরম বিচার ; কাজের উদ্দেশ্য দিয়েই তার প্রতি তার স্রষ্টার শেষ রায় ; 'কি করেছে' নয়, 'কেন করেছে',—সেই হল বিচারের ভিত্তি !

বহু শতাব্দী আগের বাংলা : যে-বাংলায় মানুষ মারী নিয়ে ঘর করত ; মন্বন্তরে মরত না। বাঙালীরা যখন সাপ নিয়ে খেলা করতে ভয় পেত না ; বাঘের সঙ্গে বাঁচত যুদ্ধ করে ! সেই বাংলার দুর্ধর্ষ এক ডাকাত। কত মহাপুরুষের পায়ের ধুলোয় পবিত্র মাটি যে তার হাতে নিহত মানুষের রক্তে হয়েছে রাঙা-মাটি, কে বলবে সে-কথা ? নির্দয় সেই ডাকাত ; হরণ করা তার কাজ। ভাগ্যের পরিহাসে একদিন তারও হৃদয় হরণ করল এক মেয়ে। মানুষের দেওয়া শাস্তির ভয় নেই যার, মহামানুষের শাস্ত্রে কর্ণপাত করে না যে, তার কলঙ্কিত জীবনকে নূতন করে রচনা করবার কাজ নিল সাধারণ সেই এক মেয়ে ; রূপ দিয়ে সে ভোলাবে না, ভালোবাসায় ভোলাবে। কিন্তু হৃদয় হরণ করলেও ডাকাতকে গ্রহণ করল না সে। ডাকাত অবাক হয়ে দেখল মানুষকে ঘৃণা করে সে আর কতটুকু নির্দয় হতে পেরেছে , মানুষকে ভালোবেসে কত নিষ্ঠুর হওয়া যায় তারই অভিজ্ঞতা হল এই প্রথম। মেয়েটি বলল, হত্যার পর হত্যা যার জল খাওয়ার মত সহজ হয়ে গেছে তাকে ত্যাগ করতে হবে হত্যা, লুঠতরাজ, খুন-জখম। প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনে মনুষ্যরক্তে রঞ্জিত করবে না মাটি !

শুধু প্রতিজ্ঞা নয় ; প্রতিজ্ঞা-রক্ষার চাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; বাড়ীর সামনের মাঠে পুঁতে দিল একটা বাঁশ ;—সেই মেয়েটা আরও বলল : এই বাঁশে যেদিন ফুল ফুটবে, সেদিন বুঝব ব্রত উদ্‌যাপন করেছ তুমি ; সেদিন আসবে আমার কাছে ; সেদিন ফেরাব না তোমাকে আর !

কি কঠিন প্রতিজ্ঞা ! কি দুশ্চর তপস্যা ! কি আশ্চর্য ব্রত !

নররক্তের আস্বাদ পেয়েছে বাঘ ; আর তারপর সামনে দিয়ে

নিরস্ত্র মানুষকে যেতে দেখেও গুটিয়ে বসতে হয়েছে থাবা। বিষ ঢেলে দেবার মন্ত্রে যার জন্ম, সেই কেউটে খোঁচা খেয়েও তুলছে না ফণা!

দিন যায়; রাত্রি যায়। সূর্য ওঠে এবং ডোবে। শীত যায়; বসন্ত আসে। ন্যাড়া গাছটাতেও বুঝি বোবা কান্না ফুল হয়ে ফুটতে চায়; শুধু বাঁশ—তেমনি মরা বাঁশ,—সেখানে নেই কোন ফুলের প্রত্যাশা। তবু অপেক্ষা করে ডাকাত। করাঘাত করে তার ভালোবাসার সেই একমাত্র প্রিয়ার বাড়ীর দরজায়। দরজা খোলে না; মেলে না ছাড়পত্র।

তারপর একদিন ভুল হয়ে যায় সব। অরণ্যনিশীথে বরযাত্রীরা পার হচ্ছে পথ; সঙ্গে বর আর নববধূ। একদল ডাকাত পড়ে বরযাত্রীদের ওপর। লুণ্ঠন করে; অপহরণ করে। তবু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভালোবাসার কাঙাল সেই দুর্ধর্ষ ডাকাতটা দেখেও কিছু বলে না। তারপর যখন সবাই পলাতক, বধূটিকে একা ফেলে, তখন তার ওপরেও অত্যাচারে প্রলুব্ধ হয় ডাকাতরা,—তখন আর পারে না সে। এতদিনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মুহূর্তে; বিস্মৃত হয় দিনরাত্রির প্রতীক্ষা; বিস্মৃত হয় বুঝি প্রিয়াকেও। হত্যা করে ডাকাতদের।

মানুষের রক্তে রঞ্জিত হাত নিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় মেয়েটির ঘরে। হাউ-হাউ করে কাঁদে ডাকাত। কী হয়েছে?—মেয়েটির বিস্ময় কাটে না।

ডাকাত বলে: এতদিনের প্রতিজ্ঞা আর অপেক্ষা সব চূর্ণ হয়ে গেছে; আশা গেছে বিচূর্ণ হয়ে; প্রিয়া মিলনের মধুর প্রতীক্ষা হয়েছে ব্যর্থতায় বিষাক্ত।

ডাকাতকে তুলে ধরে তার ভালোবাসার রমণী। রমণীয় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে তাকে। রাত্রি প্রভাত হয়। ডাকাতকে দেখায় দূরে মাঠের মধ্যে পোঁতা বাঁশের মাথায় ফুটেছে প্রথম ফুলের গুচ্ছ।

ফুল নয় কবির গান। 'আমার মল্লিকা বনে যখন প্রথম ধরেছে কলি।'

প্রথম মাইনের টাকা মেয়ে যখন দুর্গার হাতে এনে দিল সেদিন মা আর মেয়ে দু'জনেই কাঁদছে; দুঃখে এবং আনন্দে। দুর্গার মেয়েকে চাকরী করে এনে সংসার চালাতে হবে,—এত দুঃখ রাখবার জায়গা এত বড় দুনিয়াতেও দুর্গার কোথায়? দুর্দিনের চরম মুহূর্তে কারুর কাছে হাত না পেতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার প্রথম পুরস্কার, তার চেয়ে বড় পাথেয়ই বা সংসারের কজন পায়? একদম তলার লোক যারা, যাদের আমরা কুলি মজুর বলি, তারাও স্বামি-স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সবাই মিলে রোজগার করে; জমিদার-বাড়িওয়ালাদের বাড়ীর ছেলে মেয়ে কারুরই রোজগার করতে হয় না; তাদের un-earned income জমিদারী উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী-ভাড়ার নূতন 'রাস্তা' থেকে আসছে; বাড়ীভাড়া বন্ধ হলে আসবে আরও নূতন কোন পথ ধরে; শুধু মধ্যবিত্ত, তারা ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়; তাই তাদের গৌরব করবার মত কিছুই নেই; কিন্তু তাদের লজ্জা অশেষ। মুসলমান পরিবারের স্বল্পবিত্ত সংসারেও মেয়েরা কাগজের ঠোঙ্গা তৈরী করে বাজারে বিকয়; হাঁস মুরগী পোষে, তাদের ভালোবেসে নয়, তাদের ডিম বিক্রী হলেও দু'পয়সা আসবে বলে।

জানি, একথা শুনে হাসবার লোকের অভাব হবে না, মাথা নেড়ে বই খুলে, পাতা খুলে তারা বুঝিয়ে দেবে, 'অর্থনৈতিক ইন-ইকুলিব্রিয়াম' এবং আরো অনেক দাঁতভাঙ্গা বচন ঝেড়ে, তেড়ে আসবে; বলবে: দু'টো ডিম বেচে আর ঠোঙ্গা বিক্রী করে যদি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হত, তাহলে আর 'ইক্‌নমিক্স' হত না এম-এ-র পাঠ্য। পুরানো সামাজিক কাঠামোর শেষ ঠেকো দেবার জন্য বেঁচে-থাকা মুমূর্ষুরা বলবে: বাড়ীর মেয়েরা কাজে বেরুলে, সংসার চলবে কোথা থেকে? কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা বাড়ীতে বসে থাকলে যে পাওনাদাররা বাড়ী অবধি এসে বাড়ীর ফার্ণিচার পর্যন্ত এগিয়ে থামবে না, দ্রৌপদীর শাড়ী পর্যন্ত ধরে টান দেবে, যারা হাসবে তারা

এসব কথা ভাববে না বলেই হাসবে; ভাবলে অবশ্য তাতে হাসি শুকিয়ে যাওয়ারই কথা!

শুধু মেয়েই নয়, ছেলেও চমকে দিল, পড়ার খরচা আর দুর্গাকে চালাতে হবে না; পরীক্ষার খাতাই স্কলারশিপের মাধ্যমে জমার খাতায় সঞ্চয় বাড়িয়েছে; মাইনে তো মাপই হয়েছে; বই কেনবার নিদারুণ সমস্যাও হয়েছে সহজ। সেই খবর যেদিন দুর্গাকে প্রণাম করে ছেলে দিল, সেদিনকার দৃশ্যের তুলনা বিরল। বিদ্যাসাগরকে বুঝি এমনি করেই তাঁর মা একদিন মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। বিদ্যা থাকলেই বিদ্যাসাগর হওয়া যায় না; বিদ্যাসাগরের মায়ের জন্যই সম্ভব হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' হওয়া! দুর্গাকে প্রণাম করতে করতে তার ছেলের মনে হল, মাতৃ প্রণাম আর দুর্গাপূজা,—এ দুই তো একই।

এরই মধ্যে একদিন আদিত্যকে পাঠিয়েছিল দুর্গা, একজন ডাক্তারের কাছে তার চাকরীর ব্যাপারে কয়েকটা সুবিধের জন্যে; যাঁর কাছে পাঠিয়েছিল, তিনি শুধু ডাক্তার নন, দেশের ও সমাজের এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না, যেখানে না ছিল তাঁর প্রভুত্ব। চাকরীর ব্যাপারে মামলা লড়তে গিয়ে একটা জটিল পরিস্থিতি সহজে এড়াবার জন্যেই দুর্গার পরামর্শে আদিত্যর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। ডাক্তার সব শুনে বললেন, 'এ-বিষয়ে আমি তোমার সাহায্যে আসব না; কিন্তু এর চেয়ে ঢের বড় উপকারে লাগব।'

আদিত্য অবাক হয়ে যতক্ষণ ভাবছে, ততক্ষণে তিনি একটা চিঠি লিখে খামে ভরে দিয়েছেন তার হাতে। চিঠি পড়ে আদিত্য উঠে দাঁড়িয়েছিল, ফের বসে পড়ল। যক্ষ্মা-হাসপাতালে অবিলম্বে তাকে ভর্তি করে নেবার সুপারিশ।

ডাক্তার তখন সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বোধ হয় বললেন: 'ভয় পাবার মত নয়; মনে হচ্ছে একেবারে আরম্ভের ষ্টেজ; এখন বিশ্রাম আর চিকিৎসা পেলে সেরে যাবে, আরও দেরী করলে মারাত্মক হতে পারত।'

যক্ষ্মা! শুনে সবাই ভয় পেল। শুধু দুর্গা ছাড়া। সে বলল: "সময়ে জানা গেছে এই তো সব চেয়ে বড় কথা। জানা গেছে বলে এখন ক'দিন ভয় হলেও, জানা গেছে বলেই বাকী জীবন নিশ্চিন্ত হবার আশা; পরে জানা গেলে, দু'দিন আরও নিশ্চিন্তে কাটান যেত বটে, কিন্তু বাকী জীবন হত বে-ভরসা।'

সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করল দুর্গা; স্বামীকে দিয়ে এল হাসপাতালে। তদারক, সেবা এবং সান্ত্বনার ভাষায় আদিত্যকে চাঙ্গা করে তুলতে তার একটুও দেরী লাগবে না, এই ভরসাতেই হাসপাতালে শুয়েও তার স্বামীর মনে হল হাসপাতাল থেকে যেদিন সে বেরুবে, সেদিন সে আর এই নবযৌবন নিয়ে বেরুবে না হয়ত; নবজীবন নিয়ে বেরুতে পারবে নিশ্চয়ই।

স্বামীকে সান্ত্বনা দিলেও দুর্ভাবনায় পড়ল দুর্গা। টাকার অভাব মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে; অভাবের চেহারাকে লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই। ঘরে বসে আদিত্য যে কটা টাকা আনছিল তা-ও বন্ধ হতে বাস্তবিকই বিপদে পড়ল দুর্গা। যা করবে না [illegible] ছিল কিছুতেই, দুর্ভাগ্য যেন আক্রোশবশতঃই দুর্গাকে দিয়ে তাই করাবার জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ছেলেকে কাজে লাগাতে হল। পড়া বন্ধ করে নয়, পড়ার পর অতিরিক্ত পরিশ্রম হবে জেনেও [illegible]তে একটা পার্ট-টাইম কাজে ছেলেকে দিতে বাধ্য হল দুর্গা। ছে[illegible]ও হাসিমুখেই এগিয়ে গেল; যেন এত দিনে সংসারের কাজেও লাগতে পারবে জেনে বেঁচে গেল সে। হাল্কা হল তার মন। পারিশ্রমিক নয়; এ-ও যেন তা[illegible] মনে হল জীবনের পা[illegible]মিক,—জীবন-যুদ্ধের পুরস্কার।

[illegible] ভারী হয়ে বসল দুর্গার বুকে দুশ্চিন্তার পাথর। [illegible] আশঙ্কা [illegible]াই হল; অসুখে পড়ল ছেলে। কঠিন অসুখে। মৃত্যু-[illegible]ও ডাক্তার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন সেবার ব্যাপারে: [illegible] নিপুণ হাতে শুশ্রূষা ছাড়া ছেলেকে বাঁচান শক্ত হবে। [illegible]র্তি করতে চাইলেন।

কিন্তু না, দুর্গা দেবে না হাসপাতালে; স্বামীকে দিয়েছে, তার কারণ 'যক্ষ্মা।' স্বামীর থেকে ছেলে-মেয়েরও হতে পারে; বাড়ীতে রাখলে আদিত্যকে, তা হত বুদ্ধিমতীর অযোগ্য অবিবেচনা; চরম হঠকারিতা। কিন্তু সেবা যেখানে সর্বপ্রথম বিবেচ্য, সেখানে কোন্ দুঃখে নিজের ছেলেকে দেবে পরের হাতে? কোন্ নার্সের নৈপুণ্য হবে মায়ের পরম পুণ্যকর্মের চেয়েও বড়?

সমস্ত রাত্রি ধরে নিদ্রিত কি মৃত বোঝা যায় না, পুত্রকে কোলে নিয়ে জেগে রইল মা। জীবনকে ফাঁকি দিতে পারে যম, কিন্তু মৃত্যু কি ডিঙোতে পারে মায়ের পাহারা?

নিদ্রিত ছেলের মাথা কোলে নিয়ে বিনিদ্র দুর্গাকে দেখে ভেসে ওঠে আরেক মায়ের কথা। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন আর সবচেয়ে প্রিয় সম্বন্ধ; ছেলে আর মায়ের সেই কাহিনী, কত শ' বছর আগের কে তার খবর করবে? স্মরণাতীত এক কালের অবিস্মরণীয় এক [illegible]না।

ছেলে বড় হয়ে ভালোবেসেছে এক তরুণীকে; তাকে [illegible] করে কথা দিয়েছিল সেই তরুণ, যে তার প্রিয়ার পায়ে দিতে [illegible]র সে সমস্ত পৃথিবী; দিতে পারে সে সব। সেই কথাই আ[illegible] দিন, আরেক রমণীয় সন্ধ্যায় মনে করিয়ে দিয়ে বলেছে রমণী: "[illegible]ন তো আমায় সব দিতে পার; পার, তোমার মায়ের হৃৎপিণ্ড [illegible]ড় এনে দিতে আমার হাতে?"

কী বীভৎস পরিহাস! তবুও তাকে সত্য বলে স্বীকার করেছে প্রেমিক। মাকে হত্যা করে উপড়ে নিয়ে চলেছে মায়ের হৃৎপিণ্ড প্রিয়ার উদ্দেশে। মেয়েটির বাড়ীর দরজায় ছুটতে-ছুটতে গিয়ে পৌঁছেছে। চৌকাঠে পা লেগে পড়ে গেছে সে যখন, তখন হঠাৎ যেন মনে হয়েছে, হাতে-ধরা তার সেই মায়ের হৃৎপিণ্ড যেন তাকে বলছে 'বাছা, লাগল?'

সে কোন্ কাল যার কণ্ঠ থেকে এসেছে এই অপূর্ব স্বর। [illegible]র অপরূপ প্রতিধ্বনি তুলেছে, হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস' গ্রন্থে[illegible]।'

জানি না ; শুধু এইটুকু জানি, 'মা' সকল কালে, সকল যুগে এমনই 'মা'। অনুক্ষণ ঘুরে চলেছে মহাকালের চাকা ; চক্রবৎ পরিবর্ত্তন ঘটেছে মানুষের ভাগ্যের ; পৃথিবীর গায়ে লেগেছে নূতন রং ; সূর্যের পানে ছুঁড়ে দেওয়া এ-মাটির ঢেলার গায়ে লেগেছে কত মানুষের বিচিত্র আলিম্পন ; শুধু 'মা' তেমনই 'মা' আছেন। কত দেশের কত লোক কত ভাষায় ডেকেছে তাকে, ইয়ত্তা আছে কি তার ? কিন্তু মায়ের জবাব সেই এক : 'বাছা, লাগল ?'

মৃত্যু-মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল ছেলেকে দুর্গা। অসুরের থাবা থেকে সিংহকে। দুবন্ত ছেলে মায়ের কাছে তাই শান্ত ; দুর্দান্ত সিংহ তো তাই দেবীর সিংহাসন।

আদালতে সাহেব-বিচারকের সামনে দাঁড়িয়েছে দুর্গা। চাকরীর মামলায় সব চেয়ে বড় সাক্ষী তার স্বামী অসুস্থ। সময় চেয়েছে আর বলেছে, আইনকানুন সে জানে না ; তদারক তদ্বির কিছুই নেই। সাক্ষী সাবুদ আনা, উকিল ব্যারিষ্টারের খরচা জোগান, সবই তার দুঃসাধ্য জেনেও, সে যে মামলা করেছে, সে শুধু এই কারণে নয় যে তার স্বামীর প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে মাত্র ; বরং প্রমাণ করতে যে, অন্যায় যে করে তার চেয়ে ঢের বড় অপরাধ সে করে, যে মেনে নেয় সেই অন্যায়কে।

সাহেব বিচারক সময় দিলেন। আর কলম হাতে অনেকক্ষণ ভাবলেন, বাঙালী মেয়ে এমন ইংরেজী শিখল কোথা থেকে ! সাহেবরা বাংলা দেশে আসে, বাংলা দেশকে জানবে, এ আশা নিয়ে নয়। তারা আসে গাড়ী-বাড়ী, উৎকোচ আর উপঢৌকন, 'হোম-লিভ্' আর পেনশনের প্রত্যাশা নিয়ে। তাই তারা জেনে যায় এ দেশটায় [illegible] বাস ! স্বল্পসংখ্যক সাহেব আর অসংখ্য মোসাহেব। যেটুকু [illegible] করতে পারে না, সেটুকু ধার করে মিস মেয়োর মাদার ইণ্ডিয়া [illegible]। বেভারলি নিকলসের ভার্ডিক্ট অন ইণ্ডিয়া পড়ে। আসল

বাংলা দেশকে তারা ভয় করে, পরিহার করে। আর ভরসা করে অবাঙালী ভারতবর্ষের ওপর। বাংলা দেশের বাইরে যে বৃহৎ ভারতবর্ষ তাতে জায়গা আছে অনেক, কিন্তু মানুষ আছে ক'জন?

সাহেবরাই আমাদের নাকি সব দিয়েছে? স্বাজাত্যবোধ দিয়েছে; বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে; স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্ম দিয়েছে; শিক্ষা দিয়েছে; সংস্কৃতি দিয়েছে; আমাদের মানুষ করে দিয়েছে। এই ধারণা আজও, সাহেবরা চলে যাবার পরেও, অনেকের মন থেকেই যায় নি; অনেকের এখনও ধারণা সাহেবদের রাজত্বে সুখ ছিল অনেক বেশী।

আমরা মানুষ ছিলাম, সাহেবরা আমাদের মোসাহেব করেছে; 'প্রণাম হই' বলতাম একদিন মাননীয় মানুষকে; তারা আমাদের 'Yes Sir' বলতে শিখিয়েছে; লাঞ্চ-ডিনার আর কাঁটা-চামচে খাওয়াকে বুঝিয়েছে সংস্কৃতি; চাকরীর লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরে করেছে উত্তেজিত; সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে স্বাধীনতার নামে সংসারে এনেছে উচ্ছৃঙ্খলতা; বিশ্বসাহিত্যের প্রবেশ-পত্র দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা দিয়েছে সংস্কৃত মন্ত্র ভুলে যাবার; স্বাজাত্যবোধ জাগিয়েছে, তার আগে দেশের চেয়ে বিদেশ অনেক বড়,—এই ধর্মে দিয়েছে দীক্ষা!

ভারতবর্ষ কি ছিল আর ভারতবর্ষ কি হয়েছে; তার সঙ্গে উপমা দিয়ে বোঝানর মত উদাহরণ বিরল। কোনদিন যদি তাজমহলকে চূর্ণ করা হয় তাহলে সেদিনকার ভারতবর্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে যারা হতবাক হবে, তাদেরই অবস্থার সঙ্গে শুধু চলে এর তুলনা।

হাসপাতাল থেকে ফেরত এল আদিত্য; ছ'মাস বিশ্রাম নিতে হবে বাড়ীতে; মেয়ে আরও ট্যুশনীর কাজ জোগাড় করেছে; ছেলে আনছে কিছু; দুর্গা গানের স্কুল করেছে; মামলার নিষ্পত্তি হ স্বামীর চাকরী করবার মত অবস্থা হলেই, সংসারে সুদিন হ

রত্নাকর আজ আর বাল্মীকি হয় কিনা জানি না ! কিন্তু রত্নাকর টো আর খাঁটি রত্নর জানে পার্থক্য। স্ত্রীলোক ছিল হিরণ্ময় চোখে মেয়েমানুষ, দুর্গার মধ্যে সে প্রথম দেখল, মানুষ। সেই মানুষের কাছে অকৃতদার, অর্থবান, কামনার ক্রীতদাস হিরণ্য রায়ের মধ্যে যে অমানুষ ছিল, সে মাথা নত করল। ভয়ে নয় শ্রদ্ধায়। বেদনার সঙ্গে নয়, আনন্দে। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে নয় নিজেকে চিনে।

নূতন বাড়িতে উঠে আসার পর যেদিন প্রথম সকাল হল, সেদিন দুর্গা গাইল অনেক দিন পর ; গান শেখানর কর্তব্যে গাইল না ; মনের খুশীতে গুনগুন করে উঠল ; 'আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার ?'

জানি, দুর্গার খবর ছাপা হবে না খবরের-কাগজে ; দুর্গার ছবি উঠবে না চলচ্চিত্রে ; দুর্গাকে নিয়ে বিদেশে করতালির উঠবে না ঢেউ ; দেশে হবে না হৈ-হৈ। দুর্গা আর দুর্গার মত অসংখ্য মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা তেমনই আপিসের সময় হয়ে গেলে স্বামীর আসার পথ চেয়ে করবে মধুর অপেক্ষা ; সোসাইটি লেডিদের সঙ্গে যখন রমণীর হয় উঠবে তাজমহলে আর গ্রেট ইষ্টার্ণে আর ফিরপোয় অনেক নিশীথ রাত্রি, তখনও হাতা-খুন্তির পালা শেষ করে সেলাই নিয়ে বসবে দুর্গারা। ছেলের জামার কলারটা বদলে দিতে ; জানালায়-জানালায় শাড়ীর পাতের জোড়াতালি দেবার কাজে জেগে থাকার [illegible] যখন বিদুষীদের বিশুদ্ধ ইংরাজী বক্তৃতার পর [illegible] এসেম্বলীতে, পার্লামেন্টে, ইউ-

[illegible] খবর-যুগান্তর

তখন তারা চেয়ে দেখবে নিজেদের। চমকে উঠবে আর ভাববে, কি কি তারা চেয়েছিল আর কতটুকু তারা পেয়েছে। অন্যকে মজানর খেলায় কখন বুঝি ফাঁকি দিয়েছে নিজেকেও। তখনও কিন্তু দুর্গা তেমনি মনোরম করে শয্যারচনার কাজ শিখিয়ে দিচ্ছে ছেলের বউকে ; ছেলের বউ-এর হাতে সংসারের ভার তুলে দিয়ে তত দিনে পেয়েছে বহু আশার বিশ্রাম, বহু ভালবাসার নাতিনাতনী।

মধ্যবিত্ত জীবনে দুঃখ আছে, তাই তার আনন্দ অশেষ। মৃত্যু আছে, তাই জীবন দুর্মূল্য। জীবনযুদ্ধ আছে, তাই আছে বেঁচে থাকার মানে। সেখানে যদি আর কিছুও না থাকে তবু আছে দুর্গার মত মেয়ে। চাঁদার খাতায় আছেন দেবী দুর্গা। তাঁর নামে দিই প্রণামী। মানবী দুর্গাকে করেছি প্রত্যক্ষ ; তাকে জানালাম আমার প্রণাম।